পরশুরাম গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

পরশুরাম গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

রাজশেখর বসু

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রচিত ভূমিকা
সংবলিত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৬

মূল্য : পনেরো টাকা

প্রচ্ছদ : সমর দে

মুদ্রক : পরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সেরকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না-হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাততঃ নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন,—সে সব গল্পে অন্য উপাদান থাকলেও, হাসিটাই মূল উপাদান। হাসির গল্পলেখক মাত্রেই হাসিখুশি থাকবে, আমুদে হবে এরকম ধারণা অনেকের আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে হাসির রচনা যারা লিখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম সকলেরই প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাঁদের দু'জনেরই দুঃখের জীবন। এত দুঃখের মধ্যে এত হাসিকে কেমন করে তাঁরা রক্ষা করেছেন সে এক বিস্ময়। শমীবৃক্ষ আপন অভ্যন্তরে অগ্নিকে কিভাবে রক্ষা করে? ব্যতিক্রম বোধ করি দীনবন্ধু। দীনবন্ধু আমোদপ্রিয় মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন। আবার তিনিও ব্যতিক্রম কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেহেতু খুব সম্ভব একই সঙ্গে দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অন্তরে তিনি পোষণ করতেন। একজন সামাজিক ব্যক্তি, অপরজন সাহিত্যিক। তবু না হয় স্বীকার করা গেল তিনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, প্রকৃত হাস্যরস আর যাই হোক তরল নয়। কালিদাস যে কৈলাস পর্বতকে ত্র্যম্বকের অট্টহাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সে এই জন্যে। প্রকৃত হাস্যরস করুণার রূপান্তর বলেই তা গহন গম্ভীর। এ কথা সবাই বোঝে না বোলেই হাসির গল্পের লেখককে দেখতে গিয়ে আমুদে লোককে প্রত্যাশা করে। পরশুরামকে দেখতে গিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে এ কেমন ধারা হলো, ইনি যে গম্ভীর রাশভারী লোক।

অনুরূপা দেবীর এইরকম আশাভঙ্গ হয়েছিল। "আমার বিশ্বাস ছিল 'পরশুরাম', আমার পরম স্নেহাস্পদ 'বিশু'র স্বামী, তাঁর লেখার মতই খুব হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক, চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে মনে ভাবলাম—ইনি কি করে ওই সব অপূর্ব হাস্যরসের আধার হলেন? এ যেন 'সরষার মধ্যে ত্যাল'। মজঃফরপুর থাকতে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার স্বামীর সহপাঠী সাবজজ ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী পঙ্কজিনী ঘোষের মারফৎ তাঁর ছোট বোন (কনিষ্ঠা নয়) বিশুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, তার পত্রে। তার স্বামীর কথা, তাঁর আঁকা বিশুরই চিত্র (অসুখের পূর্বে, তৎপরে ইত্যাদি) ও নানা সরস মন্তব্য দেখেশুনে ঐ রকম ধারণাটাই বোধ হয় পাকা হয়ে গেছলো। যাহোক, পরে সে বিষয়ে সামঞ্জস্য করবার সুযোগও যথেষ্ট রূপেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁর বেঙ্গল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহু-বহুবার তাঁর নিজগৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ণ গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন্ গভীরে যে তাঁর অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখেছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্তসমাহিত এবং স্নিগ্ধসরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।" (কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও আমাদের মন্তব্যের সমর্থক। "রাজশেখরবাবু রাশিরাশি পুস্তক রচনা করেন নাই, মাসিক পত্রিকায় ক্বচিৎ কখনও তাঁর লেখা দেখা যায়। জীবিকার জন্য তিনি লেখেন নাই, বাণীকে বানরী করিয়া সভায় সভায় তিনি নাচান নাই, সাহিত্যকে পণ্য করিয়া তিনি গ্রন্থবণিক সাজেন নাই, দেশের সভা-সমিতি, সমাজের নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভা, সাহিত্যিক বৈঠক, গোষ্ঠী, মজলিস কোথাও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি সাহিত্যিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহাকে 'রাজশেখর দাদা' বলিয়া কেহ আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। প্রগল্ভতা, চাপল্য বা ধৃষ্টতা দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়। তিনি কাহারও স্তব প্রশস্তি গান করেন নাই, ভূমিকা, পরিচায়িকা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদির পুটে প্রসাদ বিতরণ করেন নাই, অযোগ্যকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে

আশ্বস্ত করেন নাই, আচার্য সাজিয়া সহস্রের প্রথাগত প্রণিপাত ও মুদ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়—রচনাতেও তেমনি আত্মনিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের পক্ষে যে detachment ও impersonality স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়। রাজশেখরবাবু নিজে না হাসিয়া হাসান, নিজে না কাঁদিয়া কাঁদান, নিজে অন্তরালে থাকিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করেন—এ বিষয়ে তিনি বিধাতারই মন্ত্রশিষ্য।" (কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

এই মন্তব্যের আর একজন সাক্ষী বর্তমান লেখক। সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোষাক ছাড়া অন্য পোষাকে তাঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না), হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার। ঐ প্রসন্নতাটুকু না থাকলে তাঁকে যে কোন বড় একটা অফিসের অভিজ্ঞ বড়বাবু বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা, সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তার সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে

এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়েনি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন গ'ড্ডলিকা'র লেখককে দেখতে পাইনি, বড় জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিকেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোঠায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব অপর একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছেন। "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময় একদিন আমায় Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময় Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ও সব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন—এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কয়েক বৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে, পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তখন তিনি বকুলবাগান রোডে বাড়ি তৈরী করে উঠে গিয়েছেন। সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, কখনও দরকারে অধিকাংশ সময়েই অদরকারে। যেতেই প্রথম প্রশ্ন করেছেন, চা-না কফি? তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সুহৃদয়তার কখনও অভাব দেখিনি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তার স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বললাম মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ে খদ্দরের কোটের মত অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ তাঁর গায়ের কোটটি, সেটা প্রথমেই চোখে পড়েছিল পরিভাষা কমিটির অধিবেশনে। নিপুণ জাদুকর যেমন পোষাকের নানা অন্ধিসন্ধি থেকে বিচিত্র বস্তু টেনে বের করেন, তেমনি বের করতেন তিনি কোটের পকেট থেকে।

অনেকগুলি পকেট, কোনোটা চশমার খাপ রাখবার, কোনোটা ফাউণ্টেন পেন রাখবার, কোনোটা থেকে বা বের হতো পেন্সিল কাটা ছুরি ও রবার, প্রায় তাঁর 'অটমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' আর কি! মোটের উপরে রাজশেখর বসু সজ্জন, অমায়িক, গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, প্রকৃত হাস্যরসিকের যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম বা বেশী নন। এ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাতে আর দশজন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। এবারে অমিলটা কোথায় দেখা যাক। মিলে-অমিলে মিলিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

॥ ২ ॥

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে, এখানে লেখক মানে তার শক্তির বিশেষ রূপটি। এখন কোন লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্তর মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে বুঝতে হবে। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে', একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে; জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েক বছর তাকে গঠন করে তোলে। 'Child is the father of the man'এ আদৌ কবির অত্যুক্তি নয়। আরব্য-উপন্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সিন্ধবাদ এক বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের বেলায় ঠিক তার উল্টো। প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলছে। লেখকের পক্ষে একথা আরও সত্য, কেননা লেখক যে জীবনরহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি ঐ শিশুটার হাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামের গণ্ডি' তেতালায় বসে দুপুরের আকাশে চিলের ডাক শ্রবণ, পেনেটির বাগানে প্রথম গঙ্গাদর্শন প্রভৃতি আদৌ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নয়। পারিবারিক বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি, কিংবা সাগরদাঁড়ি

গ্রামে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী মধুসূদনের মনে যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মানুষ দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা গ্রহণ করে তাই তার যথার্থ পুঁজি, তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন সঞ্চয় যতই হোক, পুঁজিতে যতই মুনাফা দেখানো যাক না কেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়ে না। এ সত্য রাজশেখর বসু সম্বন্ধে ষোলআনা প্রযোজ্য। কবিকে জানতে হলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে হবে, কাজেই রাজশেখর বসুর সাহিত্য-বিচারের আগে তার জীবন-বিচার আবশ্যক।

রাজশেখরবাবু নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত বা কোনরকম খসড়া লিখবার কথা ভাবেন নি। অধিকাংশ লেখক খ্যাতির প্রদীপের শিখাটিকে নিজেই উস্কে দেয়, কেউ বা প্রত্যক্ষে কেউ বা গোপনে, রাজশেখরবাবু কিছুই করেন নি। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বজন ও অনুরাগীগণ কিছু করেছেন বটে। এখানে আমরা সেই সব রচনার সুযোগ গ্রহণ করলাম। উদ্ধৃতিগুলি কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভীত হইনি, কারণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সংযুক্ত থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাজশেখর বসুর বাল্যকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

"দারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, 'ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।' মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি? কি শেখর হবে?' আমি বল্লাম, 'ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর।' দারভাঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন,—রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম দেওয়া হয়নি।

মা যখন তার হাতে খেল্‌না দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়া ভেঙ্গে দেখ্‌তো ভেতরে কি আছে,—কেন বাজে?—কেন ঘোরে?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নূতন এঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, দেখিস্ যেন ভাঙ্গিস্ না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা নেবে না! তারপর মা

বললেন, 'এই নে যা খুশি কর!' তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এনজিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এনজিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিগকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস্ হিস্ করচে স্টিম কিন্তু এনজিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে,—চিৎকার করে বললে, 'দাদা পালাও! পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত,—কর্ড মেলের বয়লার ফাটে যদি?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলষ্টপ দিতে শিখলো। দুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতেখড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার ষ্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোঁটা'।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থেকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বল্লাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বল্লেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেণ্ট বল্লে, 'খাই না।' 'কখনও খাননি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বল্লেন, 'You ought to have continued it!' এবং পেশেণ্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখবেন রোগযন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোঁক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারতো না।" (রাজশেখরের ছেলেবেলা: শশিশেখর বসু: শারদীয় যুগান্তর)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বাল্যকালের বিবরণ কিছু থাকলেও বেশি করে আছে

কলকাতায় তাঁর কলেজ জীবনের কথা এবং চাকুরি জীবনের প্রারম্ভের বিবরণ।

"১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলায় শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বামুনপাড়া হচ্ছে রাজশেখরের মামারবাড়ি। আর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর।

চন্দ্রশেখর বসুর চার পুত্র: শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের জন্ম হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহারা মহিনগর সমাজভুক্ত বড়ানিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবনসংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি যখন যশোহর জেলার সামান্য একজন ডাক বিভাগের কর্মচারী, সেই সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কলকাতায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তারই ওপর ভিত্তি করে কলকাতায় ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত কাজ চলে।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। তাঁর রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদান্তদর্শন, সৃষ্টি, অধিকারতত্ত্ব প্রলয়তত্ত্ব, প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতিলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে অতিবাহিত করেন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারভাঙ্গার স্কুলে রাজশেখরই তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা রাজশেখর এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ প্রভাবান্বিত হন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও

তাঁরা বাল্যকালের ভিত্তিপত্তনকে অগ্রাহ্য করেন নি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশের বেমক্কা চরিত্রের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁরা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এই সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সঙ্গে আরও জন-দশেক বাঙালী ছাত্র পড়তেন। সে মহলে সাহিত্য-আলোচনা হত, তবে তা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। বাঙালী মন তখনও হেম-মধু-বঙ্কিমের প্রভাব-প্রতিপত্তির আওতায় চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হয়েছে, তবে সে রকম প্রকট হয়নি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় বি. এ. পড়বার জন্যে এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেন। এই বছরই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী মৃণালিনী ছিলেন শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী রাজশেখর ও মৃণালিনীর সন্তান বলতে একমাত্র কন্যা প্রতিমা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজশেখর কখন পড়েন সে সময় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও পড়তেন, তবে হেমেন্দ্রবাবু আর্টসের ছাত্র ছিলেন। রাজশেখরের সতীর্থদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে জার্মেনী থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এ্যাডেয়ার ডাট্ নামে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া আর্ট প্রেসের নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ শেঠও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রাজশেখর সামান্য কিছুদিন বি এ-তে পড়ছেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, এ ধারণা ভুল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে রাজশেখর উপকৃত হয়েছিলেন, তবে সেটা কর্মজীবনে, ছাত্রজীবনে নয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিষ্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজশেখর এম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন।

পাটনা এবং কলকাতার থাকবার সময়েও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

এম এ পাশ করার দু-বছর পরে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বি. এল. পরীক্ষাটিও পাশ করে ফেললেন। এরপর স্বাভাবতই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবার কথা। কিন্তু মাত্র তিনদিনেই আদালতে পসার জমাবার উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়ে বসলেন। আইন ব্যবসায়ীর খোলস চাপকানগুলি বিলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রাজশেখর প্রকৃতিগত ভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাঁকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভাল হতে পারে, এ কথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। তখন সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যালয় ছিল। সারকুলার রোড থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে নয় বৎসর এ্যালবার্ট বিল্ডিংস-এ ছিল। বর্তমান বেঙ্গল কেমিকেলের আপিস চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে অবস্থিত। প্রথমে রাজশেখরকিছুকাল থাকেন বেচু চাটুজ্যে ষ্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে, তারপর পার্শীবাগানের পৈতৃক গৃহে অবস্থান করেন। কাজে বহাল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হলেন। এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য এখনও পরোক্ষভাবে বেঙ্গল কেমিকেল তাঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য: কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)

এই দুটি অংশ পড়লে শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবনের একটা খসড়া পাওয়া যাবে। আপাততঃ এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এর বেশী তথ্য পাইনি, আর আমার বিচারে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই বয়সের মধ্যেই তাঁর ভাবী রচনার গাঁথুনি পাকা হয়ে গিয়েছে। তবে আর একটা পরিচয় এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। চোদ্দ নম্বর পার্শীবাগান বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। এই বাড়িটি ও এখানে যে নিয়মিত আড্ডা বসতো নামান্তরে পরশুরামের রচনায় তা অমরত্ব লাভ করেছে।

"১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৪ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম; ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজী নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্র-কুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয়

ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যাঁ, কি বলছ ভাই ?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম। গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলায় আমল দিতেন না। এই দাবা খেলার মধ্য দিয়াই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সে এখানে নয়, রবিবাসরের এক বার্ষিক উদ্যান সম্মেলনে, 'তুলসীমঞ্চে'।

বড়-দা শ্রীশশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজী-লিখিয়ে, ইংরেজী কাগজে তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজ-দা শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু উলা বীরনগরের উন্নতিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন।" (উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গটা শেষ করবো ইচ্ছে আছে। যতদূর জানি রাজশেখরবাবু খুব পত্রালাপী লোক ছিলেন না। তাঁর যে সব পত্র পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাঁকে বোঝবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই রকম একখানি পত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"হাস্যরসিক শ্রীরাজশেখর বসুকে দেখিয়াছি, আবার শোকপ্রাপ্ত শ্রীরাজশেখর বসুকেও দেখিয়াছি।

পত্নীবিয়োগে সমবেদনা জানাইয়া শ্রীনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখি তদুত্তরে এই পত্রখানি পাই।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
২।১২।৪২

সুহৃদ্‌বরেষু

চারুবাবু, আপনার প্রেরিত লেখা ভাল লাগল। মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছাড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না।

বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উলটোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উস্‌কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্যে মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।

আশা করি আপনার সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবে এবং তার আগে খবর পাব।

ভবদীয়

রাজশেখর বসু

তিনি লিখিতেছেন,—আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়। কিন্তু তা ঠিক নয়।

গীতায় আছে,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যাহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

অনেক দিন অনেক বার নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ রাজশেখরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।” (স্থিতপ্রজ্ঞ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৬০)।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পাওয়া যাবে, যেগুলির পদে পদে প্রয়োজন হবে তার সাহিত্য ও চরিত্র বিচারের সময়ে। (১) তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বিজ্ঞান শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আইন পাশ করাকেও ধরতে হবে, (২) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কৃতী প্রধান ব্যক্তি রূপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি, (৩) সংসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। পার্শীবাগানে আড্ডায় কখনও যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তদ্‌সত্ত্বেও অনায়াসে

অনুমান করতে পারি যে, তিনি সেই আড্ডার মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বাগ্‌যত ছিলেন, মাঝে মাঝে একটি দুটি হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন। তিনি হাসাতেন, তবে হাসতেন কদাচিৎ। 'অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর' (৪) চারুবাবুকে লিখিত পত্রখণ্ডে যে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত ভাব প্রকাশিত, তাতে মিলিত একাধারে গীতার ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। গীতোক্ত আদর্শ পুরুষ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক। তিনি দুই-ই ছিলেন। এখন এই বিশ্লেষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সম্বল করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হবো আর আশা করি দেখতে পাবো যে, বিচারের মূল উপাদান আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ছে

॥ ৩ ॥

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী তার দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন, এমন আর কোন লেখক রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দুটি এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আলাদা কোঠায় রাখা যে খুব কঠিন এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তাঁর পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল একজন লেখক তা প্রকাশ করেছেন, "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময়ে একদিন আমায় Bengal Chemical এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীরভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ওসব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন, এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়,—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত ; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্রঃ কথাসাহিত্যেঃ রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যাঃ শ্রাবণ ১৩৬০)।

রাজশেখর বসু নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে মনীষার পরিচয়, অবশ্য শিল্পীর

পরিকল্পনা গৌণভাবে আছে। আর পরশুরামের ছদ্মনামে পরিচিত জনবল্লভ গল্পের বইগুলি শিল্পীর রচনা যদিচ গৌণভাবে মনীষার দেখা পাওয়া যাবে।

আমরা প্রথমে পরশুরাম রচিত গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা করবো, পরে রাজশেখর বসু রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা সারলেই হবে।

রাজশেখরবাবু জনসমাজে হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, আরো স্বরূপে বলতে গেলে ব্যঙ্গরসিক বলা যেতে পারে। মোটের উপরে একথা স্বীকার্য যে, তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান হাসি। কাজেই হাসির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া আবশ্যক।

সূর্যালোককে বিশ্লিষ্ট করে ফেললে সাতটি রং পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনী, মাঝখানে অন্য রং। শুভ্র হাসিকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় অনেক জাতের হাসি পাওয়া যাবে, যার এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্য প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু ; ওরই মধ্যে এক জায়গায় নিছক কৌতুক-হাস্যও আছে। আমরা যখন কোন লেখককে হাসির গল্পের লেখক বলি, তখন বিচার করা আবশ্যক এই হাসির বর্ণালীর মধ্যেই কোনটি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একাধিক উপাদানই তাঁর রচনায় থাকতে পারে। বিশুদ্ধভাবে একটি মাত্র উপাদানকে অবলম্বন করে রচিত এমন গল্প খুব বিরল। বিশেষতঃ আধুনিক মন মিশ্ররীতির পক্ষপাতী, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক উপাদান মিলিত হয়ে যায় তার রচনায়। শেক্সপীয়ারের 'ফলস্টাফ' এই রকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার গঠনে কৌতুকহাসি থেকে আরম্ভ করে প্রায় সবগুলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফের বিদায়ে (Rejection of Falstaff) প্রচ্ছন্ন অশ্রু প্রায় অপ্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দীনবন্ধুর নিমে দত্তর চরিত্র শেষ দিকে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অশ্রু উদ্গত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠ চরিত্রেও হাসির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর রেশ আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চরিত্র এ বিষয়ে বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। হাসির স্ফটিক-শিলায় কমলাকান্ত চরিত্র গঠিত, তা থেকে শতমুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, কিন্তু যেমনি একটু ব্যথার তাপ লাগে, অমনি স্ফটিক অশ্রুতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখকগণের কেউ অমিশ্র হাসির কারবার করেন নি। বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র হাসির একমাত্র কারবারী বোধ করি

অমৃতলাল বসু। তাঁর হাসি প্রায় সময়েই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এখন বিচার্য পরশুরামের স্থান হাসির বর্ণালীর মধ্যে কোন দিকে, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে না প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে। এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আর একজন প্রধান হাসির গল্পের লেখকের নাম করা দরকার, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

ম্যাথ্‌ আর্নল্ড-এর একটি সুভাষিত আছে "Literature is Criticism of life"—এই উক্তিটি নিয়ে গত একশ বছর তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। কাজেই সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বাহুল্য। নিছক কৌতুকহাস্য বাদ দিলে দেখা যাবে যে, হাসি যে জাতেরই হোক না কেন তা Social Criticism ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই Criticism বা সমালোচনার প্রকার ভেদ আছে। কোন লেখক সমালোচক হিসাবে তিরস্কার করেন কেউ বা অশ্রুপাত করেন, দুজনের পন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুকহাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে। একটা Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের করে এগিয়ে আসেন। এখানে বিশুদ্ধ কমেডির সঙ্গে Satire বা ব্যঙ্গের তফাৎ। বিশুদ্ধ আনন্দ দান ছাড়া কমেডির আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্যমূলক। কমেডি লেখক আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন; কমেডি লেখক উৎসববাজ, ব্যঙ্গরসিক বিচারক। বিচারের ভুলভ্রান্তি হতে পারে, এক আদালতের রায় অন্য আদালতে উল্টে যেতে পারে, এক যুগের নজির অন্য যুগ না মানতে পারে এমন উদাহরণ সাহিত্যের

ইতিহাসে প্রচুর। বিশুদ্ধ আনন্দের মার নেই, বিশুদ্ধ বিচার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ব্যঙ্গলেখকের স্থান অত্যুচ্চ সাহিত্যে সর্বোচ্চশ্রেণীতে কখনো নির্দিষ্ট হয় না। সকলেই তার গুরুত্ব স্বীকার করে, তবু বিশুদ্ধ আনন্দদাতার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজী হয় না। বিচারকের স্থান আদালতে, আনন্দদাতার স্থান অন্তঃপুরে।

নাটকে এই সমালোচনার কাজটি বিদূষক করে থাকে, নীচু আসনে বসেও রাজার দোষ দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত পর্বে বিদূষককে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিদূষণার সীমা অন্তঃপুরে ও অন্ত্যঅঙ্কের বাইরে। এই সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গরসিক স্বকর্তব্য সাধনে যে নিরস্ত হয় না, তার কারণ বিশেষ আদর্শের প্রেরণা তাকে চালিত করে। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে প্রলাপ-বাদিনী কবিতা তার কানে কানে আনন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে আনন্দ মন্ত্রে বৈষয়িক সার্থকতা কিছুমাত্র নেই, সেই কবিতাকে মানুষ সর্বোচ্চ আসন দিয়ে নীচে বসিয়ে রাখে ব্যঙ্গরসিককে, যায় দৃষ্টি সদাজাগ্রত না থাকলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে যে ব্যঙ্গরসিক প্রচ্ছন্ন অশ্রুকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে তার প্রতি মানুষের মন কিছু সদয় বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারককে সে মনে ভয় করলেও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় না। পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটি আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করবো। এখন এইটুকুই যথেষ্ট যে পরশুরামের হাসি প্রধানতঃ তিরস্কার ঘেঁষা, যার আবেদন মানুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি শুধুই হাসির গল্প লিখেছেন এ কথা সত্য নয়। তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যা ঠিক হাসির গল্প নয়। অন্য নামের অভাবে তাদের সামাজিক গল্প বলতে হয়। যথা—কৃষ্ণকলি, চিঠি বাজি, দীনেশের ভাগ্য, যশোমতী, ভূষণ পাল, ভবতোষ ঠাকুর ইত্যাদি।

এ সব গল্পে হাসি যে নেই তা নয়, তবে হাসিটা তার প্রধান উপাদান নয়। একবার হাস্যরসিক বলে নাম রটে গেলে, তার নিতান্ত সাধারণ কথাতেও হেসে ওঠা পাঠক কর্তব্য মনে করে। শুনেছি প্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একটি সভায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথম বাক্যটাও শেষ করতে পারেন নি, ঘনঘন হাসি ও করতালিতে শ্রোতারা নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যা গভীর মনীষা-প্রসূত। মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ, সমাজের অবস্থা, মৃত্যুর রহস্য, পৃথিবীব্যাপী লোভ-অশান্তির পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুঃসাহসিক চিন্তার পরিচয় বহন করে এই সব গল্প। পরোক্ষভাবেও হাসির সঙ্গে সংশ্রব নাই। কিন্তু যেহেতু পরশুরামের রচনা, কাজেই পাঠকের পক্ষে হাসা একপ্রকার জাতীয় কর্তব্য। যথা—গামানুষ জাতির কথা, অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা, ভীম গীতা, মাঙ্গলিক, কাশীনাথের জন্মান্তর, সত্যসন্ধ বিনায়ক, নির্মোক নৃত্য, কর্দম মেখলা প্রভৃতি।

এই সব গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আর কিছুই নয়, পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক হলেও কেবলই ব্যঙ্গ গল্প তিনি লেখেন নি, এমন অনেক গল্প লিখেছেন যা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অন্তদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যদি অন্য ব্যঙ্গরচনা নাও লিখতেন তবে হয়তো এত জনপ্রিয় হতেন না সত্য, কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গ রচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী করে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠ্‌ল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য আর ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায়নি। চিকিৎসা-সঙ্কট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডির মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায়, স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথমে যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ ক'রে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,

তবে একথা বল্‌লে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হ'য়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী করে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হননি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তারপরে শতাব্দীর না হোক দশকের প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছেন। এই তিন মহারথীর সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমকে দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার করে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময় তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হ'য়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয়নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্ময় হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টো। এসব নরনারী অত্যন্ত পুরাতন

বলেই তারা আকর্ষণ করেছে পাঠকের চিত্ত। পুরাতন তবে অতি পরিচয়ের ধুলো জমে জমে সে-সব আচ্ছন্ন হয়ে নাস্তিবৎ বিরাজ করছিল। পরশুরামের হাসির দমকা হাওয়ায় সে ধুলো সরে যেতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বিস্মিত পাঠক বলে উঠল বাঃ বাঃ, এসব তো সামনেই ছিল অথচ দেখতে পাইনি। ভোরবেলা দরজা খুলতেই বৃহৎ একটা গাছ দেখতে পেলে পাঠকে অবশ্যই চমকিত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তের বিস্ময়কে চাপা দেয় বিরক্তি, তখন সে কুড়ুলের সন্ধান করে। না, পরশুরামের প্রথম রচনা দরজার সমুখের বনস্পতি নয়, দিগন্তের গিরিমালা। শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের ধুলোয় আর বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ হঠাৎ শরৎকালের বৃষ্টি-ধৌত নির্মল আকাশে তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল, বাঃ ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষটি আছে দেখছি। পূর্বসংস্কারহীন নূতন প্রথমটা চমকে দিলেও তার পরিণাম বিরক্তিতে আর যে নূতন পূর্বসংস্কারের সূত্র ধরে অতি পরিচয়ের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায়, সে কখন পুরাতন হয় না ; কারণ পুরাতনত্বেই তার যথার্থ পরিচয়। সূর্যোদয়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়, জাদুকরের আমগাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, প্রথম বারের পরে দ্বিতীয় বারে বিরক্তিকর।

এরা সবাই পুরাতন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত প্রত্যাশিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক—এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করছে, ভাড়ুদত্তের সঙ্গে বাজার তোলা আদায় নিয়ে করছে, আবার ঠক চাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? ডমুরধারা আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নরেদচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলপ করে বলবে। এরা সবাই অতিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই চিনতে পারা যায়নি।

॥ ৫ ॥

আমেরিকার ভূভাগে গোড়া থেকেই ছিল, কালম্বাস তাকে আবিস্কার করলো। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ গোড়া থেকেই ছিল, পরশুরাম সন্ধানীরূপে

তাদের আবিষ্কর্তা। প্রতিভা দুই ভাবে কাজ করে, আবিষ্কার ও সৃষ্টি, নূতন জগতে উদ্ঘাটন ও নূতন জগতের নির্মাণ, কলম্বাস ও বিশ্বামিত্র। এ দুই গুণের কোন একটাকে একচেটিয়া মনে করলে ভুল হবে। অল্প-বিস্তর সব প্রতিভাবান্ লেখকেই পাওয়া যাবে। আয়েষা সৃষ্টি, বিদ্যাদিগ্‌গজ আবিষ্কার ; গোরা সৃষ্টি, পানুবাবু আবিষ্কার। তবে এ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে স্যাটায়রিষ্টে, ব্যঙ্গ প্রতিভার সৃষ্টির তুলনায় আবিষ্কারের ভাগ বেশি। সুইফটের লিলিপুটকে যতই অভিনব মনে হোক, আসলে সে মানুষকে উল্টো দূরবীনের দৃষ্টিতে আবিষ্কার। পরশুরামে আবিষ্কারের ভাগটাই সুপ্রচুর, তবে সৃষ্টিকার্যও আছে। জাবালি চরিত্র মহৎ সৃষ্টি, কৃষ্ণকলি (কালিন্দী) ও চিরঞ্জীবও সৃষ্টিকার্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, পাঠকের বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি, অন্ততঃ নূতন দেখে বিস্মিত হয়নি। প্রত্যাশিত পুরাতনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। তৃতীয় কারণ পরশুরামের ভাষা।

এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সবুজপত্রী ভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা পাঠককে প্রতি নিঃশ্বাসে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়, নিজের কৌশলকে লুকোবার কৌশলটা তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ভাষাতেও এই ত্রুটি। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাজুটধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ। সবশুদ্ধ মিলে ভাষাটি ভারী তৃপ্তিদায়ক, ভাবের স্বাভাবিক বাহন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। কথ্য ভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের

চকমকি স্ফুরণে আলোকিত ও চমকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাত-কুমার প্রভৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মূষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য! যে শুঁড়ের বহর! গভীর গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা। সাধুভাষা ও পয়ার ছন্দের আয়ু বঙ্গ-ভারতীর আয়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গণনীয়। নূতন নূতন গুণীর হাতে অভাবিত রূপ যুগে যুগে তারা দেখা দেবে।

॥ ৬ ॥

হাসির গল্প লিখবার বিপদ এই যে, পাঠকে হেসেই সব কর্তব্য শোধ করে দেয়, আদৌ তালিয়ে দেখতে চায় না। হাসির গল্পে আর এমন কি থাকবে, ভাবটা এই রকম। কেমন করে জানবে যে হাসির গল্প না থাকতে পারে এমন বস্তু নাই। ভাষার জাদুর কথাই ধরা থাক। হাস্যরস একান্ত ভাবে সামাজিক ব্যাপার। হাসিতে সামাজিক মনের প্রকাশ, অশ্রুতে প্রকাশ ব্যক্তিমনের। স্বভাবতই হস্যাত্মক রচনায় নিসর্গ বর্ণনার স্থান সংকীর্ণ। যখন তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নূতন খাত খনন করে নিতে হয়। গঙ্গা প্রবাহিত স্বাভাবিক খাতে, গঙ্গার খাল কৃত্রিম খাতে যা নাকি সামাজিক চেষ্টার ও সামাজিক প্রয়োজনের ফল।

লম্বকর্ণ গল্পে কালবৈশাখীর এবং ভুশণ্ডির মাঠে অপরাহ্নের বর্ণনা দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালবৈশাখীর ও অপরাহ্নের স্বভাব বর্ণনার সঙ্গে সুনিপুণ ভাবে মিশে গিয়েছে ব্যঙ্গ রসিকের স্বভাব। আবার কচি-সংসদ গল্পে দুটি বর্ণনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। একটি শরৎ আবির্ভাবের, আর একটি রেলগাড়ীতে যাত্রার সুখের।

শরতের প্রথমপদক্ষেপের নিখুঁৎ স্বাভাবিক বর্ণনা, তারপরেই সামাজিক মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। "টাকায় এক গণ্ডা রোগারোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে।" আবার রেলগাড়ীতে যাত্রার বর্ণনার মধ্যেও কেমন অনায়াসে নিসর্গের স্বভাব ও সামাজিক স্বভাব গঙ্গাযমুনায় মিশে গিয়েছে। "কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যে নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপরে ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল-ভাল খাদ্যসামগ্রী, তাছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাৎ হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত!" শেষোক্ত বাক্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ীর চলার ছন্দ কেমন সুকৌশলে অথচ কেমন অনায়াসে ধরা হয়েছে। উড়ন্ত পাখীকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেয়েও এ যে কঠিন। সাহিত্যে সবচেয়ে দুঃসাধ্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতিকে মেলানো, আর ব্যাঙ্গের সঙ্গে প্রেমকে মেশানো। উপরে উদ্ধৃত সবগুলি বর্ণনায় প্রথম দুঃসাধ্যকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য হয়ে ওঠবার উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে। মোট কথা এই যে এহেন নিসর্গ বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, না গল্পগুচ্ছে না কপালকুণ্ডলায়। এ পরশুরামের নিজস্ব। আর ভাষায় এই ছন্দ, গতি ও ভঙ্গী অন্যত্র বিরল, পরশুরামের শেষের বইগুলোতেও নেই। সেগুলির আপেক্ষিক অপ্রিয়তার এ যে একটা কারণ তা আগেই বলেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে বাধা নেই যে, রামায়ণ মহা-ভারতেয় অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহার করলে তাদের মর্যাদা রক্ষিত হতো।

॥ ৭ ॥

গড্ডলিকা ও কজ্জলীর আর একটি ঐশ্বর্য ছবিগুলি। কথার সঙ্গে ছবিগুলি গানের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সঙ্গত বন্ধ হলেও গানের মাধুর্য কমে না।

ছবিগুলিকে বলা চলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নীচে লালকালি দিয়ে দাগ টেনে দেওয়া, কিংবা সঙ্গীর উত্তরীয় প্রান্ত টেনে দৃশ্য বিশেষের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। ওগুলো আছে বলে পাঠক একটু অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, ওগুলো না থাকলে অনবহিত পাঠক সেগুলো হয়তো অতিক্রম করে যেতো। শেষের ছয়খানি গ্রন্থের আপেক্ষিক ম্লানতার কারণে নীচে দাগটানার কিংবা উত্তরীয় প্রান্তে টান দেওয়ার অভাব। তৃতীয় গ্রন্থ হনুমানের স্বপ্নের কোন কোন গল্পে যথা হনুমানের স্বপ্ন ও প্রেমচক্রে ছবির গুনে অপকর্ষ লক্ষ্য করবার মতো। খুব সম্ভব চিত্রকর নিজের ক্ষমতার ক্ষীণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন বলেই শেষের বইগুলি অলঙ্করিত করতে ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফল গল্পগুলির আবেদন মন্দ হয়ে এসেছে। তবে প্রথম বই দু'খানিতে লেখায় রেখায় এমন মিলে গিয়েছে যে, এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, গল্প অনুসারে ছবি আঁকা না ছবি অনুসারে গল্প লেখা।

পরশুরামের গল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষণ পড়বার সময়ে পাঠকে ভারী একটি আরাম ও স্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, গেল গেল ভাব এদের মধ্যে নাই। বর্তমান ব্যস্তসমস্ত জীরনে নিত্য বিড়ম্বিত পাঠক এখানে পদার্পণ করে ভারী আরাম বোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ বেদার চটুজ্যে গল্পমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বংশলোচনবাবু গৃহকর্তা হলেও গল্পকর্তা কেদার চাটুজ্যে। বংশলোচনবাবুর বাড়ীর আড্ডাটি ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

"চাটুজ্যে মশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। বিনোদ উকিল বলিলেন—তাই তো বাসায় ফেরা যায় কি করে? গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাততঃ এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো বলে আয় তো বাড়ীর ভেতরে। চাটুজ্যে বলিলেন, মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।"

এই চিত্র যুদ্ধপুর্ব সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাঠকের চিত্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বসিত করে তোলে। রেশন-কার্ড নাই, কন্‌ট্রোল নাই, ইলিশ মাছ চালান বন্ধ হওয়ায় আশঙ্কা নাই; যত রাতেই বাড়ীতে ফেরো না কেন, ট্রাম বাস পাওয়া যাবে; নাই ধর্মঘট, নাই ছিনতাইয়ের

আশঙ্কা। কয় বছর আগেকারই বা কথা। কিন্তু সত্যযুগ তো লৌকিক বছর গণনার হিসাবের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেক যুগ বিগত যুগের মধ্যে অচরিতার্থ আশার মরীচিকা দেখে—সেই তো সত্যযুগ। জাবালি পত্নী "হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভঁয়সা।" আজকের সকলের মধ্যেই একজন হিন্দ্রলিনীর বাস। আবার আগামী যুগ বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে, ধর্মঘট, ঘেরাও, কন্‌ট্রোল, রেশন, ছিনতাই-শঙ্কিত যুগকে সত্য বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। পাঠকে কেদার চাটুজ্যে গল্পমালা পড়বার সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চিরন্তন বাসা সত্যযুগে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। এই গল্পগুলির রসের নিত্যতার কারণ বংশলোচনবাবুর বাড়ীর আড্ডা ও আড্ডাধারীগণ নিত্যকালের অধিবাসী, যে নিত্যকাল লৌকিক হিসাবের উর্ধ্বে। সতত বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই শান্তিময় দ্বীপটিতে পদার্পণ করবামাত্র এখানকার নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়। কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই, বসে বসে কেদার চাটুজ্যের গল্প শোনো, (বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যায় এমন কাজটি করো না, নগেন্‌ ও উদয়ের পরস্পরকে আক্রমণ কৌশল লক্ষ্য করো, পারো তো বিনোদ উকীলের কোল থেকে তাকিয়াটা টেনে নাও, আর সম্ভব হলে বংশলোচনবাবুর অনবধানতার সুযোগে পাশে থেকে Happy though Married বইখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা করো। রাত যতই হোক মসুর ডালের খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার আসরে যথাসময়ে ডাক পড়বে। স্বচ্ছল গৃহস্থ বংশলোচনবাবুর বাড়ীতে সর্বদা দু'চারজন অতিরিক্তের জন্য চাল নেওরা হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনও আছে, কেননা, ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাধারীরা ক্রমে ক্রমে ওখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন, এতদিনে বোধহয় সকলেই খণ্ডকালের সীমা পেরিয়ে নিত্যকালের আসরে গিয়ে জুটেছেন।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তার গল্পগুলির বাহনের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ প্রকৃতিকে সাধারণভাবে হাস্যরস বলা চলে, কিন্তু আগে

মনে করিয়ে দিয়েছি যে হাস্যরসের বর্ণালী বা বর্ণচ্ছটায় নানা রঙ, এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু, আর এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার, মাঝখানে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ও অন্যজাতের হাসি। আরও বলেছি যে, পরশুরামের হাসি অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা। সেই সঙ্গেই বলেছি যে আধুনিক মন রসের জাত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, বিভিন্ন রস, এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্র জাতের হাসি সৃষ্টি করে। পরশুরামে বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য আছে, যেমন গুপী সাহেব ও উপেক্ষিতা, জটাধর বক্‌শী পর্যায়কেও এই শ্রেণীতে ধরা উচিত। অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কারের হাসিই অধিকাংশ গল্পে। অনতি-প্রচ্ছন্ন অশ্রু বড় চোখে পড়ে না। হাসতে হাসতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ করে তোলে কমলাকান্তের দপ্তরে ও বৈকুণ্ঠের খাতায়। সে হাসির বোধ করি একেবারেই অভাব পরশুরামে। বের্গসঁ যাকে ইন্‌টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়া-দায়ক। স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, পেন্সনপ্রাপ্ত রায় সাহেব তিনকড়িবাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, বকু বাবু, শিহরণ সেন অ্যাণ্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, বেড়ে হয়েছে। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পণ বলেছেন। পরশুরামের দর্পণখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি, "সাণ্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আমি ভাবছি আরসোলা।"

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করেছে এমন সময়ে ভাইঝি পুষ্কলা জিজ্ঞাসা করে বসে, "পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছ?"

"নিরুপমা বলিল—শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।

"দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক", "শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালির তিন জন্মের স্বামী", "তাঁহারা (নাস্তিকরা) মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন", "লালিমা পাল (পুং)", "তবে এইটুকু আশার কথা, এখানে (দার্জিলিঙ পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধস নামে।" সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন," প্রভৃতি। এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরণের অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশকে এক ধরনের এপিগ্রাম বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে এই যে সাধারণ এপিগ্রাম ভাবময়, এগুলি চিত্রময়। এই সব এপিগ্রামের স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ যেমন মনোহর, তেমনি অত্যাবশ্যক। এরাই পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ করে রেখে দেয়, তার চোখের সম্মুখে পথ দৃশ্যমান ও সুগম হয়ে ওঠে।

॥ ৯ ॥

পরশুরামের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বক্তব্য শেষ করে এবারে গ্রন্থ হিসাবে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বইগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

গড্ডলিকা ও কজ্জলী অধিকাংশ পাঠকের বিবেচনায় পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি একথা সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক এই বিবেচনার কিছু হেতু আছে। প্রথম

দু'খানির সঙ্গে শেষের সাতখানির একটি প্রধান পার্থক্য, (অন্য পার্থক্য আগেই দেখানো হয়েছে) প্রথম দু'খানিতে দেখানো হয়েছে জীবনচিত্র, শেষের কয়খানিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবনতত্ত্ব। প্রথম দু'খানি ছবি, শেষের গুলি ভাষ্য। তবে ছবি ও ভাষ্য, আগে যাকে বলেছি চিত্র ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময়ে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ও বিরিঞ্চিবাবা আর তৃতীয়দ্যূতসভা, রামরাজ্য বা গামানুষ জাতির কথা, একজাতের গল্প নয়। প্রথম দুটোতে লেখক ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট, শেষেরগুলোতে ছবির সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন কিংবা বলা উচিত মন্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো জুড়ে দিয়েছেন ছবি। ফানুষ ও ঘুড়িতে এই রকম প্রভেদ। ফানুষ হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বাজিকর সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তারপরে ঐ বস্তুটা বাতাসের বেগ ও নিজের ভার অনুসারে চলতে থাকে। ঘুড়ি উড়নদার নিরক্ষেপ নয়, বাতাসের বেগ ও নিজের ভার যাই বলুক, যতই উঁচুতে সে উঠুক, ওর হাতের চরম টানটা পড়ছে উড়নদারের হাত থেকে। লোকটি ভাষ্যকার, ঘুড়ির গতিবিধি তার ভাষ্য। অন্যপক্ষে ফানুষ অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গল্পগুলি জীবনতত্ত্বের বা জীবন ভাষ্যের শ্রেষ্ঠ আধার।

এখন পাঠক-সাধারণের কাছে তত্ত্বের চেয়ে চিত্রের আদর বেশি; তাকাইলে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির আবশ্যক, সকলে সব সময়ে বুদ্ধি খাটাতে চায় না, বিশেষ গল্প উপন্যাসে, সে গল্প উপন্যাস আবার যদি হাস্য রসাত্মক হয়। কিন্তু বুঝমান পাঠকের কাছে শেষের বইগুলোর আদর কম হওয়ার কথা নয়; লেখকের প্রতিভার সঙ্গে মনীষাকে লাভ করাকে তারা উপরি পাওনা বলে গণ্য করে। শেষের বইগুলির গল্পে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, যুদ্ধ, শান্তি, প্রেম, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আর সেই মন্তব্যের সমর্থনে কখনো বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন।

তবে উভয় পর্যায়েই ব্যতিক্রম আছে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের বইগুলির মধ্যে জটাধর বক্‌শী সিরিজ, দুই সিংহ, আনন্দীবাঈ, আতার পায়েস, পরশপাথর, সরলাক্ষ হোম, জয়হরির জেব্রা, লক্ষ্মীর বাহন,

রাতারাতি, গুরুবিদায় প্রভৃতি জীবন চিত্র-প্রধান গল্প। আবার দুয়ের মিশ্রনে অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি গগন চটি। এটি পরশুরামের অতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্গত। একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর ফ্রেমের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ধাপ্পা ও ভণ্ডামিকে সশ্রদ্ধ করে দাঁড় করানো মুনশীয়ানার চরম, গল্পের কলমের পিছনে মনীষার প্রেরণা না থাকলে এমন সম্ভব হতো না।

প্রথম দু'খানির এগারটি গল্পের মধ্যে জাবালি নিঃসন্দেহে জীবনতত্ত্ব প্রধান। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যে-সব গল্প লিখেছেন জাবালি তাদের প্রথম। খুব সম্ভব রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থেকেই তিনি পেয়েছেন পৌরাণিক কাহিনী পুরুষোচিত ছাঁচে ঢালাই করবার প্রেরণা। সে যাই হোক এই জাবালিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে সবিস্তারে বলবো। আপাততঃ অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিচার সেরে নেওয়া যেতে পারে।

এগারটি গল্পের জাবালি বাদ পড়লে থাকে দশটি। মহাবিদ্যা ও উলট-পুরাণ দৃষ্টির অভিনবত্বে, নরনারীর বৈচিত্র্যে এবং wit-এর খদ্যোতবর্ষণে চিত্তাকর্ষক হলেও, শক্ত গল্পের ফ্রেমের অভাবে অন্যগুলোর সমকক্ষ হতে পারেনি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মনোহর, কিন্তু সমগ্র রূপটি নয়। লেখক যেন দেহের outline-টা আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। অন্য আটটি গল্প বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আটটি গল্প।

॥ ১০ ॥

গোড়াতে উল্লেখ করেছি যে রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান শিক্ষা (আইনও তার মধ্যে পড়ে) এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছে। সকল লেখককেই করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাকিমী অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর অনেক উপন্যাসে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংগীতবিদ্যার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায়। তাঁর অনেক Image অন্য অলঙ্কার সংগীত-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

গল্পের কাঠামো রচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব—ব্যবসায়ের অন্ধিসন্ধি, লিমিটেড কোম্পানীর আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবল শু হলেও হ'তে পারে এ ধারণা সকলের মাথায় আসবার কথা নয়। আবার বিরিঞ্চিবাবাতে প্রোফেসার ননীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আইডিয়া কেবল তারই মাথায় আসা সম্ভব, বিজ্ঞানের বিশেষ রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি যিনি অবহিত। প্রাণিতত্ত্ব, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির মূল সূত্রগুলিকে তিনি কাজে প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী অনেক গল্পে।

তারপরে ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আডাটিকে এবং আড্ডাধারীদের অনেককে তিনি নামান্তরে ও রূপান্তরে ব্যবহার করেছেন কেদার চাটুজ্যে গল্পমালায়।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি বেশী লোকের সঙ্গে মেশেন নি, দেশভ্রমণ বেশি করেন নি। প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ প্রয়োজন সব সময়ে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন না, দেশভ্রমণও বেশি করেন নি। তবে তাঁর উপন্যাসে এত বিচিত্র নরনারী এলো কোথা থেকে তাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় দেখা দিয়েছে আদালতে এসে। রাজশেখরবাবুর বেলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। বাকিটুকু প্রতিভার রসায়ন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালীর রসায়ন বিদ্যার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" গরমিলে মেলানোই যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান উপায়। হাস্যরস ফকিরের আলখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় তৈরী। বেঙ্গল স্কুল অব্ কেমিষ্ট্রির নব্য-রাসায়নিক পরশুরাম সেই নীতিতেই তাঁর হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন।

এবারে জাবালি। জাবালি চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় না হলেও (সেযুগেও জনপ্রিয় ছিলেন না) জাবালি গল্পটি অতি উৎকৃষ্ট। আর শুধু তাই নয় পরবর্তী অনেক উৎকৃষ্ট পৌরাণিক গল্পের অগ্রজ।

ব্রহ্মা জাবালিকে উদ্দেশ করিয়া বললেন, "হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্য আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন করো। তোমকে কেহ বিনিষ্ট করিবে না, অপরেও যেন

তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।"

স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এর আগে অনেকবার বলেছি পরশুরামের হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। পরশুরামের চোখে আদর্শপুরুষ জাবালি। অমরনাথে ও কমলাকান্তে মিলিয়ে নিলে, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের, ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বারে বারে পরশুরামের তুলনা করেছি, আবার করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের চোখে আদর্শপুরুষ মুক্তামালা গল্প পর্যায়ের সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। গড়গড়ি সরল ভাবে স্বীকার করেছে, (যেন অপরাধ স্বীকার) "ভালরূপ লেখা পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার, ইহাই ধর্ম।" ত্রৈলোক্যনাথের জীবনেও এই ছিল নীতি ও প্রকৃতি। তার হাস্যরসের প্রচ্ছন্ন অশ্রুর জগতের Symbolic Hero সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। একজনে ঘনীভূত অশ্রু, অপরজনে ঘনীভূত তিরস্কার। এইভাবে দুইজনে হাসির বর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্ত।

॥ ১১ ॥

এবারে আর গ্রন্থ হিসাবে নয় বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে গল্পগুলির আলোচনা করবো। অনেকগুলি পর্যায়ক্রম পরশুরামে আছে, তার মধ্যে পৌরাণিক, কেদার চাটুজ্যে, জটাধর পর্যায়গুলি প্রধান। অন্য গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও পর্যায়-রূপে তাদের তেমন গুরুত্ব নাই, অর্থাৎ এই সব গল্পে পর্যায়ের বিস্তার সঙ্কীর্ণ।

চিত্তাকর্ষকগুণ কেদার চাটুজ্যে ও জটাধর পর্যায়ে অধিক হলেও চিন্তাকর্ষকগুণ পৌরাণিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি। সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরশুরামের চিন্তায় এগুলি বাহন। কত বিষয়ে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, কত সমস্যা যে তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে গল্পগুলি সেই পরিচয় বহন করেছে।

অনেকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে, পরশুরামের হাতে পড়ে পৌরাণিক নরনারীর বা কাহিনীর অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। একথা সত্য নয়, তবে পুরাণের সঙ্গে গল্পগুলির যে ভেদ ঘটে গিয়েছে তা অবশ্যই সত্য। এ ভেদ কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। পুরাণগুলিতেও সমস্ত কাহিনী এক রূপ নয়, বিভিন্ন পুরাণে একই কাহিনীর রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। সেও একই কারণে, কালেরও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। কালের ও লেখকের দাবী অনুসারে পরশুরামের হাতে পুরাণের জন্মান্তর ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

রামরাজ্য ও চিরঞ্জীবে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ। রামরাজ্য গল্পে মিডিয়াম-রূপে ভূতগ্রস্ত ভূতনাথ যে গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা কখনোই আধামূর্খ ভূতনাথের দ্বারা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাঠকের মনে এই সন্দেহটুকু লেখক জাগিয়ে রেখেছেন, পাঠক ভাবতে থাকে তবে কি সত্যই সে ভূতাবিষ্ট হয়েছিল? ভূতনাথ কথিত তত্ত্বগুলিকে সে গ্রহণ করলেও ভূতনাথের নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে তার বাধে। এই বাধাটুকু সৃষ্টি খুব মুনশীয়ানার কাজ।

চিরঞ্জীবেও তা-ই। চিরঞ্জীব কে? বিভীষণ ছাড়া আর কে হবে? অথচ স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

গুলবুলিস্তান আরব্য-উপন্যাসের উপসংহার, ভারতীয় পুরাণের রূপান্তর নয়, অন্য নামের অভাবে তাকে পৌরাণিক বলেই ধরা উচিত।

দশকরণের বানপ্রস্থে সুখের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশকরণ নানা অবস্থার মধ্যে সুখের সন্ধান করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরের ঘর ছেয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সুখ নাই, পরোপকারই যথার্থ সুখ। ব্যঙ্গরসিক কমলাকান্তেরও এই সিদ্ধান্ত। অপর দুইজন অতিশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক বার্ণাড শ ও ভলটেয়ার শেষ পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Candida এবং Blackgirl in Search of God এই দুই অমর গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত। দশকরণ ঘরামী বৃত্তি ছেড়ে সিংহাসনে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়দ্যুতসভায় দেখানো হয়েছে, অধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ রাজনীতির চিরস্বীকৃত নীতি। এই নীতির প্রেরণাকেই শকুনির ভ্রাতা মতকুনি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যুতের সাহায্য লইতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভীম গীতা গল্পে ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন কাপুরুষতা ও ধর্মভীরুতা কোনটাই তার চরিত্রের লক্ষণ নয় ; সে মধ্যপন্থী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর উচ্চ আদর্শ নিয়ে থাকুন, ভীম ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য করবে। এই গল্পে চোক্‌মল্ল আর তক্‌মল্ল নামে কৃষ্ণের দুইজন সেবকের উল্লেখ আছে, তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'দুর্বলের একমাত্র উপায় জোটবাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংহীকেও জব্দ করতে পারে।' বর্তমান যুগ এই নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

ভরতের ঝুমঝুমি ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য।

অগস্ত্যদ্বার রাজাদের জিগীষার মূঢ়তা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্যে পরিপূর্ণ।

বালখিল্যগণের উৎপত্তি চিন্তাশীল মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখকের অভিমত এই যে, বালখিল্যগণের লীলা পৌরাণিক কালেই সীমাবদ্ধ নহে, যুগে যুগে সে লীলা পুনঃঅভিনয় হয়ে থাকে, বর্তমান যুগ সেই লীলার প্রশস্ত আসর।

তিন বিধাতা গল্পে পাপের উৎপত্তি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আছে। লেখকের বক্তব্য এই যে, বিধাতা পাপপুণ্যের অতীত, তাঁর চোখে সবই সমান, মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলেই পাপপুণ্যের ভেদ করে আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অসীমকালের অধীশ্বর বিধাতা নিরুদ্বিগ্ন। পাপ ও পুণ্য দুই-ই জীবনের অপরিহার্য লক্ষণ। কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা চলে না।

গন্ধমাদন বৈঠকে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু সম্ভব নহে। যুদ্ধের আগে ধর্মের প্রেরণায় যেমনই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, যুদ্ধকালে তার ব্যভিচার ঘটবেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। হয় যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করতে হবে, নয় যুদ্ধে অধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে।

নির্মোক নৃত্যে জীবনে একটি গভীর জিজ্ঞাসাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত সৌন্দর্য রূপাশ্রয়ী নয়, তার স্থান আরও গভীরে। উর্বশীর পরাজয়ে এই সত্যটি দেখানো হয়েছে।

যযাতির জরা গল্পে দেখানো হয়েছে যে, তথাকথিত সন্ন্যাস বাসনার মূলচ্ছেদ করতে অক্ষম। বাসনা যখন রূপসী নারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন সন্ন্যাসের সযত্ন-রচিত তাসের ঘর মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

ডম্বরু পণ্ডিত একজন মুখ্য আদর্শবাদী, তাই কোথাও সে প্রতিষ্ঠালাভ করতে

পারেনি। আদর্শবাদের সঙ্গে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধ নেই এই কথাই বোধ করি লেখক বলতে চান।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। আগেই বলেছি আবার বলতে ক্ষতি নেই, এই পর্যায়ের আদি ও শ্রেষ্ঠ গল্প জাবালি। শুধু তাই নয় মুক্তমতি সংস্কারমুক্ত জাবালি পরশুরামের Symbolic Hero.

আর একটি পর্যায় আছে যার প্রধান ব্যক্তি কেদার চাটুজ্যে। সে বক্তা ও প্রবক্তা দুই-ই। এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ, গুরুবিদায়, রাতারাতি স্বয়ংবরা, দক্ষিণরায় ও মহেশের মহাযাত্রা গল্পগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অভিযোগে আমরা কোনটিকেই ছাড়তে রাজী নই। ব্যঙ্গ-সমাজচিত্র হিসাবে এই পর্যায়টিকে পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে, নখদর্পণে বিম্বিত। ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজ্যের গল্প-ব্যাখ্যান, কি তার তুলনা দেব জানি না। এই বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র কেদার চাটুজ্যেতেই তা সম্ভব। এই গল্পের একটি প্রধান পাত্র লম্বকর্ণকে ভুলি নাই, বংশলোচনবাবুর অনেক অন্ন সে ধ্বংস করেছে এবং গুরুবিদায় গল্পে নিজের কীর্তি দ্বারা সমস্ত অন্নঋণ শোধ করে দিয়েছে।

জটাধর বক্‌শী সিরিজের তিনটি গল্প। জটাধর বকশী ভণ্ড ও জোচ্চোর। কিন্তু হলে কি হয়, তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ভাব তার উপরেই কাউকে রাগ করতে দেয় না। চাঙ্গায়নি সুধা সমূল্যে বিতরণ করে যখন সে সকার্য সিদ্ধি করছে, তখনও তার উপরে রাগ করা অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে সে পকেট মারছে, তখনও মনে হয় যা করছে করুক কেবল আর কিছুক্ষণ কথা বলুক, তার কথাবার্তাতেই চাঙ্গায়নি সুধার উন্মাদক শক্তি বিদ্যমান। ডিকেন্স যে সব প্রতিভাবান জোচ্চোর সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে বেশ মিলত জটাধর বক্‌শীর।

মাঙ্গলিক ও গামানুষ জাতির কথা গল্প দুটিতে চরিত্রগুলি ঠিক মানুষ নয়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত ব্যক্তি মাঙ্গলিক, তার চোখে পৃথিবীর সমস্তই অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক। গামানুষ জাতির কথা পাত্রগুলি মানুষ নয়, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গোড়ায় ছিল ইঁদুর, এখন

আণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার, অন্য শব্দের অভাবে মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কি বলব, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস এই গল্পে।

বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি, যে আদর্শবাদ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, পরশুরামের অনুকম্পা মিশ্রিত হাস্যের ভাব আছে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর, নিধিরামের নির্বন্ধ, অক্রূর সংবাদ, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা ও সিদ্ধিনাথের প্রলাপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর ও নিধিরাম অবিমিশ্র সং প্রকৃতির লোক, খাঁটি আদর্শবাদী। কাজেই তাদের পরিণাম দুঃখের। আদর্শবাদ ও পাগলামি যে কোন কোন সময়ে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, অক্রূর সংবাদ তার একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময়ে আদর্শবাদে মানুষকে যে নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যায়, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা তার একটি উদাহরণ। মোটকথা এই যে, আদর্শবাদকে পরশুরাম অশ্রদ্ধা করেন না কিন্তু সেই আদর্শবাদ যখন একান্ত হয়ে উঠে কাণ্ডজ্ঞানকে বর্জন করে, তখন তাকে ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত হলে তবেই তা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। বোধ করি এই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

॥ ১২ ॥

ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট্, বার্নাড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্যপক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতে ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় সুষ্ঠু নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রণ ও হায়নে। কীটস সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।

পরশুরামের ব্যঙ্গদৃষ্টি ব্যঙ্গের স্বাভাবিক উপাদানের দিকে নিবদ্ধ হলেও, সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার রচিত প্রেমের গল্প সংখ্যায় সামান্য কয়টি, তার উপরে আবার তাতে প্রেমের উন্মাদনা নেই, এমন কি প্রথম নজরে অনেক সময়ে সেগুলি যে প্রেমের গল্প তা খেয়াল হয় না। তবু সেগুলি প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই স্বল্প সংখ্যকের কয়েকটি পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। আনন্দীবাঈ, যশোমতী, রটন্তী-কুমার, চিঠি বাজি, জয়হরির জেব্রা, নীলতারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলিতে প্রেমের প্রকৃতি আবার এক রকম নয়।

আনন্দীবাঈ গল্পে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

যশোমতীতে কিশোর-কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘ কাল-সমুদ্র ডুব সাঁতারে পার হয়ে যখন আবার মুখোমুখী হল তখন পাত্র বৃদ্ধা ও পাত্রী বৃদ্ধ ও পিতামহী। তারা একদিন প্রেমকে দেখেছিল পূর্বাচলের তীর থেকে আজ দেখালো অস্তাচলের তীরে এসে, মাঝখানে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ। তাদের চোখে অস্তাচলের দৃশ্যও কম মনোরম নয়, কেননা তা পলে পলে পুরাতন হয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে সমর্থ হয়েছে। প্রেমের উত্তাল সমুদ্র এখন তুষারে শুভ্র ও শান্ত, তাই বলে তার সৌন্দর্য অল্প নয়।

রটন্তীকুমারে ধনী পাত্রের সঙ্গে দরিদ্র পাত্রীর কোর্টশিপ বড় নিপুণভাবে, বড় সুকুমারভাবে, বড় আত্মসম্মান রক্ষা করে অঙ্কিত হয়েছে।

চিঠিবাজিতে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পরীক্ষা করে নিয়েছে। এ প্রেম একটু Intellectual, তাই বলে Emotion-এ কমতি পড়েনি। দু'জনের বাসরের সংলাপটুকু পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।

নীলতারাতে পথভ্রান্ত প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

জয়হরির জেব্রা প্রায় Taming of the Shrew। অদৃষ্টের আঘাতে বেতসী খঞ্জিনী হয়েছে। ঐটুকুর প্রয়োজন ছিল খঞ্জ জয়হরির অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার জন্যে।

গল্পগুলি প্রেমের নিঃসন্দেহ, তবে সে-সব গল্পে যে মামুলী উপাদান ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ থাকে তা একেবারেই নেই, মানব স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এগুলিও পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের রচনা, তবে মননের রেখা গভীর নয়, রঙটাও হাল্কা।

॥ ১৩ ॥

আর কয়েকটি গল্প আছে যাদের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু তাদের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভূষণ পাল ও দাঁড়কাগ গল্প দুটিতে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। পরশুরামে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিরল বলেই গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নামান্তরে তমিস্রা নামান্তরে দাঁড়কাগ বা কৌয়া দিদি নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে কোন মেয়ে সচেতন অর্থাৎ নিঃসন্দেহ হলে তার মন বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হতে বাধ্য, চরাচরের ষড়যন্ত্রেই এমনটি হয়েছে বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস। কৌয়াদিদি কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ফাঁদে পা দেয়নি, বিদ্বেষকে নিজের বিরুদ্ধে আরোপ করে নিজেকে নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারে। এ কাজ যে পারে তাকে আহত করা কঠিন। কৌয়াদিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপরে হাসির সূর্যকিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।

ভূষণ পাল এমনি আর একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রু (অনতিপ্রচ্ছন্ন) কাহিনী। খুনী আসামী ফাঁসির বলি। এমন লোকের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে এখানে সেটাই অত্যন্ত সহজে দেখানো হয়েছে। অপটু লেখকের হাতে পড়লে চোখের জলের ঢেউ বয়ে যেতো, এখানে গোটা দুই চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মাত্র শ্রুত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকবার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছা করে। গল্পটি শিউলি ফুলের মতো সুকুমার ও স্পর্শকাতর, এর মধ্যে কোথায় যেগল্প বুদ্ধি বুঝতে অক্ষম। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।

॥ ১৪ ॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক গূঢ়ার্থ ব্যঙ্গ মন্তব্য পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে ছড়ানো আছে সত্য, কিন্তু সরাসরি বিষয়টি নিয়ে লিখিত গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। দুই সিংহ, রামধনের বৈরাগ্য, বটেশ্বরের অবদান ও দ্বান্দ্বিক কবিতা গল্প কয়টিকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয় বলা যেতে পারে।

দুই সিংহ সাহিত্যিকের আত্মম্ভরিতায় হাস্যকর। রামধনের বৈরাগ্য এক

শ্রেণীর সাহিত্যিকের মনোভাব সম্বন্ধে এবং বটেশ্বরের অবদান এক শ্রেণীর পাঠকের উপরে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র। দ্বান্দ্বিক কবিতা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিণাম সম্বন্ধীয় সরস বিবরণ।

১৯২২-এ প্রথম গল্প প্রকাশের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরশুরামের যে গল্প-ধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পগুলিতে চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগেকার সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তৎপরবর্তী অশান্ত অবস্থা রামরাজ্য, শোনা কথা, বালখিল্যগণের উৎপত্তি, গগন চটি, মাৎস্য ন্যায়, ভীম গীতা প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত। কালান্তরে অবস্থান্তর ব্যঙ্গ রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পর্যায়ক্রমে আলোচিত গল্পগুলির বাইরে এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে। লক্ষ্মীর বাহন, পরশপাথর, বরনারীবরণ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, চিকিৎসা-সঙ্কট, ভুশণ্ডির মাঠে, কচি-সংসদ, বিরিঞ্চি-বাবা, কাশীনাথের জন্মান্তর প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ ১৫ ॥

এবারে উপসংহার। আমাদের যা বক্তব্য প্রবন্ধ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে তা কথিত হয়েছে। উপসংহারে সেই সব পুরোনো কথা দু-একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান কথাটা এই যে, ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্য-নাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সূক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। কঙ্কাবতীর মত উপন্যাস পরশুরাম লেখেন নি। কঙ্কাবতী উপন্যাসখানিকে অবলম্বন করলে ত্রৈলোক্যনাথের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরামের ক্ষেত্রে সেরকম কোন অবলম্বন নেই, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি গল্পকে গ্রহণ না করলে তাঁর মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গল্পলেখকের পক্ষ এ এক মস্ত অসুবিধে। দুজনেই উচ্চ-পটীয়ান স্রষ্টা, তবে দুয়ে প্রভেদ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে।

উদ্ভব ও পরিবেশের ভেদে দুজনের গল্পের বিষয়, মনোভাবে ও টেকনিকে ভেদ ঘটেছে। পরশুরামের অসুবিধে এই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে তিনি জানেন না বললেই হয়। না জানুন তাতে ক্ষতি নেই, কলকাতা শহরের অনেক পথঘাটও বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে চিত্রিত করে গিয়েছেন, সেই সব চিত্রে পাঠক বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু পায়, ফলে কলকাতা শহর ব্যঙ্গের তির্যক-ছটায় কিছু পরিমানে সত্যতর হয়ে ওঠে। আজ একশো বছরের উপরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কলকাতা শহরকে সাহিত্যের মানচিত্রে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রধান সাহিত্যিকত্রয় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তেমন কোন মন দেননি। তাঁদের রচনায় বাংলা দেশের পল্লীঅঞ্চলে সত্যতর হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স লণ্ডন শহরের জন্য যা করেছেন, কলকাতা শহরের জন্যে এখনও কেউ তা করেন নি। কলকাতা শহরের ডিকেন্স এখনও ভবিতব্যের গর্ভে। পরশুরামের রচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে এ চেষ্টা আছে। তিনি প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে Urban বা নাগরিক। সেই জন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। অন্যপক্ষে সৃষ্টির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ত্রৈলোক্যনাথে বেশী। তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। সুবল গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন হৃদয় দিয়ে, অপরজন বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেন নি। এদের দুজনকে ব্যঙ্গ রসিকদ্বয় Symbolic Hero বলেছে, ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠকের সম্মুখে এনে দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

॥ ১৬ ॥

রাজশেখর বসু স্বনামে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান চলন্তিকা অভিধান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ।

সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে

সব শব্দ সাহিত্যে ও সংলাপে নিত্য চলে চলন্তিকা তারই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাভাষা, বানান ও বানানচিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং প্রুফ-রিডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিধানের স্থান আলমারীতে, চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

কোন বৃহৎগ্রন্থের সংক্ষেপণ একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য। সে গ্রন্থ আবার যদি মহৎ হয়, তবে এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যবায়ের পর্যায়ে পৌছতে পারে, কিন্তু রাজশেখর বসু প্রত্যবায়গ্রস্ত হননি তার কারণ রামায়ণ মহাভারত তথা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ মহাভারতকে নবকলেবর দান করেছেন। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ, কাজেই এখানে কার্যটি দুষ্কর হয়নি। মূল কাহিনীকে সহজ বাহ্য আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা তর্কাতীত নয়।

কাহিনী, উপকাহিনী, উপদেশ ও অনুশাসনে গঠিত মূল মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক। এ হেন তিমিঙ্গিল মহাগ্রন্থকে আটশ পৃষ্ঠার মধ্যে আনয়ন অসম্ভব বলেই মনে করতাম, যদি না রাজশেখর বসু হাতেকলমে তা সম্পন্ন করতেন। তার এ কাজ তর্কাতীত না হতে পারে, তবে আদৌ যে সম্ভব হয়েছে তাই বিস্ময়কর। যাই হোক এই দুহ অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকে সহজায়ত্ত করে দিয়ে তিনি বাঙালীর মহৎ উপকার সাধন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়ডের মত ক্লাসিক গ্রন্থকে মূলভাষায় পাঠ করার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, সকলের পক্ষে তো কখনই হয় না, এদের মহত্ব এমন আন্তরিক যে ভাষান্তরে পাঠ করলেও তার স্বাদ লাভ করতে পারে পাঠকে। এই ভাবেই এই সব কাব্য চিরকাল পরিজ্ঞাত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু প্রদত্ত নবকলেবর সেই পরিজ্ঞপ্তির বিস্তারসাধন করে বাঙালী পাঠকের সম্মুখে আর একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

যতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত



রাজশেখর বসু

—জন্ম—
১৮ই মার্চ, ১৮৮০

—মৃত্যু—
২৭শে এপ্রিল, ১৯৬০

গড্ডলিকা

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড



মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা

আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উস্থল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল্ মার্চেন্ট্স। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাহুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস

করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঙ্গা, ওরে বাঙ্গা।' বাঙ্গা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।' বাঙ্গা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পের ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়েছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেণ্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যাম-দা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়ি-বাবুকে ধরি। সহজে কি রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেণ্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২৲ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায়, আপনার মত

বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম ক'রেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে ছু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁত খুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব!'

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটা

চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'



রাম রাম বাবুসাহেব

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জান-পহ্চান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিচ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা, মনে ক'রো না। ইংরিজী ভাল না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি ক'রে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অন্‌হেক পঢ়েছি। বঙ্কিমচন্দ্, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হ'ল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই ক'রে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকেল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রিত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ-পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেব-মন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডার-গণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের হস্তে কার্য-নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M. A., B. L. (৪) বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি, সি, চৌধুরী, B. Sc. A. S. S. (U.S.A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হ'তে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হ'ল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে প'রে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেণ্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছু দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০৲ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কি শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার ব'লেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালা বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই ছুস্‌বে না। নিস্তার্ণী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০৲ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হদ্দ্ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হ'ল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। আচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্‌লায়কে রূপয়া লিয়া—তব্?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক, একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ৺সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recovery র ব্যবস্থা থাকিবে। ৺সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মি নহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় ক'মে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেন্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেণ্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিন-বাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।



ঐসী গতি সন্‌সারমে

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কোনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ্‌ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদলাবো, দাম চঢ়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
একা পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না

হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি ব'লে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে রন্‌ছোড়জী—হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা!

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখ্‌ন চলছি, রেস খেলনে। কোন্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগাবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দূরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ'ল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে,বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফী বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী

আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কি জানেন—একটা গোলকধঁাধঁা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হ'ল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি ক'রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব'লে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফঁাকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হ'ক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুন্টিকাঃ সত্তভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্ উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় আপনায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন,

কেল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধ'রে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত ক'রব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

... .

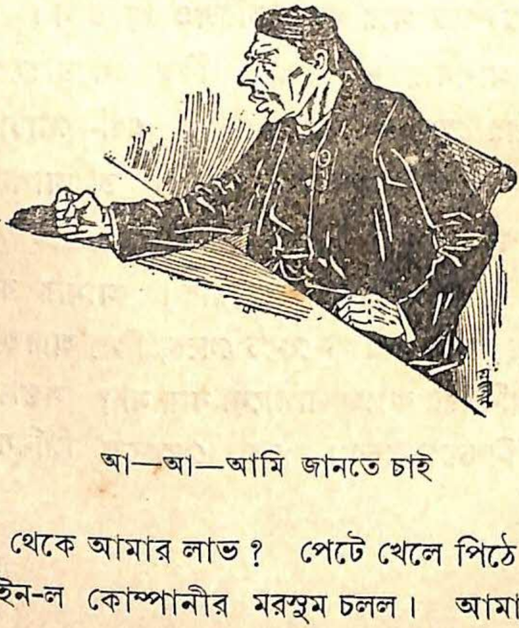
গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?



আ—আ—আমি জানতে চাই

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানীর মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক্ ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়ীতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

... ...

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানীর আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন—'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতে টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে ত্থ-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড়-একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না—জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense ইট-তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস-খরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার

ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না-হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা

হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল-শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ-শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধ'রে দিন! ধরুন—পাঁচ-শ টাকা। ট্রান্স্‌ফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহ্বা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গণিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'



কুছভি নহি

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-প'ড়ে লাগতে হ'ল

—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছু তকলিফ করতে হোবে না। কোম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কার্‌বারই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ বাদ কিলুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিণ্ড কল আদায় করবে, তব্ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিণ্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যাম-দার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্ ভি নহি, কুছ্ ভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

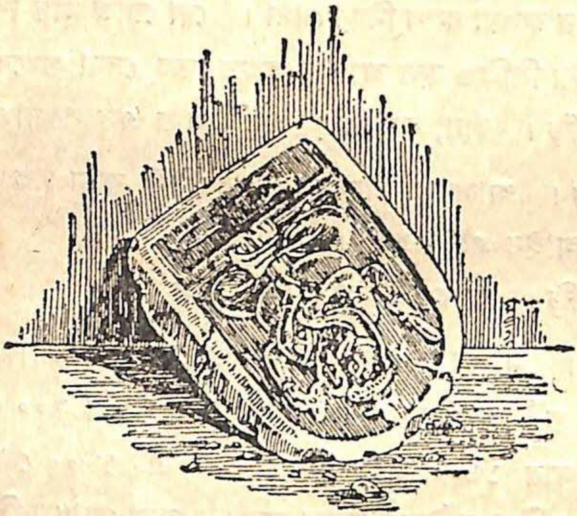
তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

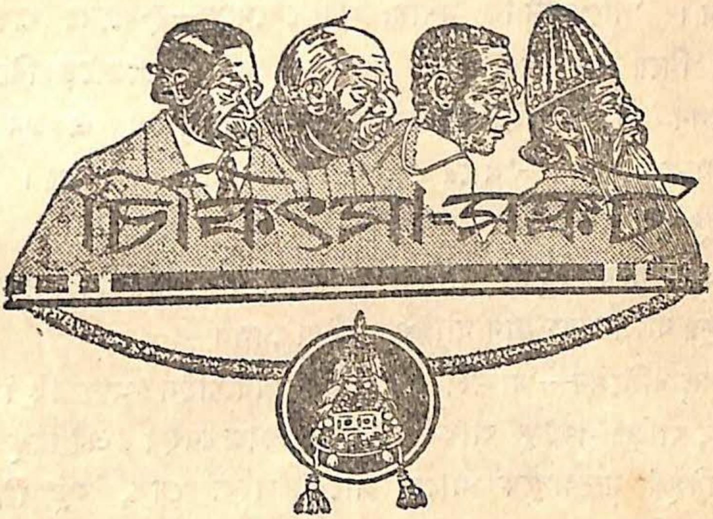
অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার

নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!





সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বীডন স্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন— ‘দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবছি।’ নন্দর দু-বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারে সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। ‘—আহা হা বড্ড লেগেছে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?’ একজন সিদ্ধান্ত করিল

মৃগি। আর একজন বলিল ভির্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। 'লাগে নি কি মশায়, খুব লেগেছে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বার বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—'আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেছে তবু বলে লাগে নি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুণ্ণ যাত্রিগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ—'

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত এক গোছা কোম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তার পর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুরসেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। প্রধান কারণ—আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসত:কোথা? তারপর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া

যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটের উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন, সেজন্য বালাপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—'উহুঁ'। শরীরের ওপর এত অযত্ন ক'রো না নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচার কাপড় বেধে—

গুপী। আরে, না না। ঘুরেছিল বইকি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বঙ্কু বলিলেন—'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।

ষষ্ঠীবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোনে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন —'বাপ, এই শীতে অবেলায় কখনও ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হ'লে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল—'নন্‌-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়হার অভাব কি বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

খাবেন না। এগ ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু বার্গণ্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন—'আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ো না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঁঃ, খুলির ওপর তুরপুন চালাবেন!'

ষষ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে তবে হাতুড়ে বদ্যির কম্ম নয়। হোমিও-প্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্বি একলোটা বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনও আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হ'লে তো আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাত্‌লুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যেবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—'ঠিক ক'রে বল।'

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।'

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে অ্যালোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে



হাঁচোর পাঁচোর করে

হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা ছ-গ্রেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।'

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন ?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি ? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলস

হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যূষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছো আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্টি মেশানো থাকে। ফী কত তাও ব'লে দিতে হবে নাকি? দেখছো না দেওয়ালে নোটিস লটকানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।'

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে ব'সে ঠিয়াটার দেখা চলত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা ক'রে থ ক'রে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেখে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ সাবড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনেছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজামহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠী। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

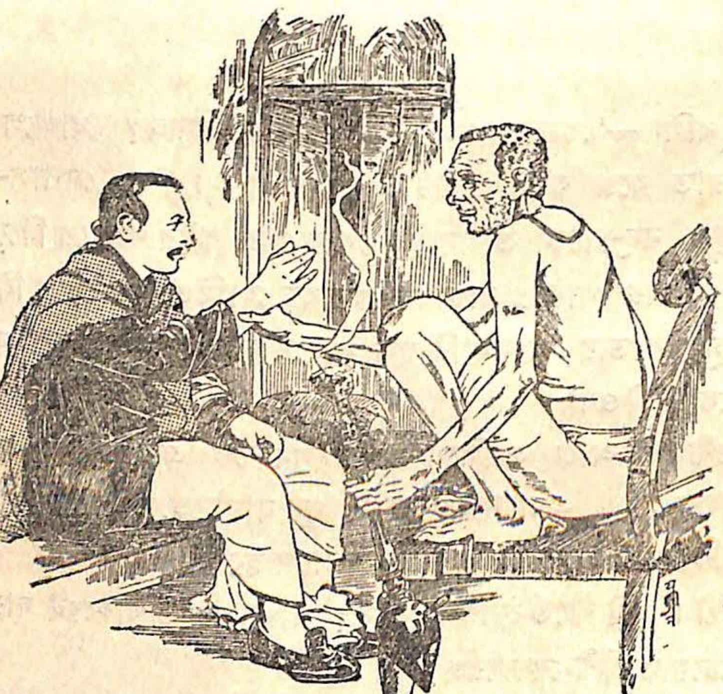
অতঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতী ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের

উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে ছুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবুর কন্‌থে আসা হচ্চে?' নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামোডা কি?



হয়, Zানতি পার না।

নন্দবাবু জানাইলেন তিনি রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল! সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M. B.-F. T. S—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হ'ল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাক্‌তি ছেলে-ছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্রচিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যন্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উকিল যন্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিন দিন অচৈতন্যি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক্ তারিণী-স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যাবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্‌লা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্‌ডা ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেচি। পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ'ল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, ঘানতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। উর্ধ্ব হয়েছে কি না। দাত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, ঘানতি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরো নি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটা শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন—'লাফাস নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্লি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যি একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পরে আস্বা। বুজেচ?'

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ এই সব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উছ্রি। উর্ধ্বশ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষচিত্তে বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কি দাদা, বোক্রেজির সাধ মিট্‌ল?'

গুপী। নাঃ এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-কথা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন—'আর পরিবার। কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল—'নন্-দা, একটা মোটর কেন মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্সন; ষেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মোটর-কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা, কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাট্ল, কাল গিন্নীর অম্বলশূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ ক'রো না নন্দ! জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান ট্যাঁ ট্যাঁ।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটি মোটা-সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত।

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্ক্ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হাকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁহাকে বলিল—'আসেন বাবুমশায়। আমি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারি বোলেন, আমি লিখে হুজুরকে ইতালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুন্সী। তব্ ভি কুছু তো বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, রাত-অন্ধি—

নন্দ। ও-সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল তড়প্‌না। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর।: না থাকে আমি দিচ্ছি। পয়তালিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা,



হড্‌ডি পিল্‌পিলায় গয়া

আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দগি জনাব বোলবেন, তার পর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাবরী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চারপাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁক্‌ড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—'আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সম্‌ঝিয়ে দিব।'

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—'স্‌র লাও!'

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল—'ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখ্‌লান।

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—'হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।'

মুন্সী। শুনছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন—'সুর্মা সুর্খ।'

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—'আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হোবে।' হাকিম আবার বলিলেন—'রোগন বব্বর।' মুন্সী হাঁকিল—'এ জী বাল্‌বর, অস্তুরা লাও।'

নন্দবাবু—'হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কি'—বলিতে বলিতে নাপিত চট্ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল—'ঘব্ড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বব্বরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাড্ডি সকত হোবে।'

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—'হামার দস্তুরি?' নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন—'হাঁকাও!'

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড়-রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—'সিধা চলো।' সংকল্প করিয়াছেন, মিটারে এক টাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন—তা সে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মান্দ্রাজী বা চাঁদসির ডাক্তার যেই হউক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল—'ডাক্তার মিস বি. মল্লিক।' নন্দবাবু 'মিস' শব্দটি লক্ষ্য

করেন নাই, নতুবা হয়তো ইতস্তত করিতেন। একবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটি-পিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'কি চাই আপনার ?'

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তার পর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—দূর হ'ক, না-হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন—'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিস মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েছে ?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস। ফার্স্ট কনফাইনমেণ্ট ?

নন্দ। আজ্ঞে ?

মিস। প্রথম পোয়াতী ?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।'

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'নিজের জন্যে ? ব্যাপার কি ?'

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?'

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন ?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসী ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কি করা হয় ?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটর-কার আছে ?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'দোহাই আপনার, সত্যি ক'রে বলুন আমার কি হয়েছে। টিউমার, না পাথুরি, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া ?'

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন—'কেন আপনি ভাবছেন ? ও-সব কিছুই হয় নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'



দি আইডিয়া!

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন—'তবে কি আমি পাগল হয়েছি ?'

মিস মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ও ডিয়ার ডিয়ার নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।'



বিপুলানন্দ

নন্দ। কেন পিসীমা তো আছেন।

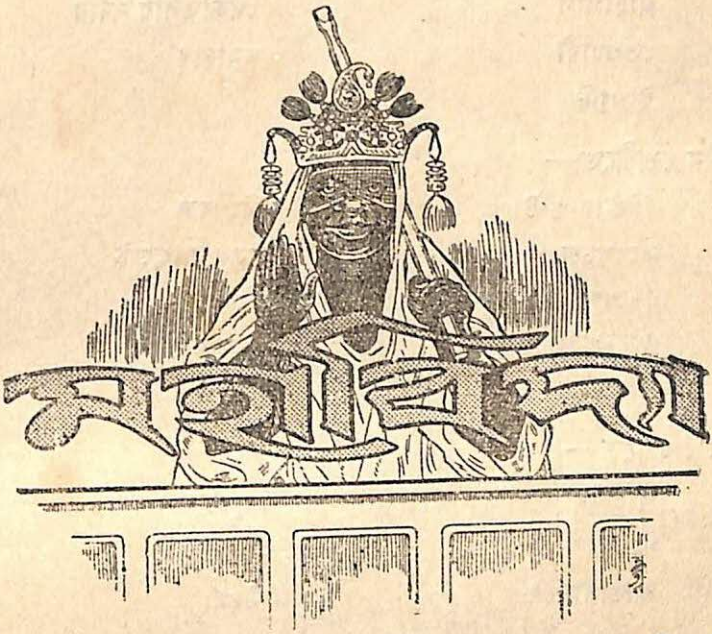
মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—'দি আইডিয়া! মাসী-পিসীর কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হপ্তা পরে আবার আসবেন।

... .

নন্দবাবু সাত দিন পরে পুনরায় মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তার পর দু-দিন পরে আবার গেলেন। তার পর প্রত্যহ।

তার পর একদিন নন্দবাবু পিসীমাতাকে ৺কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। এক ঝুড়ি গল্‌দা চিংড়ি, এক ঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপুলা মিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটর-কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।



বক্তৃতা-গৃহ। উচ্চ বেদীর উপর আচার্যের আসন। বেদীর নীচে ছাত্রদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার ও বেঞ্চ।

প্রথম শ্রেণীতে আছেন—

হোমরাও সিং	মহারাজা
চোমরাও আলি	নবাব
খুদীন্দ্রনারায়ণ	জমিদার
মিস্টার গ্র্যাব	বণিক
মাস্টার হাউলার	সম্পাদক
ইত্যাদি	

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুহা	রাজনীতিজ্ঞ
নিতাইবাবু	সম্পাদক

প্রফেসার গুঁই	অধ্যাপক
রূপচাঁদ	বণিক
লুটবেহারী	ইনসলভেন্ট
গাঁট্টালাল	গেঁড়াতলার সর্দার
তেওয়ারী	জমাদার
ইত্যাদি	

তৃতীয় শ্রেণীতে—

মিস্টার গুপ্টা	বিশেষজ্ঞ
সরেশচন্দ্র	নূতন গ্রাজুয়েট
নিরেশচন্দ্র	ঐ
দীনেশচন্দ্র	কেরানী
ইত্যাদি	

চতুর্থ শ্রেণীতে—

পাঁচুমিয়া	মজুর
গবেশ্বর	মাষ্টার
কাঙালীচরণ	নিষ্কর্মা

আরও অনেক লোক

প্রথম শ্রেণীর কথা

মিস্টার গ্র্যাব। হ্যাল্লো মহারাজ, আপনিও দেখছি ক্লাসে জয়েন করেছেন।

হোমরাও সিং। হ্যাঁ, ব্যাপারটা জানবার জন্য বড়ই কৌতূহল হয়েছে। আচ্ছা, এই জগদ্‌গুরু লোকটি কে?

গ্র্যাব। কিছুই জানি না। কেউ বলে, এঁর নাম ভ্যাণ্ডারলুট, আমেরিকা থেকে এসেছেন; আবার কেউ বলে, ইনিই প্রফেসার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। ফাদার ওব্রায়েন সেদিন বলেছিলেন, লোকটি devil himself—শয়তান স্বয়ং। অথচ রেভারেণ্ড ফিগ্‌স বলেন,

ইনি পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি, একজন সুপারম্যান। একটা কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট পেয়েছি, তাই মজা দেখতে এলুম।

মিস্টার হাউলার। আমিও একখানা পেয়েছি।

হোমরাও। বটে? আমরা তো টাকা দিয়ে কিনেছি, তাও অতি কষ্টে। হয়তো জগদ্‌গুরু জানেন যে আপনাদের শেখবার কিছু নেই, তাই কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট দিয়েছেন।

খুদীন্দ্রনারায়ণ। শুনেছি লোকটি নাকি বাঙালী, বিলাত থেকে ভোল ফিরিয়ে এসেছে। আচ্ছা, বলশেভিক নয় তো?

চোমরাও আলি। না না, তা হ'লে গভর্নমেণ্ট এ লেক্‌চার বন্ধ ক'রে দিতেন। আমার মনে হয়, জগদ্‌গুরু তুর্কি থেকে এসেছেন।

হাউলার। দেখাই যাবে লোকটি কে!

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা

নিতাইবাবু। জগদ্‌গুরু কোথায় উঠেছেন জানেন কি? একবার ইণ্টারভিউ করতে যাব।

মিস্টার গুহা। শুনেছি, বেঙ্গল ক্লাবে আছেন।

রূপচাঁদ। না—না, আমি জানি, পগেয়াপটিতে বাসা নিয়েছেন।

লুটবেহারী। আচ্ছা উনি যে মহাবিদ্যার ক্লাস খুলেছেন, সেটা কি? ছেলেবেলায় তো পড়েছিলুম—কালী, তারা, মহাবিদ্যা—

প্রফেসার গুঁই। আরে, সে বিদ্যা নয়। মহাবিদ্যা—কিনা সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা, যা আয়ত্ত হ'লে মানুষের অসীম ক্ষমতা হয়, সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ হয়।

রূপচাঁদ। এখানে তো দেখছি হাজারো লোক লেকচার শুনতে এসেছে। সকলেরই যদি প্রভুত্ব লাভ হয় তবে ফরমাশ খাটবে কে?

গাঁট্টালাল। এইজন্যে ভাবছেন? আপনি হুকুম দিন, আমি আর তেওয়ারী দুই দোস্ত্‌ মিলে সবাইকে হাঁকিয়ে দিচ্ছি। কিছু পান খেতে দেবেন—

তেওয়ারি। না—না, এখন গণ্ডগোল বাধিও না,—সায়েবরা রয়েছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কথা

সরেশ। আপনিও বুঝি এই বৎসর পাস করেছেন? কোন্ লাইনে যাবেন, ঠিক করলেন?

নিরেশ। তা কিছুই ঠিক করিনি। সেইজন্যই তো মহাবিদ্যার ক্লাসে ভর্তি হয়েছি,—যদি একটা রাস্তা পাওয়া যায়। আচ্ছা এই কোর্স অভ লেকচার্স আয়োজন করলে কে?

সরেশ। কি জানি মশায়। কেউ বলে, বিলাতের কোনও দয়ালু ক্রোরপতি জগদ্গুরুকে পাঠিয়েছেন। আবার শুনতে পাই, ইউনিভার্সিটিই নাকি লুকিয়ে এই লেকচারের খরচ যোগাচ্ছে।

মিস্টার গুপ্টা। ইউনিভার্সিটির টাকা কোথা? যেই টাকা দিক, মিথ্যে অপব্যয় হচ্ছে। এ রকম লেকচারে দেশের উন্নতি হবে না। ক্যাপিট্যাল চাই, ব্যাবসা চাই।

দীনেশ। তবে আপনি এখানে এলেন কেন? এইসব রাজা-মহারাজারাইবা কি জন্য ক্লাসে অ্যাটেণ্ড করছেন? নিশ্চয়ই একটা লাভের প্রত্যাশা আছে। এই দেখুন না, আমি সামান্য মাইনে পাই, তবু ধার ক'রে লেকচারের ফী জমা দিয়েছি—যদি কিছু অবস্থার উন্নতি করতে পারি।

সরেশ। জগদ্গুরু আসবেন কখন? ঘণ্টা যে কাবার হয়ে এল।

চতুর্থ শ্রেণীর কথা

গবেশ্বর। কিহে পাঁচুমিয়া, এখানে কি মনে করে?

পাঁচুমিয়া। বাবুজী, এক টাকা রোজে আর দিন চলে না। তাই থারিয়া-লোটা বেচে একটা টিকিট কিনেছি, যদি কিছু হদিস পাই। তা আপনারা এত পিছে বসেছেন কেন হুজুর? সামনে গিয়ে বাবুদের সাথ বসুন না!

কাঙালীচরণ। ভয় করে।

গবেশ্বর। আমরা বেশ নিরিবিলিতে আছি। দেখ পাঁচু, তুমি যদি বক্তৃতার কোনও জায়গা বুঝতে না পার তো আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

ঘণ্টাধ্বনি। জগদ্‌গুরুর প্রবেশ। মাথায় সোনার মুকুট, মুখে মুখোশ, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। তিনি আসিয়া বহির্বাস খুলিয়া ফেলিলেন। মাথা কামানো, গায়ে তেল, পরনে লেংটি, ডান-হাতে বরাভয়, বাঁ হাতে সিঁধকাটি। পট্‌ পট্‌ হাততালি।

হোমরাও। লোকটির চেহারা কি বীভৎস! চেনেন নাকি মিস্টার গ্র্যাব?

গ্র্যাব। চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।

জগদ্‌গুরু। হে ছাত্রগণ, তোমাদের আশীর্বাদ করছি জগজ্জয়ী হও। আমি যে-বিদ্যা শেখাতে এসেছি তার জন্য অনেক সাধনা দরকার—তোমরা একদিনে সব বুঝতে পারবে না। আজ আমি কেবল ভূমিকা মাত্র বলব। হে বালকগণ, তোমরা মন দিয়ে শোন—যেখানে খটকা ঠেকবে, আমাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

প্রফেসার গুঁই। আমি স্ট্রংলি আপত্তি করছি—জগদ্‌গুরু কেন আমাদের 'বালকগণ—তোমরা' বলবেন? আমরা কি স্কুলের ছোকরা? এটা একটা রেস্পেক্‌টেব্‌ল গ্যাদারিং। এই মহারাজা হোমরাও সিং, নবাব চোমরাও আলি রয়েছেন। পদমর্যাদা যদি না ধরেন, বয়সের একটা সম্মান তো আছে। আমাদের মধ্যে অনেকের বয়স ষাট পেরিয়েছে।

হাউলার। আপনাদের বাংলা ভাষার দোষ। জগদ্‌গুরু বিদেশী লোক, 'আপনি' 'তুমি' গুলিয়ে ফেলেছেন। আর 'বালক' কথাটা কিছু নয়, ইংরেজীর ওল্ড বয়।

খুদীন্দ্র। বাংলা ভাল না জানেন তো ইংরেজীতে বলুন না।

গুঁই। যাই হ'ক আমি আপত্তি করছি।

মিস্টার গুহা। আমি আপত্তির সমর্থন করছি।

জগদ্‌গুরু (সহাস্যে)। বৎস, উতলা হয়ো না। আমি বাংলা ভালই জানি। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী, সবই আমার মাতৃভাষা। আমি প্রবীণ লোক, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধ'রে এই মহাবিদ্যা শেখাচ্ছি। তোমরা আমার স্নেহের পাত্র, 'তুমি' বলবার অধিকার আমার আছে।

লুটবেহারী। নিশ্চয় আছে। আপনি আমাদের 'তুমি, তুই'—যা খুশি বলুন। আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না। মোদ্দা, শেষকালে ফাঁকি দেবেন না।

জগদ্‌গুরু। বাপু, আমি কোনও জিনিস দিই না, শুধু শেখাই মাত্র। যা হ'ক, তোমাদের দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। এমন-সব সোনার চাঁদ ছেলে—কেবল শিক্ষার অভাবে উন্নতি করতে পারছ না!

মিস্টার গুপ্টা। ভণিতা ছেড়ে কাজের কথা বলুন।

জগদ্‌গুরু। হে ছাত্রগণ, মহাবিদ্যা না জানলে মানুষ সুসভ্য ধনী মানী হ'তে পারে না, তাকে চিরকাল কাঠ কাটতে আর জল তুলতে হয়। কিন্তু এটা মনে রেখো যে, সাধারণ বিদ্যা আর মহাবিদ্যা এক জিনিস নয়। তোমরা পদ্যপাঠে পড়েছ—

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই কথা সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু মহাবিদ্যার বেলায় নয়। মহাবিদ্যা কেবল নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকে অতি সন্তর্পণে শেখাতে হয়। বেশী প্রচার হ'লে সমূহ ক্ষতি। বিদ্বানে বিদ্বানে সংঘর্ষ হ'লে একটু বাক্যব্যয় হয় মাত্র, কিন্তু মহাবিদ্বান্‌দের ভিতর ঠোকাঠুকি বাধলে সব চুরমার। তার সাক্ষী এই ইওরোপের যুদ্ধ। অতএব মহাবিদ্বান্‌দের একজোট হয়েই কাজ করতে হবে।

হাউলার। আমি এই লেকচারে আপত্তি করছি। এদেশের

লোকে এখনও মহাবিদ্যালাভের উপযুক্ত হয় নি। আর আমাদের মহাবিদ্বান্‌রা দেশী মহাবিদ্যান্‌দের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে না। মিথ্যা একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

গ্র্যাব। চুপ কর হাউলার। মহাবিদ্যা শেখা কি এ দেশের লোকের কর্ম? লেকচার শুনে হুজুকে প'ড়ে যদি মহাবিদ্যা নিয়ে লোক একটু ছেলেখেলা আরম্ভ করে, মন্দ কি? একটু অন্যদিকে ডিস্‌ট্রাক্‌শন হওয়া দেশের পক্ষে এখন দরকার হয়েছে।

হাউলার। সাধারণ বিদ্যা যখন এদেশে প্রথম চালানো হয় তখনও আমরা ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা মনে করেছিলুম। এখন দেখছ তো ঠেলা? জোর ক'রে টেক্স্‌ট বুক থেকে এটা-সেটা বাদ দিয়ে কি আর সামলানো যাচ্ছে?

খুদীন্দ্র। মিস্টার হাউলার ঠিক বলছেন। আমারও ভাল ঠেকছে না।

চোমরাও আলি। ভাল-মন্দ গভর্নমেণ্ট বিচার করবেন। তবে মহাবিদ্যা যদি শেখাতেই হয়, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

জগদ্‌গুরু। সাধারণ বিদ্যা মোটামুটি জানা না থাকলে মহাবিদ্যায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে দুই বিদ্যার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। এ-দেশেও যে মহাবিদ্যান্‌ নেই, তা নয়—

গাট্টালাল। হুঁ হুঁ গুরুজী আমাকে মালুম করছেন।

রূপচাঁদ। দূর, তোকে কে চেনে? আমার দিকে চাইছেন।

জগদ্‌গুরু। তবে মূর্খ লোকে মহাবিদ্যার প্রয়োগটা আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশ এ বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত। জরির খাপের ভিতর যেমন তলোয়ার ঢাকা থাকে, মহাবিদ্যাকেও

তেমনি সাধারণ বিদ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মহাবিদ্যার মূল সূত্রই হচ্ছে—যদি না পড়ে ধরা।

প্রফেসার গুঁই। আপনি কী সব খারাপ কথা বলছেন!

অনেকে। শেম, শেম।

জগদ্‌গুরু। বৎস, লজ্জিত হয়ো না। তোমাদেরই এক পণ্ডিত বলেন—একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবনবিজয়ী ভব। যদি মহাবিদ্যা শিখতে চাও তবে সত্যের উলঙ্গ মূর্তি দেখে ডরালে চলবে না। যা বলছিলুম শোন। —এই মহাবিদ্যা যখন মানুষ প্রথমে শেখে তখন সে আনাড়ী শিকারীর মত বিদ্যার অপপ্রয়োগ করে। যেখানে ফাঁদ পেতে কার্যসিদ্ধি হ'তে পারে সেখানে সে কুস্তি ল'ড়ে বাঘ মারতে যায়। দু-চারটে বাঘ হয়তো মরে; কিন্তু শিকারীও শেষে ঘায়েল হয়। বিদ্যাগুপ্তির অভাবেই এই বিপদ হয়। মানুষ যখন আর একটু চালাক হয়, তখন সে ফাঁদ পাততে আরম্ভ করে, নিজে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু গোটাকতক বাঘ ফাঁদে পড়লেই আর সব বাঘ ফাঁদ চিনে ফেলে, আর সেদিকে আসে না, আড়াল থেকে টিটকারি দেয়, শিকারীরও ব্যাবসা বন্ধ হয়। ফাঁদটা এমন হওয়া চাই যেন কেউ ধ'রে না ফেলে। মহাবিদ্যাও সেই রকম গোপন রাখা দরকার। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কেবল সংস্কারবশে মহাবিদ্যার প্রয়োগ কর। এতে কখনও উন্নতি হবে না। পরের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ; কিন্তু নিজের কাছে লুকোলে মহাবিদ্যায় মরচে পড়বে। সজ্ঞানে ফলাফল বুঝে মহাবিদ্যা চালাতে হয়।

গুঁই। বড়ই গোলমেলে কথা।

লুটবেহারী। কিছু না, কিছু না। জগদ্‌গুরু নূতন কথা আর কি বলছেন। প্র্যাক্‌টিস আমার সবই জানা আছে, তবে থিওরিটা শেখবার তেমন সময় পাইনি।

গুহা। এতদিন ছিলে কোথা হে?

লুটবেহারী। শ্বশুরবাড়ি। সেদিন খালাস পেয়েছি।

গুহা। নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই তো ধরা দিয়ে ফেললে।

লুটবেহারী। আপনাকে বলতে আর দোষ কি। দু-জনেই মহাবিদ্বান্, মাসতুতো ভাই।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুহা। আচ্ছা গুরুদেব, মহাবিদ্যা শিখলে কি আমাদের দেশের সকলেরই উন্নতি হবে?

জগদ্‌গুরু। দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ্ যা দেখছ, তার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়ানো যায় না। সকলেই যদি সমান ভাগে পায়, তবে কারও পেট ভরে না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয় না। কাজেই জগতের ব্যবস্থা এই হয়েছে যে জনকতক ভোগদখল করবে, বাকি সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান্ আর একগাদা মহামূর্খ।

খুদীন্দ্র। শুনছেন মহারাজা? এই কথাই আমরা বরাবর ব'লে আসছি। আরিস্টোক্রাসি না হ'লে সমাজ টিকবে কিসে? লোকে আবার আমাদের বলে মূর্খ—অযোগ্য। হুঁঃ!

জগদ্‌গুরু। ভুল বুঝলে বৎস। তোমার পূর্বপুরুষরাই মহাবিদ্বান্ ছিলেন, তুমি নও। তুমি কেবল অতীতের অর্জিত বিদ্যার রোমন্থন করছ। তোমার আশে-পাশে মহাবিদ্যান্‌রা ওত পেতে বসে আছেন। যদি তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না শেখ তবে শীঘ্রই গাদায় গিয়ে পড়বে।

প্রফেসর গুঁই। পরিষ্কার করেই বলুন না মহাবিদ্যাটা কি।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে। ব'লে ফেলুন সার, ব'লে ফেলুন। ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরী নেই।

জগদ্‌গুরু। তবে বলছি শোন। মহাবিদ্যায় মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু একে ঘ'ষে মেজে পালিশ ক'রে সভ্যসমাজের

উপযুক্ত ক'রে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মে মহাবিদ্যা এক স্তর হ'তে উচ্চতর স্তরে পোঁছেছে। জানিয়ে শুনিয়ে সোজাসুজি কেড়ে নেওয়ার নাম ডাকাতি—

ছাত্রগণ। সেটা মহাপাপ—চাই না, চাই না।

জগদ্‌গুরু। দেশের জন্য যে ডাকাতি, তার নাম বীরত্ব—

ছাত্রগণ। তা আমাদের দিয়ে হবে না, হবে না।

হাউলার। Bally rot।

জগদ্‌গুরু। নিজে লুকিয়ে থেকে কেড়ে নেওয়ার নাম চুরি—

ছাত্রগণ। ছ্যা—ছ্যা, আমরা তাতে নেই, তাতে নেই।

লুটবেহারী। কিহে গাঁট্টালাল, চুপ ক'রে কেন? সায় দাও না।

জগদ্‌গুরু। ভালমানুষ সেজে কেড়ে নিয়ে শেষে ধরা পড়ার নাম জুয়াচুরি—

ছাত্রগণ। রাম কহ, তোবা, থুঃ।

গুহা। কি লুটবেহারী, চোখ বুঁজে কেন?

জগদ্‌গুরু। আর যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, লোকে জয়-জয়কার করে—সেটা মহাবিদ্যা।

ছাত্রগণ। জগদ্‌গুরু কি জয়! আমরা তাই চাই, তাই চাই।

গুঁই। কিন্তু ঐ কেড়ে নেওয়া কথাটা একটু আপত্তিজনক।

লুটবেহারী। আপনার মনে পাপ আছে, তাই খটকা বাধছে। কেড়ে নেওয়া পছন্দ না হয়, বলুন ভোগা দেওয়া।

গুঁই। কে হে বেহায়া তুমি? তোমার কনশেন্স নেই?

জগদ্‌গুরু। বৎস, কেড়ে নেওয়াটা রূপক মাত্র। সাদা কথায় এর মানে হচ্ছে—সংসারের মঙ্গলের জন্য লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু আদায় করা।

লুটবেহারী। আমার তো সবে একটি সংসার। কিছু আদায় করতে পারলেই ছহল-বহল। নবাবসাহেবের বরঞ্চ—

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুঁই। দেখুন জগদ্‌গুরু, আমার দ্বারা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না। কিন্তু ঐ যে আপনি বললেন—সংসারের মঙ্গলের জন্য, সেটা খুব মনে লেগেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

লুটবেহারী। মশায়, ভগবান বেচারাকে নিয়ে যখন-তখন টানাটানি করবেন না, চটে উঠবেন।

নিতাই। আচ্ছা, সকলেই যদি মহাবিদ্যা শিখে ফেলে তা হলে কি হবে ?

জগদ্‌গুরু। সে ভয় নেই। তোমরা প্রত্যেকে যদি প্রাণপণে চেষ্টা কর, তা হলেও কেবল দু-চারজন ওতরাতে পার।

সরেশ। সার, একবার টেস্ট ক'রে নিন না।

জগদ্‌গুরু। এখন পরীক্ষা করলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অনেক সাধনা দরকার।

নিরেশ। কিছু মার্কও কি পাব না ?

জগদ্‌গুরু। কিছু-কিছু পাবে বই কি। কিন্তু তাতে এখন ক'রে-খেতে পারবে না।

নিরেশ। তবে না হয় আমাদের কিছু হোম-এক্‌সারসাইজ দিন।

জগদ্‌গুরু। বাড়িতে তো সুবিধা হবে না বাছা। এখন তোমরা নিতান্ত অপোগণ্ড। দিনকতক দল বেঁধে মহাবিদ্যার চর্চা কর।

খুদীন্দ্র। ঠিক বলেছেন। আসুন মহারাজ, আপনি আমি আর নবাব সাহেব মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করা যাক।

প্রফেসর গুঁই। আমাকেও নেবেন, আমি স্পীচ লিখে দেব।

মিস্টার গুহ। নিতাইবাবু, আমি ভাই তোমার সঙ্গে আছি।

লুটবেহারী। আমি একাই এক-শ। তবে রূপচাঁদবাবু যদি দয়া ক'রে সঙ্গে নেন।

রূপচাঁদ। খবরদার, তুমি তফাত থাক।

লুটবেহারী। বটে? তোমার মত ঢের-ঢের বড়লোক দেখেছি

গাঁট্টালাল। আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না—কি বল তেওয়ারীজী?

মিস্টার গুপ্টা। ভাবনা কি সরেশবাবু, নিরেশবাবু। আমি টেকনিক্যাল ক্লাস খুলছি, ভর্তি হ'ন। তরল আলতা, গোলাবী বিড়ি, ঘড়ি-মেরামত, ঘুড়ি-মেরামত, দাঁত বাঁধানো, ধামা-বাঁধানো সব শিখিয়ে দেব।

দীনেশ। গুরুদেব, চুপি-চুপি একটা নিবেদন করতে পারি কি?

জগদ্‌গুরু। বল বৎস।

দীনেশ। দেখুন, আমি নিতান্তই মুরুব্বীহীন। মহাবিদ্যার একটা সোজা তুকতাক—বেশী নয়, যাতে লাখ-খানেক টাকা আসে—যদি দয়া ক'রে গরিবকে শিখিয়ে দেন।

জগদ্‌গুরু। বাপু, তোমার গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। মহাবিদ্বান্‌ অপরকেই তুকতাক শেখায়—নিজে ও সবে বিশ্বাস করে না।

দীনেশ। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট। তার চেয়ে ডার্বির টিকিট কিনলে বরং কিছুদিন আশায় আশায় কাটাতে পারতুম।

গবেশ্বর। আমার কি হবে প্রভু? কেউ যে দলে নিচ্ছে না।

জগদ্‌গুরু। তুমি ছেলে তৈরি কর। তাদেরও শেখাও—মহাবিদ্যা শেখে যে, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে।

পাঁচুমিয়া। আমার কি করলেন ধর্মাবতার?

জগদ্‌গুরু। তুমি এখানে এসে ভাল করনি বাপু। তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধ'রে থাক।

গুহা। দশহাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে এখনি তোদের মজুরি পাঁচগুণ হয়ে যাবে।

মিস্টার গ্র্যাব। সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এস না।

গুহা। (চুপি চুপি) তবে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করব কি?

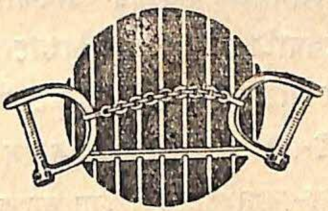
কাঙালীচরণ। দেবতা, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

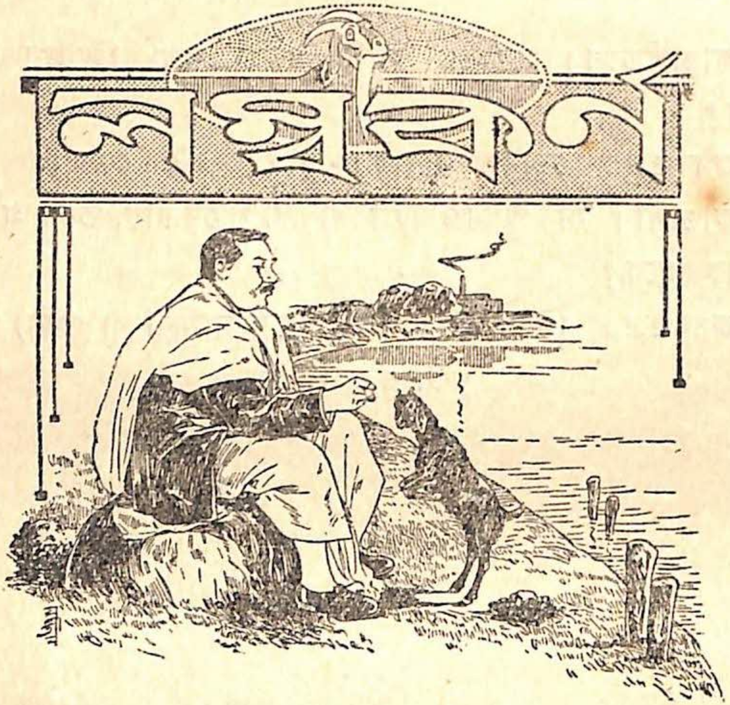
জগদ্‌গুরু। তোমার আবার কি চাই? ব'লে ফেল।

কাঙালী। যদি কখনও মহাবিদ্যা ধরা প'ড়ে যায়, তখন অবস্থাটা কি রকম হবে?

জগদ্‌গুরু। (ঈষৎ হাসিয়া বেদী হইতে নামিয়া পড়িলেন)।

ঘণ্টা ও কোলাহল





রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাতুর জমিন্দার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা-বেঞ্চ প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন ; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া তু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটা টিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন —সাড়ে-ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনও দিন হঠাৎ ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের

বর্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ !' ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—'আরে এটা কোথা থেকে এল ? কার পাঁঠা ? কাকেও তো দেখছি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁষিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—'যাঃ পালা, ভাগো হিঁয়াসে।' ছাগল পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—'অর্-র্-র্', অর্থাৎ আর আছে ?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটিমাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'অর্-র্-র্ ?' বংশলোচন বলিলেন—'আর নেই ! তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাশ করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার কেস কাড়িয়া লইয়া চর্বণ আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'শ্‌শালা।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরী করা উচিত নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগটাও নাছোড়বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তার পর দিন কতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি-স্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে

পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT। তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনিই গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁ-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্মশাড়ি এবং মাথায় কাল সুতার আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের

দুরন্ত মেম-মেম-ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চীনেমাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারিটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রানীর ছবি, রায়বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট বড় সাহেবের ফোটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যানক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ যথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাশের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ-সুদ্ধ হ'তে পারে না। তা হ'লে মেয়ে-ছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউএর বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?'

নগেন বলিল—'দেখ্ উদো, তোর বউএর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল্।'

চাটুজ্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?'

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—'বেওয়ারিস মাল, বেশী দিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক'রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।'

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—'উঁহুঁ হাঁড়িকাবাব। একটু বেশী ক'রে আদা-বাটা আর প্যাঁজ।'

উদয় বলিল—'ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে!'

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'উঁদো, আবার?'



'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব!'

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠার ম-ম-ম—'

বংশলোচন বলিলেন—'যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই-খাই শিখছেন।'

ঘেণ্টু হাত-পা ছুড়িয়া বলিল—'হ্যাঁ আমি ম ম-ম-মেটুলি খাব।'

টেঁপী বলিল—'বাবা, আমি পাঁঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাওয়া-দাওয়া করুক, তার পর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন—'নামের ভাবনা কি। ভাস্বরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'লম্বকর্ণ ই ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টেঁপু, তোর মা এখন কি করছে রে?'

টেঁপী। এক্ষুণি তো কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হ'লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ্, ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভেজানো-ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ্, বাড়ির ভেতর নিয়ে যাস নি যেন।

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল—'ও মা, শীগ্‌গির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।'

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'আ মর, ওটাকে কে আনলে? দূর দূর—ও ঝি, ও বাতাসী, শীগ্‌গির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।'

টেঁপী বলিল—'বা রে, ওকে বাবা এনেছে, আমি পুষব।'

ঘেণ্টু বলিল—'ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।'

মানিনী বলিলেন—'খেলা বার ক'রে দিচ্ছি। ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোযে! বেরো, বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—'

'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকালো গোঁপ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো তাঁর নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন।



হজৌর

গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দরোয়ানকে বলিলেন—'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করেগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্‌টা হুকুম দিলেন—'দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি কয়েকটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে, বৈঠকখানা-ঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ্, ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।'

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁহারা এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্র-লোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন

এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন—ইস, ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর স্যুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা-ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এক কোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুকাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ

অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—'কখন এলে?' উত্তর পাইলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।'

হুলস্থূল কাণ্ড। চোর—চোর—বাঘ হ্যায়—এই চুকন্দর সিং—জল্‌দি আও—নগেন—উদো—শীগ্‌গির আয়—মেরে ফেললে—

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনও ভালা আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল্‌ফলম্বিত পাতলা পঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী

গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন—'আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

লাটুবাবু বলিলেন—'আমরা বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যাণ্ড। ব্যাণ্ড-মাস্টার লটবর লন্দী—অধীন। লোকে লাটুবাবু ব'লে ডাকে। শুনলুম আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেছি।'

বিনোদ বলিলেন—'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?'

লাটু। কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসার্ট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট—এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তা ছাড়া কর্লেট, পিকলু, হারমোর্নিয়া, ঢোল, কত্তাল সব লিয়ে উলিশজন আছি। বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট-সাহেবের সেদিন বে হ'ল, ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যাণ্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাটু। আমরা হলুম উলিশটি প্রালী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পাবেন না, মারতে পারবেন না।

লাটু। এ যে আপনি লতুন কথা বলছেন মশায়। ভদ্দর নোকে কখনও ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠী লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাটুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন—'লিয়ে লাও হে লাটুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর নোক বলছেন অত ক'রে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাটু। সে আপনি ভাববেন না। লাটু লন্দীর কথার লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কেরাসিন ব্যাণ্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!' বিনোদ আশ্বাস দিয়ে বলিলেন—'ভেবো না হে, তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন—'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া—উঁহু।'

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন—নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজো নিত্যঃ—অজো

কিনা—ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধি-স্থাপনা হইলেও হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—'হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।'

উদয় বলিল—'আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—'

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্ধি।



'ভুটে বললে—হালুম'

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ তো সেইখানেই বড় হয়। তাই তো রং অত—

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুয্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ'ল ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম—দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বচ্ছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খ'সে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল—ভুটে ভুটে! ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—'কি ব্যাণ্ড-মাষ্টার, আবার কি মনে করে?'

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উশ্‌ক খুশ্‌ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজলনয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন—'সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন—'আঃ কি কর লাটুবাবু, একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই।'

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—'কি হয়েছে—ব্যাপার কি?'

লাটু। মশায়, ওঁই পাঁঠাটা—

চাটুজ্যে বলিলেন—'হুঁ, বলেছিলুম কি না?'

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে,

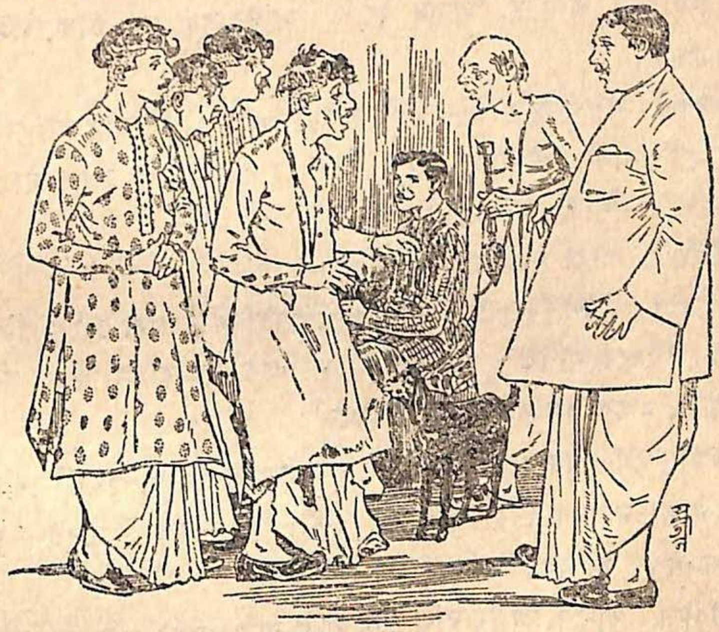
হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর—আর—আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে নব্বই টাকার নোট—ও হো হো!

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজর, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'



'মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে। লোট তো লোট—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইষ্টিলের কত্তাল।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন—'যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক ক'রে দাও! বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জুলুমও হয় না। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।'

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন, —'ও টেঁপুরানী, শীগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, পোলাও, মাংস—'

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঁঠায় পৌঁছেছে না কি? আচ্ছা তুমি না খাও আমরা আছি। যাও তো টেঁপু, মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।'

টেঁপী। বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টেঁপী, পাখাটা মেরামত করতে হবে—টেঁপী, এ-মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় ক'রে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ক'রো না।

বংশলোচন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।'

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলিপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কোটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তার পর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুলগাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাঁহার মুক্তি—আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। ওই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তাহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সত্যযুগ, যখন শিবি রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌-বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ক্রুম্‌ হুদ্দুড়্‌ হুড়্‌ দড়ড়ড় ড়! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পালাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব

হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ —কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জত কাপড় চোপড় সবই গিয়েছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

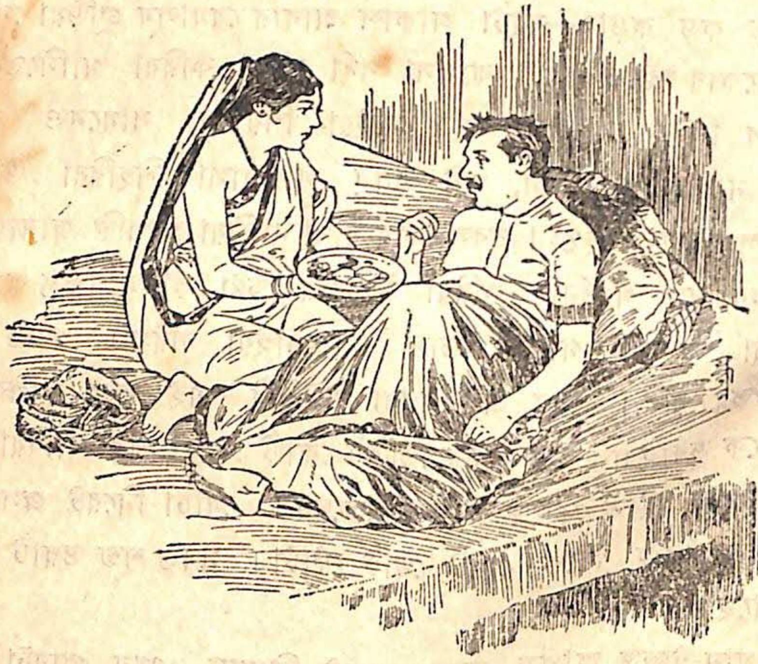
বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট্ ইলেক্ট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

... ...

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিটমিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নীচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দম-শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়বাহাদুর। কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনা-ব্যাং। তাঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা?



'লুচি ক'খানি খেতেই হবে'

মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? 'মামা—জামাইবাবু—বংশু আছ?—হুজৌর—'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাঁহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—'এই যে আমি এখানে আছি —ভয় নেই—'

....

মানিনী বলিলেন—'আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরেই বড় ক'রে বিছানা ক'রে দে তো। আর দেখ্, আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ, চাটুজ্যে মিনসে

নড়ে না। ও কি—সে হবে না—এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?'

'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'অ্যাঁ, ওটা আবার এসেছে? নিয়ে আয় তো লাঠিটা—'

মানিনী বলিলেন,—'আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন!'

... ...

লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড়-একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।



কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পাড় কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা

পাসে ওয়েটিং-রুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, হৃয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে. কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্য-ক্রমে ৺কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দু-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তার পর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে।



লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল

দূরে আকন্দঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদ্‌গদ স্বরে মাঝে-মাঝে

ক-অ-অ করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হাওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে



গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া যায়

হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটুলি-বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু

তোবড়াইয়াছে এবং সামনের ছুটো দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।



খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরী-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে।

শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনির রং যেন পানতুয়ার শাঁস।

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—'তালগাছে কে রে?

উত্তর আসিল—'কারিয়া পিরেত বা।'

শিবু। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।

মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'গোড় লাগি বরমদেওজী।'

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর্ না।

প্রেত ঊর্ধ্বে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটির বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ শুল্‌গাইয়া শিবুর হাতে দিল।

শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কল্কিা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—'তার পর, এলি কবে? তোর হাল চাল সব বল্।'

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—

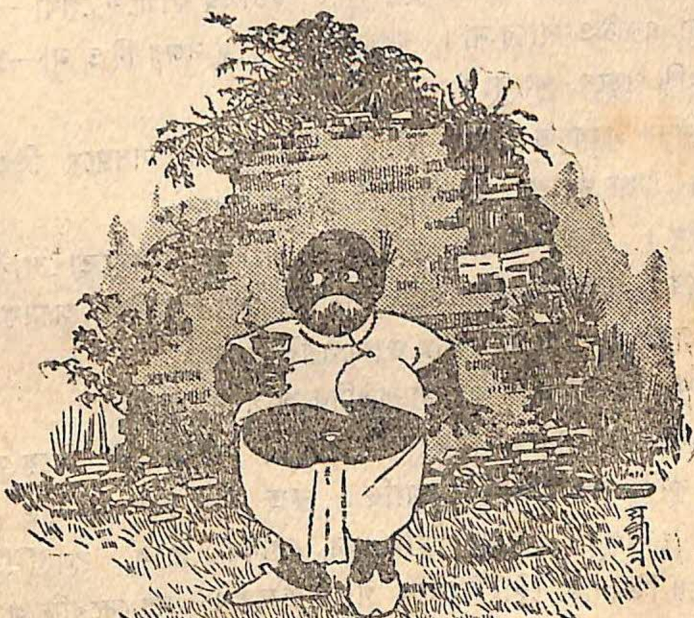
তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী,



সড়াক্ করিয়া নামিয়া আসিল

বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে।

সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তার পর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।



সব বন্ধকী তমসুক দাদা

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি ঝাড়িয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—'ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে না কি?'

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি। বেশী কিছু নয়—এই দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা—ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ!'

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল 'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি তা সেদিন এলে, কাটপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে দেখছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম, নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক

পেশা দারোগাগিরি ইলাকা রিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাহু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘর-সংসার সবই তো ছিল কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাহু মল্লিক—কোম্পানির ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসারধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব-বম্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।'

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর,

একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্টে পাল্টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—
'ধা'-এর উপর সোম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা।

এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।'

উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আটা দিয়া পইতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বঁইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তার পর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী-বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্‌যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—'এইবার ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে।'

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—'অ্যাঁ! তুমি নেত্য?'

নৃত্যকালী বলিল—'হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে ম'রে আমার কবল থেকে বাঁচবে! পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

শিবু। এলে কি ক'রে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হ'ক। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্‌কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন)।

পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নী। আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী। আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নী। দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী। দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাকচুন্নী। মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিনসেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেত্নী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর ঘাড় মটকাব তার পর ডাইনী বেটীকে খাব।'

কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,
ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁকশেয়ালী, দিও না কুলে কালি
রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাচার ডাক শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—'ভায়া এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?'

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—'এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।' শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙ্গিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

মারে জ্‌ জুয়ান—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
পর্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট—হেঁইয়া
খবরদার—হা-ফিজ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি, গিন্নী। এখানে? বেম্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?' ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুংরী, তোহর শরম নহি বা?'

... ...

তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর

তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্প্ক, পিক্সি, নোম, গব্লিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ্ প্রভৃতি লম্বা-দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এ-সব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।



ধুন্ধুরী মায়া

ইত্যাদি গল্প

ধুস্তুরী মায়া

(দুই বুড়োর রূপকথা)

উদ্ধব পাল আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জগবন্ধু গাঙ্গুলীর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। উদ্ধব বেঁটে মোটা শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, কাঁচাপাকা ছাঁটা গোঁফ। উডমণ্ট স্ট্রীটে এঁর একটি ইমারতী রঙের বড় দোকান আছে, এখন দুই ছেলে সেটি চালায়। জগবন্ধু লম্বা রোগা ফরসা, গোঁফ দাড়ি নেই। ইনি জামরুলতলা হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। দুই বন্ধু দক্ষিণ কলকাতায় আবুহোসেন রোডে কাছাকাছি বাস করেন। ছেলেরা রোজগার করছে, মেয়েরা সুপাত্রে পড়েছে, সেজন্য সংসারের ভাবনা থেকে এঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল, শখও নানারকম আছে, সুতরাং বুড়ো বয়সে এঁদের বেশ আনন্দেই থাকবার কথা।

রোজ বিকাল বেলা এঁরা ঢাকুরের লেকে হেঁটে যান এবং জলের ধারে একটি বড় শিমুল গাছের তলায় বসে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত গল্প করেন, তার পর বাড়ি ফেরেন। দুজনেই সেকেলে লোক, সিগারেট চুরুট পাইপ পছন্দ করেন না। প্রত্যেকে একটা ঝুলিতে হুঁকো আর তামাক-টিকে-সাজানো দুটি কলকে নিয়ে যান এবং গল্প করতে করতে মুহুর্মুহু ধূমপান করেন।

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা সাতটাতেও একটু আলো আছে। জগবন্ধু নিজের হুঁকো থেকে কলকেটি তুলে উদ্ধবের হাতে দিয়ে বললেন, আজ তোমার দাঁতের খবর কি?

উদ্ধব উত্তর দিলেন, তোমার সেই মাজনে কোনও উপকার হল না, পড়ে না গেলে কনকনানি যাবে না। তুমি খাসা আছ, দুপাটি

বাঁধিয়ে মুড়ি কড়াইভাজা নারকেল গলদা চিংড়ি সবই চিবিয়ে খাচ্ছ। আমার তো পান সুদ্ধু ছাড়তে হয়েছে।

—ছেঁচে খাও না কেন?

—আরে ছ্যা, তাতে সবাই ভাববে একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে গেছি। তার চাইতে না খাওয়া ভাল। বুড়ো হওয়ার অশেষ দোষ।

—শুধু দোষ দেখছ কেন, ভালর দিকটাও দেখ। খাটতে হচ্ছে না, ছেলেরা সব করে দিচ্ছে। সবাই খাতির করে, কোথাও গেলে সব চাইতে আরামের চেয়ারটিতে বসতে দেয়, পাড়ায় সভা হলে তোমাকেই সভাপতি করে। গুরুজন নেই, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয় না, অন্য লোকেই প্রণাম করে।

—থামলে কেন, বলে যাও না। মেয়েরা সব দাদু জেঠা মেসো বলে, বুড়োদের দিকে আড় চোখে তাকায় না, আমরা যেন ইট পাথর গরু ছাগল।

—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

—ক্ষতি নয়? আমাদের পুরুষ মানুষ বলেই গণ্য করে না। দেখ জগু, জীবনটা বৃথাই কাটল।

—বৃথা কেন, তোমার কিসের অভাব? উপযুক্ত দুই ছেলে রয়েছে, গিন্নী রয়েছেন, ব্যবসায় দেদার টাকা আসছে, শরীর ভালই আছে। তোমার ও দাঁত নড়া ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বাত ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার কিছুই নেই, এই বয়সেও নিমন্ত্রণে গিয়ে দু দিস্তে লুচি আর দেদার মাছ মাংস দই মিষ্টান্ন খেতে পার। আমি অবশ্য তোমার মতন মজবুত নই, বড়লোকও নই, কিন্তু দুঃখ করবারও কিছু নেই। কজন বুড়ো আমাদের মতন ভাগ্যবান?

উদ্ধব পাল হুঁকোয় একটি দীর্ঘ টান দিয়ে কলকেটি বন্ধুর হাতে দিলেন। তার পর বললেন, দেখ জগু, যখন বয়স ছিল তখন কোন ফুর্তিই করতে পাই নি। কর্তার হুকুমে ইস্কুলের পড়া শেষ না করেই

দোকানে ঢুকেছি, ব্যাবসা আর রোজগার ছাড়া আর কিছুতে মন দেবার অবকাশ ছিল না।

জগবন্ধু গাঙ্গুলী বললেন, এখন তো দেদার অবকাশ, যত খুশি আনন্দ কর না।

—চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই বয়সে তা হবার নয়। ছোঁড়াদের দেখে বাইসিকেল চড়ে সনসনিয়ে ছুটতে আর মোটর চালাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শক্তি নেই। আজকাল অ্যাং ব্যাং চ্যাং সবাই বিলেত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে। আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইংরিজী বলতে পারি না, হ্যাট-কোট পায়জামা-আচকান পরতে পারি না, কাঁটা-চামচ দিয়ে খেলে পেট ভরে না, কাজেই যাবার জো নেই। আবার সেকেলে ফুর্তিও সয় না। বছর চারেক আগে কাশীতে এক সাধুবাবার প্রসাদী বড়-তামাকের ছিলিমে একটি টান মেরেছিলুম, তার পর ঘণ্টা দুই ত্রিভুবন অন্ধকার। সেদিন আমার বেয়াই জগন্নাথ দত্তর বাগানে গিয়ে উপরোধে পড়ে চার গেলাস খেয়েছিলুম—রম-পঞ্চ না কি বললে। খেয়ে যাই আর কি, কেবল হেঁচকি আর হেঁচকি, তার পর বমি।

—ফুর্তিরও সাধনা দরকার, জোয়ান বয়স থেকে অভ্যাস করতে হয়। এখন আর ওসব করতে যেয়ো না।

—তার পর এই সেদিন তোমার সঙ্গে স্বপনপুরী সিনেমার 'লুটে নিল মন' দেখেছিলুম। দেখা ইস্তক মনটা খিঁচড়ে আছে। জীবনের যা সব চাইতে বড় সুখ—প্রেম, তাই আমার ভোগ হল না।

—অবাক করলে তুমি। বাড়ীতে সতীলক্ষ্মী গৃহিণী আছেন তবু বলছ প্রেম হয় নি? শাস্ত্রে বলে—জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্। অর্থাৎ ভাত হজম হলে আর স্ত্রী বৃদ্ধা হলেই লোকে প্রশংসা করে। এখন না হয় দুজনে বুড়ো হয়েছ, কিন্তু প্রথম বয়সে প্রেম হয় নি এ কি রকম কথা?

—আমার বয়স যখন বারো তখনই বাবা সাত বছরের পুত্রবধূ ঘরে আনলেন। খিদে না হতেই যদি খাবার জোটে তবে ভোজনের

সুখ হবে কেমন করে? তা ছাড়া গিন্নীর মেজাজটি চিরকালই রুক্ষ, প্রেম করবার মানুষ তিনি নন। আর চেহারাটি তো তোমার দেখাই আছে। তবে হক কথা বলব, মাগী রাঁধে যেন অমৃত।

—কি রকম হলে তুমি খুশী হতে বল তো?

—যা হবার নয় তা বলে আর লাভ কি। তবু মনের কথা বলছি শোন। হুইল দেওয়া ছিপে যেমন করে রুই কাতলা ধরা হয় সেই রকম আর কি। ফাতনা নড়ে উঠল, টোপ গিলেই চোঁ করে সরে গেল, তার পর টান মেরে কাছে আনলুম, আবার সুতো ছাড়লুম, এই রকম খেলিয়ে খেলিয়ে বউ ঘরে তুলতে পারলেই জীবনটা সার্থক হত।

—ও, তুমি নটবর নাগর হয়ে প্রেমের মৃগয়া করতে চাও! এ বয়সে ওসব চিন্তা ভাল নয় ভাই। পত্নী যে ভাবেই ঘরে আসুন—কচি বেলায় বা ধেড়ে বয়সে, প্রেমের আগে বা পরে—তিনি চিরকালই মার্গিতব্যা, অর্থাৎ খোঁজবার আর চাইবার জিনিস।

—কি বললে, মার্গিতব্যা? তা থেকেই বুঝি মাগী হয়েছে?

—তা জানি না, সুনীতি চাটুজ্যে মশাই বলতে পারেন।

উদ্ধব পাল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভড়াক ভড়াক করে তামাক টানতে লাগলেন।

যে শিমুল গাছের তলায় এঁরা বসেছিলেন তার উপরে একটা পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল—ওঠ ওঠ ওঠ ওঠ। আর একটা পাখি সাড়া দিলে—উঠি উঠি উঠি উঠি।

উদ্ধব বললেন, কি পাখি হে? বেশ মজার ডাক তো।

প্রথম পাখিটা মোটা সুরে আবার ডাকল—ব্যাং ব্যাং গমী গমী গমী। অন্য পাখিটা মিহি সুরে উত্তর দিলে—ব্যাং ব্যাং গমা গমা গমা।

জগবন্ধু রোমাঞ্চিত হয়ে চুপি চুপি বললেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার!

উদ্ধব বললেন, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী নয় তো ?

—চুপ চুপ। শুনে যাও কি বলছে।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর আলাপ শুরু হল। কলকাতার টেলিফোনের মতন অস্পষ্ট আওয়াজ, কিন্তু বোঝা যায়।

—নীচে কারা রয়েছে রে ব্যাঙ্গমী ?

—দুটো বুড়ো।

—কি করছে ওরা ?

—তামাক খাচ্ছে আর বক বক করছে।

—ও, তাই নাকে দুর্গন্ধ লাগছে আর কাশি আসছে। কি বলছে ওরা ?

একটা বুড়ো বলছে তার জীবনই বৃথা, প্রেম করবার সুবিধে পায় নি। আর একটা বুড়ো তাকে বোঝাচ্ছে।

—বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙ্গমা তার সায়ংকালীন কোষ্ঠশুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধু রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একটু সরে বসলেন।

ব্যাঙ্গমী বললে, তোমার তো নানারকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও না। আহা, বুড়ো বেচারার মনে বড় দুঃখু, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর।

ব্যাঙ্গমা বললে, জোয়ান হবার শখ থাকে তো তার প্রক্রিয়া বাতলাতে পারি, কিন্তু ওদের সাহস হবে কি ? বোধ হয় পেরে উঠবে না।

—পারুক না পারুক তুমি বল না।

উদ্ধব ফিস ফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন।

ব্যাঙ্গমা বললে, ধুস্তুরী ছোলা। এক-একটি ছোলা খেলে দশ-দশ বছর বয়স কমে যায়।

—সে আবার কি জিনিস ? কোথায় পাওয়া যায় ?

—তৈরী করতে হয়। ওই বেড়ার দক্ষিণ দিকে নীল ধুতরোর ঝোপ আছে, তাতে বড় বড় ফল ধরেছে। কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ধুতরো ফল চিরে তার ভেতরে ছোলা গুঁজে দিতে হবে, একটি ফলে একটি ছোলা। একাদশীর মধ্যে সেই ছোলা রস টেনে নিয়ে ফুলে উঠবে, তখন বার করে নেবে। তার পর অমাবস্যা সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ছোলা চিবিয়ে খেয়ে সংকল্প করবে। মনে থাকে যেন, একটি ছোলায় দশ বছর বয়স কমবে, পাঁচটিতে পঞ্চাশ বছর।

—যদি দশ-বিশটা খায়?

—তবে পূর্বজন্মে ফিরে যাবে। তার পর শোন। সংকল্পের পর এই মন্ত্রটি বলে গঙ্গায় একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী,
দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

ডুব দেবা মাত্র বয়স কমে যাবে।

—আচ্ছা, যদি ফের আগের বয়সে ফিরে আসতে চায়?

—খুব সোজা। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বেলপাতা চিবিয়ে খাবে, যটা ছোলা খেয়েছিল তটা বেলপাতা। তার পর এই মন্ত্রটি বলে একটি ডুব দেবে—

বম মহাদেব, সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী নীরব হল। আরও কিছু শোনবার আশায় খানিকক্ষণ সবুর করে উদ্ধব বললেন, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যা শোনা গেল তাই যথেষ্ট। প্রক্রিয়াটি যা বললে তা মালবীয়জীর কায়কল্পের চাইতে ঢের সোজা, বিপদের ভয়ও দেখছি না।

জগবন্ধু বললেন, ধুতরোর রস হচ্ছে বিষ তা জান?

—আরে ছোলার মধ্যে কতই আর রস ঢুকবে। ব্যাঙ্গমার কথা যদি মিথ্যেই হয় তবে বড় জোর একটু নেশা হবে। আমরা তো আর মুটো খানিক ছোলা খাব না।

—তবে চল, দেখা যাক বেড়ার দক্ষিণে নীল ধুতরোর গাছ আছে কি না।

দুজনে গিয়ে দেখলেন, ধুতরো গাছের জঙ্গল, বড় বড় ফল ধরেছে। জগবন্ধু বললেন, বোধ হয় পরশু কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, বাড়ি গিয়ে পাঁজি দেখতে হবে। সেদিন ছোলা আর একটা ছুরি নিয়ে আসা যাবে।

পঞ্চমীর দিন উদ্ধব আর জগবন্ধু ধুতরোর বনে এসে দশ-বারোটা ফল চিরে তার মধ্যে ছোলা পুরে দিলেন। তার পরের কদিন তাঁরা নানারকম ভাবনায় আর উত্তেজনায় কাটালেন। জগবন্ধু অনেক বার বললেন, কাজটা ভাল হবে না। উদ্ধব বললেন, অত ভয় কিসের, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে! আমাদের বরাত খুব ভাল তাই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথা নিজের কানে শুনেছি। আমার মনে হয় হরপার্বতী দয়া করে পাখির রূপ ধরে আমাদের হদিস বাতলে দিয়েছেন। এই বলে উদ্ধব হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাতে লাগলেন।

জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা, জোয়ান না হয় হওয়া গেল, কিন্তু বাড়ির লোককে কি বলবে?

—বাড়িতে যাব কেন। খোঁজ না পেলে সবাই মনে করবে যে মরে গেছি। আমরা অন্য নাম নিয়ে অন্য জায়গায় থাকব। তুমি জগবন্ধুর বদলে জলধর হবে, আমি উদ্ধবের বদলে উমেশ হব। কেউ চিনতে পারবে না, নিশ্চিন্ত হয়ে ফুর্তি করা যাবে।

একাদশীর দিন তাঁরা ধুতরো ফল পেড়ে ভিতর থেকে ছোলা বার করে নিলেন। ছোলা ফুলে কুল আঁঠির মতন বড় হয়েছে। তার পর কদিন তাঁরা গোপনে নানা রকম ব্যবস্থা করে ফেললেন, যাতে

ভবিষ্যতে নিজেদের আর পরিবারবর্গের কোনও অভাব না হয়। উদ্ধব উমেশের নামে ব্যাঙ্কে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছিলেন। জগবন্ধু বললেন, যদি পরে ফিরে আসতে হয় তবে টাকাটা বার করতে পারবে না ; উদ্ধব আর উমেশ পালের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কর। উদ্ধব তাই করলেন।

চতুর্দশীর দিন জগবন্ধু বললেন, দেখ, বয়স কমাতে হয় তুমি কমাও। আমার কোনও দরকার নেই।

উদ্ধব বললেন, তা কি হয়, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারব না।

—বেশ, আমি কিন্তু দিন কতক পরেই ফিরে আসব।

—ফিরবে কেন, তোমারই তো সুবিধে বেশী। পরিবার বহুদিন গত হয়েছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে আর একটি ঘরে আনবে।

—কটা ছোলা খেতে চাও হে ?

—আমি বেশ করে ভেবে দেখলুম চারটে খাওয়াই ভাল। এখন আমাদের দুজনেরই বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। চল্লিশ বাদ গিয়ে হবে পঁচিশ, একেবারে তাজা তরুণ।

—কিন্তু বুদ্ধিও তো খাজা তরুণের মতন হবে। এতদিন ব্যাবসা করে যে বুদ্ধিটি পাকিয়েছ তা একটা খেয়ালের বশে কাঁচিয়ে দিতে চাও ? আমি বলি কি, দুটো ছোলা খাও, তাতে বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হবে। প্রায় জোয়ানেরই মতন, অথচ বুদ্ধি বেশী কেঁচে যাবে না।

উদ্ধব নাক সিটকে বললেন, রাম বল। পঁয়তাল্লিশে কারবার ফলাও করা যেতে পারে, দেদার খদ্দেরও যোগাড় করা যেতে পারে, কিন্তু মনের মানুষ—ওই যাকে বলেছ মার্গিতব্যা—পাকড়াও করা যাবে না। আধবুড়োর কাছে কোনও মেয়ে ঘেঁষবে না। আচ্ছা, মাঝামাঝি করা যাক, তিনটে করে ছোলা খাওয়া যাবে, পঁয়ত্রিশ

বছর বয়স হলে মন্দ হবে না। আজকাল তো ধেড়ে আইবুড়ো মেয়ের অভাব নেই।

একটু ভেবে জগবন্ধু বললেন, আচ্ছা উদ্ধব, তুমি তো নব-কলেবর ধারণ করে উধাও হবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ। তোমার তিরোধান হলে পরিবারের কি দশা হবে ভেবে দেখেছ? তোমার দুঃখ হবে না?

—নাঃ। সম্পত্তি যখন রেখে যাচ্ছি তখন দুঃখ কিসের। তবে দিন কতক কান্নাকাটি করবে, তা না হলে যে ভাল দেখাবে না। গহনা খুলতে হবে, মাছ পেঁয়াজ পুঁই শাগ মসুর ডাল ছাড়তে হবে, তার জন্যও কিছু দিন একটু কষ্ট হবে। তারপর তোফা আলোচালের ভাত ঘি মটর ডাল পটোল ভাজা ঘন দুধ আম কলা সন্দেশ খেয়ে খেয়ে ইয়া লাশ হবে আর হরদম পান দোক্তা চিবুবে। ঝাঁটা গোঁফের খোঁচা আর তামাকের গন্ধ সইতে হবে না, বেআক্কেলে মিনসের তোয়াক্কা রাখতে হবে না, মনের সুখে বউদের ওপর তম্বি করবে আর গুরু-মহারাজের সঙ্গে কাশী হরিদ্বার হিল্লি দিল্লি মক্কা ঘুরে বেড়াবে। ছেলে দুটো তো লাট হয়ে যাবে। বাপ পিতামহর বসত বাড়ি বেচে ফেলে ফরক হবে, মেট্রো প্যাটানের ইমারত তুলবে, দামী দামী মোটর কিনবে। কারবারটা মাটি না করে এই যা চিন্তা। মরুক গে, আমি আর ওসব ভাবব না। আর তোমার তো কোনও ভাবনাই নেই। ছেলেটি অতি ভাল, তুমি সরে গেলে নিশ্চয় ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে।

—আমি কিন্তু তোমার একটা হিল্লে লেগে গেলেই ফিরে আসব। অবশ্য তোমার সঙ্গে রোজই দেখা করব।

—আগে কাঁচা বয়সের সোয়াদটা চেখে দেখ, তার পর যা ভাল বোধ হয় ক'রো।

উনিশে বৈশাখ বুধবার অমাবস্যা। সন্ধ্যার সময় তুই বন্ধু দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত হলেন। তুজনেই একটি করে ক্যাম্বিসের হালকা ব্যাগ নিয়েছেন, তাতে কিছু জামা কাপড় এবং অন্যান্য নিতান্ত দরকারী জিনিস আছে, আর যা দরকার পরে কিনে নেবেন। জগবন্ধু বললেন, উদ্ধব ভাই, আমার কথা শোন, আলেয়ার পিছনে ছুটো না, ঘরে ফিরে চল। বেশ আছ, সুখে থাকতে কেন ভূতের কিল খাবে।

উদ্ধব বললেন, সাহস না করলে কোনও কাজেই সিদ্ধি হয় না, ব্যাবসায় নয়, তুমি যাকে প্রেমের মৃগয়া বল তাতেও নয়। আর দেরি করবার দরকার কি, ঘাট থেকে লোকজন সব চলে গেছে, প্রক্রিয়াটি সেরে ফেলা যাক। বেশী রাত পর্যন্ত এখানে থাকলে মন্দিরের লোকে নানারকম প্রশ্ন করবে।

উদ্ধব একটি গামছা পরে ঘাটের চাতালে জামা কাপড় জুতো রাখলেন। জগবন্ধুও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জলে নামবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্ধুর মুখে আর নিজের মুখে তিনটি করে ছোলা পুরে দিয়ে উদ্ধব বললেন, নাও, বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল। এইবার মনে মনে সংকল্প কর।...হয়েছে তো?

তার পর জগবন্ধুর হাত ধরে জলে নেমে উদ্ধব বললেন, এস, তুজনে এক সঙ্গে মন্ত্রটি বলে ডুব দেওয়া যাক।—বম মহাদেব ধুস্তুরস্বামী, দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।

জল থেকে উঠে গা মুছতে মুছতে জগবন্ধু প্রশ্ন করলেন, কি রকম বোধ হচ্ছে? যে অন্ধকার, তোমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। একটা টর্চ আনলে হত।

উদ্ধব কাপড় পরতে পরতে বললেন, বম ভোলানাথ, কেয়া বাত কেয়া বাত! মাথায় আবার চুল গজিয়েছে হে। শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে, লাফাতে ইচ্ছে করছে। দাঁতের বেদনাও নেই। ধন্য ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী! যদি ধরা দিতে তবে সোনার খাঁচায় রেখে

বাদাম পেস্তা আঙুর বেদানা খাওয়াতুম। তোমার কি রকম হল হে?

—বাঁধানো দাঁত খসে গেছে, দুপাটি নতুন দাঁত বেরিয়েছে, গায়েও জোর পেয়েছি। আলো জ্বেলে আরশিতে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না।

—চল যাওয়া যাক, কলকাতার বাস এখনও পাওয়া যাবে। বউবাজারে তরুণধাম হোটেলে ঘর খালি আছে, আমি খবর নিয়েছি। এখন সেখানেই উঠব। তারপর সুবিধে মতন একটা বাড়ি নেওয়া যাবে।

হোটেলে এসে আরশিতে মুখ দেখে উদ্ধব বললেন, এঃ, বয়স কমেছে বটে কিন্তু চেহারাটা গুণ্ডা গুণ্ডা দেখাচ্ছে। তোমার তো দিব্বি রূপ হয়েছে জগু, একেবারে কার্তিক। দেখো ভাই, আমার শিকার তুমি যেন কেড়ে নিও না।

জগবন্ধু বললেন, আমি শিকার করতে চাই না।

—বেশ বেশ, তুমি শুকদেব গোঁসাই হয়ে তপস্যা ক'রো। এখন আমার মতলবটা শোন। প্রেমের মৃগয়া তো করবই, কিন্তু তাতে দিন কাটবে না। রসা রোডে একটা নতুন রঙের দোকান খুলব, পাল অ্যাণ্ড গাঙ্গুলী। তুমি বিনা মূলধনে অংশীদার হবে, লাভের বখরা পাবে। ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা নতুন অ্যাকাউণ্টে জমা আছে। দেখবে ছ মাসের মধ্যে নতুন কারবারটি ফাঁপিয়ে তুলব। মনে থাকে যেন—তুমি হচ্ছ জলধর গাঙ্গুলী, আমি উমেশ পাল। রাত অনেক হয়েছে, এখন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়া যাক।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে জগবন্ধু বললেন, এখন কি করতে চাও বল।

উদ্ধব বললেন, সমস্ত রাত ভেবেছি, ঘুমুতে পারি নি। শুনেছি বালিগঞ্জ আর নতুন দিল্লিই হচ্ছে প্রেমের জায়গা। দিল্লি তো বহু দূর, আমি বলি কি, বালিগঞ্জেই আস্তানা করা যাক।

—ওখানে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। তোমার বয়স কমেছে বটে, পুরো তরুণ না হলেও হাফ তরুণ হয়েছ, কিন্তু তোমার চাল-চলন সাবেক কালের, ফ্যাশন জান না, লেখাপড়াও তেমন শেখ নি। কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমার পালিশের অভাব আছে। ওদিককার মেয়েরা ইংরিজী ফ্রেঞ্চ বলে, বিলিতী কবিতা আওড়ায়। আবার শুনেছি পেন্টুলুন পরে, ভুরু কামায়, রং মাখে, বল নাচে, সিগারেট খায়, মোটর হাঁকায়। আই সি এস, আই এ এস, বিলাত-ফেরত ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকরে ছাড়া আর কারও দিকে ফিরেও তাকায় না।

—তাদের চাইতে আমার টাকা ঢের বেশী, রোজগারও বেশী করতে পারব। ভাল বাড়ি, আসবাব, মোটর, কিছুরই অভাব হবে না।

—তা মানলুম। কিন্তু তুমি টেবিলে বসে ছুরি-কাঁটা-চামচ চালাতে পারবে? হাপুস-হুপুস শব্দ না করে তো খেতেই পার না। শুনেছি কড়াইশুঁটির দানা আর বড়ি ভাজা ছুরি দিয়ে তুলে মুখে তোলাই আধুনিক দস্তুর। তা তুমি পারবে?

—চিমটে দিয়ে তুলে খেলে চলবে না?

—না। তা ছাড়া তুমি টেবিল ক্লথে ঝোল ফেলে নোংরা করবে, তা দেখলেই তোমার মার্গিতব্যা মারমুখো হবেন।

—বেশ, তুমিই বল কোথায় সুবিধে হবে।

—খবরের কাগজে গাদা গাদা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বার হয়। তা থেকেই বেছে নিতে হবে। এই তো আজকের কাগজ রয়েছে, পড় না।

উদ্ধব পড়তে লাগলেন। বুলবুলি, লক্ষ্মী বোন আমার, ফিরে এস, বাবা মা শোকে শয্যাশায়ী। খঞ্জনকুমারের নাচের পার্টিতেই

তুমি যোগ দিও। আরে গেল যা!......বাবা নেংটু, বাড়ি ফিরে এস, ম্যাট্রিক দিতে হবে না, সিনেমাতেই তোমাকে ভর্তি করা হবে। আরে খেলে যা!

জগবন্ধু বললেন, ওসব কি পড়ছ, পাত্র-পাত্রীর কলম পড়।

—এম এ পাশ, স্বাস্থ্যবতী বাইশ বৎসরের গুহ পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বরপণ যোগ্যতা অনুসারে।...সুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা বিশ বৎসরের আই এ, নৈকষ্য কুলীন মুখোপাধ্যায় পাত্রীর জন্য আই সি এস পাত্র চাই।...দেখ জগু, এসব চলবে না, সেই মামুলী বর-কনের সম্বন্ধ স্থির করে বিয়ে, শুধু বয়সটাই বেড়ে গেছে আর সঙ্গে নৃত্য-গীত, এম এ, বি এ যোগ হয়েছে। অন্য উপায় দেখ।

—আচ্ছা, এই রকম একটা বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপালে কেমন হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক উদারপ্রকৃতি সদ্‌বংশীয় বাঙালী বহু-লক্ষপতি ব্যবসায়ী। কোনও আত্মীয় নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ করিতে চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের মনের মিল হইলেই শীঘ্রই বিবাহ। বক্স নম্বর অমুক।

—খাসা হয়েছে, ছাপাবার জন্য আজই পাঠিয়ে দাও।

বিজ্ঞাপন বার হবার তিন-চার দিন পর থেকেই রাশি রাশি উত্তর আসতে লাগল। একটি চিঠি এই রকম।—৫নং ঘুঘুবাগান রোড, কলিকাতা। টেলিফোন নর্থ ২৩৪। মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানাইতেছি যে কাতলামারি এস্টেটের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানী আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। ইনি পরমাসুন্দরী এবং অশেষ গুণবতী। ইণ্টারভিউএর সময় সন্ধ্যা সাতটা হইতে আটটা। ইতি। শ্রীরামশশী সরকার, সদর নায়েব।

উদ্ধব বললেন, ভালই মনে হচ্ছে, তবে পাত্রীর নামটা বিদকুটে। আর এস্টেটটি নিশ্চয় ফোঁপরা তাই রাজকুমারী ধনী বর খুঁজছেন। তা হক। হোটেলে তো টেলিফোন আছে, এখনই জানিয়ে দেওয়া যাক আজ সন্ধ্যায় আমরা দেখা করতে যাব।

জগবন্ধু বললেন, তোমার দেখছি তর সয় না। একটা চিঠি লিখে দাও না যে পরশু যাবে। তাড়াতাড়ি করলে ভাববে তোমার গরজ খুব বেশী।

—তুমি বোঝ না, কোনও কাজে গড়িমসি ভাল নয়।

উদ্ধব টেলিফোন ধরে ডাকলেন, নর্থ টু থ্রি ফোর।...ইয়েস। একটু পরে মেয়েলী গলায় সাড়া এল, কাকে চান?

—শ্রীযুক্তশ্বরী আছেন কি? আমি হচ্ছি উমেশ পাল, আলাপের জন্য আমিই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম।

—ও, আপনি একজন ক্যাণ্ডিডেট?

উদ্ধব একটু গরম হয়ে বললেন, ক্যাণ্ডিডেট আপনাদের রাজকুমারী, তাঁর তরফ থেকেই তো বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত পেয়েছি।

—দরখাস্ত বলছেন কেন। আমিই রাজকুমারী, আপনি দেখা করতে চান তো সন্ধ্যায় আসতে পারেন।

উদ্ধব নীচু গলায় জগবন্ধুকে বললেন, জানিয়ে দিই যে আমরা দুজনে যাব, কি বল? জগবন্ধু বললেন, আরে না না, এসব ব্যাপারে সঙ্গী নেওয়া চলে না।

উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজকুমারী বললেন, হেলো।

উদ্ধব জবাব দিলেন, কিলো।

—ও আবার কি রকম! ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা কইতে জানেন না?

—খুব জানি। আলাপ তো হবেই, এখনই শুরু করলে দোষ কি। আজই সন্ধ্যায় আপনার কাছে যাব।

—আপনাকে বকাটে ছোকরা বলে মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছেন। বয়স যদিচ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু স্বভাব কুড়ি-পঁচিশের

মতন। দেখুন, আপনার গলার সুরটি খাসা। চেহারাটিও ওই রকম হবে তো?

—দেখতেই পাবেন। মশাই নিজে কেমন?

—চমৎকার। দেখলেই মোহিত হয়ে যাবেন।

টেলিফোনের আলাপ শেষ হলে জগবন্ধু বললেন, হাঁ হে উদ্ধব, ভুলে তিনটের জায়গায় চার-পাঁচটা ছোলা খেয়ে ফেল নি তো? ফাজিল ছোকরার মত কথা বলছিলে।

—তিনটেই খেয়েছিলুম। কি জান, ছেলেবেলায় বাবার শাসনে কোনও রকম আড্ডা দেওয়া বা বকামি করবার সুবিধে ছিল না। এখন আবার কাঁচা বয়সে এসে ফুর্তি চাগিয়ে উঠেছে। তুমি কিছু ভেবো না, আমার বুদ্ধি ঠিক আছে, বেচাল হবে না।

জগবন্ধু কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। অগত্যা উদ্ধব একলাই রাজকুমারী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানীর কাছে গেলেন। বাড়িটা জীর্ণ, অনেক কাল মেরামত হয় নি, সামনের বাগানেও জঙ্গল হয়েছে। বৃদ্ধ নায়েব রামশশী সরকার উদ্ধবকে একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একটু পরে পাশের পর্দা ঠেলে স্পন্দচ্ছন্দা এলেন।

উদ্ধব স্থির করে এসেছেন যে হ্যাংলামি দেখাবেন না। রসিকতা করবেন বটে, কিন্তু মুরুব্বীর চালে। হলেনই বা রাজকুমারী, উদ্ধব নিজেও তো কম কেও-কেটা নন।

ঘরের ল্যাম্প শেড দিয়ে ঢাকা সেজন্য আলো কম। উদ্ধব দেখলেন, স্পন্দচ্ছন্দা লম্বা, দোহারা, কিন্তু মাংসের চেয়ে হাড় বেশী। মেমের চাইতেও ফরসা, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, চাঁচা ভুরু, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা কোঁকড়ানো চুল, নীল শাড়ি। জগবন্ধুর শিক্ষা অনুসারে উদ্ধব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, নমস্কার।

—নমস্কার। আপনি বসুন।

—ইয়ে, দেখুন শ্রীযুক্তেশ্বরী রাজকুমারী পণ্ডচণ্ডা দেবী—

—স্পন্দচ্ছন্দা।

—হাঁ হাঁ, স্পন্দচ্ছন্দা। দেখুন, একটি কথা গোড়াতেই নিবেদন করি। আপনার নামটা উচ্চারণ করা বড় শক্ত, আমি হেন জোয়ান মরদ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাকে পদ্মীরানী বলি তো কেমন হয়?

—স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমিও আপনাকে উম্‌শে বলব।

—সেটা কি ভাল দেখাবে? প্রজাপতির নির্বন্ধে আমি তো আপনার স্বামী হতে পারি। হবু স্বামীকে নাম ধরে ডাকা আমাদের হিঁদু ঘরের দস্তুর নয়।

স্পন্দচ্ছন্দা হি হি করে হেসে বললেন, আপনি দেখছি অজ পাড়াগেঁয়ে।

—আমি আসল শহুরে, চার পুরুষ কলকাতায় বাস। আপনিই তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন। বেশ, নাম ধরেই ডাকবেন, তাতে আমার ক্ষতিটা কি। এখন কাজের কথা শুরু হক। আমার চেহারাটা কেমন দেখছেন?

—মন্দ কি। একটু বেঁটে আর কালো, তা সেটুকু ক্রমে সয়ে যাবে। আমাকে কেমন দেখছেন?

—খাসা, যেন পটের বিবিটি। অত ফরসা কি করে হলেন?

—আমার গায়ের রংই এই রকম।

উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, ওগো চণ্ডপণ্ডা পদ্মীরানী, রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যাবসা। তুমি এক কোট অস্তরের ওপর তিন পোঁচ চড়িয়েছ—হবক্‌স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি, আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন?

—আপনি অতি অসভ্য।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গায়ের রং তোমারই থাক, আমার তা জানবার দরকার কি। তবে একটা কথা বলি—মূর্তিটা কুমোরটুলি ঢঙের করতে পার নি। যদি আরও বেশী পিউড়ি কি এলামাটি দিতে আর চোখের কাজলটা কান পর্যন্ত টেনে দিতে তবেই খোলতাই হত।

—আপনি নিজে কি মাখেন? আলকাতরা?

উদ্ধব সহাস্যে বললেন, সরষের তেল ছাড়া কিছুই মাখি না। আমার হচ্ছে খোদ রং, নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষলেও উঠবে না, একেবারে পাকা। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবে না। বয়সও ভাঁড়াতে চাই না, ঠিক পঁয়ত্রিশ। তোমার কত?

—বাইশ।

—উঁহু, বেয়াল্লিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা চেঁচিয়ে, বললেন, বাইশ!

আরও চেঁচিয়ে টেবিলে কিল মেরে উদ্ধব বললেন, বেয়াল্লিশ!

—আপনি আমার অপমান করছেন?

—আরে না না, একটু দরদস্তুর করছি। আচ্ছা, তোমার কথা থাকুক, আমার কথাও থাকুক, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তোমার বয়স বত্রিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা মুখ ভার করে বললেন, বেশ, তাই না হয় হল।

—লেখাপড়া কদ্দুর? মাছ-তরকারি ধোবার হিসেব এসব লিখতে পারবে?

নাকটি ওপর দিকে তুলে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, মেমের কাছে এম এ ক্লাসের চাইতে বেশী পড়েছি। মশায়ের বিদ্যে কতদূর?

—ফোর্থ কেলাস পর্যন্ত। তবে রবিঠাকুর জানি—ওরে দুরাচার হিন্দু কুলাঙ্গার, এই কি তোদের—

কানে আঙ্গুল দিয়ে স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, থাক থাক, খুব হয়েছে। আয় কত?

—তোমার কোনও চিন্তা নেই। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে আমার দেদার টাকা আছে। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব, গহনা, সব তোমার মনের মতন হবে। তোমার এস্টেটের আয় কত ?

—পাকিস্থানে পড়েছে, অনেক কাল আদায় হয় নি। তবে ভাবনার কিছু নেই। খাঁ সায়েব বদরুদ্দিন আমার বাবার বন্ধু, তিনি বলেছেন সব আদায় করে দেবেন।

—তবেই হয়েছে। বেচে ফেল, বেচে ফেল।

—বেশ তো। আপনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা। বৈষয়িক আলাপ তো এক রকম হল, এখন একটু প্রেমালাপ করা যাক। দেখ পদীরানী, আমার সঙ্গে দু দিন ঘর করলেই টের পাবে আমি কি রকম দিলদরিয়া চমৎকার লোক। স্পষ্ট করে বল দিকি—আমাকে মনে ধরেছে ?

—তা ধরেছে।

একজন প্যাণ্ট-শার্ট পরা আধাবয়সী ভদ্রলোক পাইপ টানতে টানতে ঘরে ঢুকলেন। স্পন্দচ্ছন্দা দু পক্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন —ইনি হচ্ছেন মিস্টার মকর রায়, বার-অ্যাট-ল, সম্পর্কে আমার দাদা হন। আর ইনি উমেশ পাল, খুব ধনী পেণ্ট-মার্চেণ্ট, আমার ভাবী বর।

মকর রায় বললেন, আরে তাই নাকি ! এঁরই না আজ আসবার কথা ছিল ? বাহাদুর লোক, এসেই হৃদয় জয় করেছেন, একেবারে ব্লিৎস ক্রিগ। কংগ্রাচুলেশন মিস্টার পাল, লাকি ডগ, ভাগ্যবান কুত্তা ! এই বলে উদ্ধবের হাত সজোরে নেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, স্পন্দার মতন মেয়ে লাখে একটি মেলে না মশাই, নাচ গান অ্যাকটিং সব তাতে চৌকস। সিনেমার লোকে সাধাসাধি করছে। এর কাঁচপোকা-নৃত্য যদি দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন।

—কাঁচপোকা নাচে নাকি ?

—যখন তখন নাচে না, আরসোলা ধরার সময় নাচে।

স্পন্দচ্ছন্দা বললেন, জান মকর-দা, মিস্টার পাল হচ্ছেন একজন আদিম হি-ম্যান।

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন, সে আবার কাকে বলে? হি-গোটই তো জানি।

মকর রায় বললেন, হি-ম্যান জানেন না? মদ্দা পুরুষ। আমাদের ঋষিরা যাকে বলতেন নরপুংগব বা পুরুষর্ষভ, অর্থাৎ যিনি ষাঁড়ের মতন শিং বাগিয়ে সোজা ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যান। দেখুন মিস্টার পাল, যদি রঙের কারবার বাড়াতে চান তো আমাকে বলবেন। হুণ্ডাগড় স্টেটের সমস্ত খনি আমার হাতে, অজস্র গেরি মাটি আর এলা মাটি আছে। দু লাখ যদি ঢালেন তবে এক বছরেই তিন লাখ ফিরে পাবেন। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আপনারা এখন আলাপ করুন, আমি ওপরে গিয়ে বসছি।

উদ্ধব বললেন, আরে না না, এইখানেই বসুন। আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই মশাই, বিশেষত আপনি যখন সম্পর্কে শালা। দেখুন মকরবাবু, আপনার এই বোনটি হচ্ছেন আমার মার্গিতব্যা।

—সে আবার কি চিজ?

—জানেন না? চিরকাল খোঁজবার আর চাইবার জিনিস। একজন হেডমাষ্টার কথাটির মানে বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আজকের মতন উঠি, তামাক খেতে হবে, আপনাদের এখানে তো সে পাট নেই। না না, সিগারেট ফিগারেট চলবে না, গুড়ুক চাই। কাল বিকেলে আবার আসব, গড়গড়া আর তামাকের সরঞ্জামও সব নিয়ে আসব। হাঁ, ভাল কথা—আমার আর একটু জানবার আছে। হ্যাঁগা পদীরানী, শুক্ত, মোচার ঘণ্ট, ছোলার ডালের ধোঁকা—এসব রাঁধতে জান?

স্পন্দচ্ছন্দা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ওসব আমি খাই না।

—আমি খেতে ভালবাসি। আচ্ছা, মাগুর মাছের কালিয়া, ইলিশের পাতুরি, ভাপা দই—এসব করতে জান?

—ও তো বাবুর্চীর কাজ।

—তবে কি ছাই জান! এসব রান্না বাবুর্চীর কাজ নয়, গিন্নীরই করা উচিত। তোমার নাচ দেখে তো আমার পেট ভরবে না।

—ও, আপনি রাঁধুনী গিন্নী চান! একটা কেষ্টদাসী কি কালিদাসী ঘরে আনলেই পারতেন।

হঠাৎ রেগে গিয়ে উদ্ধব বললেন, কি বললে! কালিদাসীর সামনে তুমি দাঁড়াতে পার নাকি?

—অত রাগ কেন মশাই, তিনি বুঝি আপনার আগেকার গিন্নী?

উদ্ধব গর্জন করে বললেন, আগেকার কি, দস্তুর মত জলজ্যান্ত এখনকার! তার কাছে তুমি? তরমুজের কাছে তেলাকুচো, কাম-ধেনুর কাছে মেনী বেরাল!

স্পন্দচ্ছন্দা চিৎকার করে বললেন, অ্যাঁ, এক স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে এসেছ? ঠক জোচ্চোর, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!

মকর রায় বললেন, যাবে কোথায়! রীতিমত ক্রিমিনাল কাণ্ড, ধাপ্পা দিয়ে রাজকন্যা আর রাজ্য আদায় করতে এসেছে। থাম, মজা টের পাইয়ে দেব।

উদ্ধব দাঁত খিঁচিয়ে কিল দেখিয়ে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত শুনে জগবন্ধু বললেন, ব্যাপারটা ভাল হল না। ওরা অমনি ছাড়বে না, তোমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করবে।

উদ্ধব বললেন, গিন্নীর নামটা শুনে হঠাৎ কেমন মন খারাপ হয়ে গেল, সামলাতে পারলুম না। তা যাক গে, কি আর করবে।

দু দিন পরে সলিসিটার গুঁই অ্যাণ্ড ছুঁই-এর চিঠি এল।—রাজ-কুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরানীকে যে মানসিক আঘাত

দেওয়া হয়েছে এবং তজ্জনিত তাঁর যে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে তার খেসারত স্বরূপ এক লক্ষ টাকা তিন দিনের মধ্যে পাঠানো চাই, অন্যথায় উমেশ পালের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করা হবে।

জগবন্ধু বললেন, মুশকিলে ফেললে দেখছি। মকদ্দমার ফল যাই হক, হয়রানি আর কেলেঙ্কারি হবে। ভাবিয়ে তুললে হে!

উদ্ধব বললেন, ভাবনা কিসের। মোক্ষম উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। ব্যাঙ্গমার কথা মনে নেই?

জগবন্ধু সোৎসাহে বললেন, রাজী আছ তুমি?

—খুব রাজী। শখ মিটে গেছে, হোটেলের জঘন্য রান্না আর খেতে পারি না। দেখ তো পূর্ণিমা কবে।

পাঁজি দেখে জগবন্ধু বললেন, আজই তো!

সন্ধ্যার সময় দুজনে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এলেন এবং তিনটি বেলপাতা চিবিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন—বম মহাদেব সকল বস্তু আগের মতন আবার অস্তু। বলেই একটি ডুব দিলেন।

ঘাটে উঠে মাথা মুছতে মুছতে উদ্ধব বললেন, ওহে জগু, আবার দিব্যি একমাথা টাক হয়েছে, শরীরটাও আড়াইমনী হয়ে গেছে। তোমার কেমন হল?

জগবন্ধু বললেন, আমারও মুখে দুপাটি নকল দাঁত এসে গেছে। সব তো হল, এখন বাড়ি গিয়ে বলবে কি? দু-হপ্তা আমরা গায়েব হয়ে আছি, তার একটা ভাল রকম কৈফিয়ত দেওয়া চাই।

—সে তুমি ভেবো না। তুমি তা পারবেও না, চিরকাল মাস্টারি করে ছেলেদের শিখিয়েছ—সদা সত্য কথা কহিবে। যা বলবার আমিই বলব। আজ রাতে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, হোটেলে ফিরে চল।

হোটেলে এসে দেখলেন, তাঁদের ঘরে চার জন বিছানা পেতে শুয়ে আছে। উদ্ধব ম্যানেজারকে বললেন, আচ্ছা লোক তো আপনি, কিছু না জানিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা ঘরে অন্য লোক ঢুকিয়েছেন! এর মানে কি?

ম্যানেজার আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে আপনারা?

—ন্যাকা, চিনতে পারছেন না! উমেশ পাল আর জলধর গাঙ্গুলী। উনিশে বোশেখ, মানে দোসরা মে বুধবার থেকে দু হপ্তা এই ঘর আমাদের দখলে আছে।

—দু-হপ্তা বলছেন কি মশাই, নেশা করেছেন নাকি? আজই তো বুধবার দোসরা মে উনিশে বোশেখ।

উদ্ধবকে টেনে নিয়ে রাস্তায় এসে জগবন্ধু বললেন, সবাই ধুস্তুরী মায়া। গত দু-হপ্তা জগতের ইতিহাস থেকে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এখন বাড়ি চল।

রাত প্রায় বারোটার সময় জগবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধব নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন। উদ্ধব-গৃহিণী কালিদাসী তারস্বরে বললেন, বলি দুপুর রাত পর্যন্ত দুই ইয়ারে ছিলে কোন্ চুলোয়? ওঁর লক্ষ্মী না হয় ছেড়ে গেছে, তোমার তো ঘরে একটা আপদ-বালাই আছে। দেরি দেখে মানুষটা ভেবে মরছে সে হুঁশ হয় নি বুঝি?

উদ্ধব হাঁপাতে হাঁপাতে কান্নার সুরে বললে, ওঃ গিন্নী, তোমার শাঁখা-সিঁদুরের জোরে আর এই জগু ভাই-এর হিম্মতে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাটে গঙ্গার ধারে বসেছিলুম। ভাবলুম মুখ হাত পা ধুয়ে নিই, তার পর মায়ের আরতি দেখব। যেমন জলে নাবা অমনি এক মস্ত কুমির পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল—

উদ্ধবের দু পায়ে হাত বুলিয়ে কালিদাসী বললেন, কই দাঁত বসায় নি তো!

—ফোকলা কুমির গিন্নী, একদম ফোকলা। ভাগ্যিস কুমিরটা বুড়ো ছিল তাই পা বেঁচে গেছে। আমার বিপদ দেখে জগু লাঠি নিয়ে লাফিয়ে জলে পড়ল। এক হাতে সাঁতার দেয়, আর এক হাতে ধপাধপ লাঠি চালায়। শেষে চাঁদপাল ঘাটে এসে কুমিরটা মারের চোটে কাবু হয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তার পর এক ময়রার দোকানে উনুন-পাড়ে বসে জামাকাপড় শুকিয়ে ঘরে ফিরেছি।

কালিদাসী বললেন, মা দক্ষিণেশ্বরী রক্ষা করেছেন, কালই পূজো পাঠাব। রান্না সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে, গরম করে দিচ্ছি, লুচিও এখনি ভেজে দিচ্ছি। ততক্ষণ তোমরা মুখ হাত পা ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও। গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি খবর পাঠাচ্ছি, উনি এখানেই খেয়ে দেয়ে যাবেন এখন।

উদ্ধব বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, এখানেই খাবে হে জগু, এখানেই খাবে। গিন্নীর রান্না তো নয়, অমৃত।

১৩৫৭

রামধনের বৈরাগ্য

সাহিত্যগগনে উড়ন-তুবড়ির মতন রামধন দাসের উত্থান যেমন আশ্চর্য তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধানও সেই রকম। কিন্তু এখন তাঁর নাম কেউ করে না, কারণ বাঙালী পাঠক অতি হিমকহারাম। তারা জয়ঢাক পিটিয়ে যাকে মাথায় তুলে নাচে, চোখের আড়াল হলেই কিছু দিনের মধ্যে তাকে ভুলে যায়। রামধনেরও সেই দশা হয়েছে। এককালে তিনি অদ্বিতীয় কথাসাহিত্যিক বলে গণ্য হতেন, তাঁর খ্যাতির সীমা ছিল না, রোজগারও প্রচুর করতেন। তার পর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ভক্তপাঠকরা এবং সপক্ষ বিপক্ষ লেখকরা অনুসন্ধানের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু ঠিক খবর কিছুই পাওয়া গেল না। কেউ বলে নোবেল প্রাইজের তদবির করবার জন্য তিনি বিলাতে আছেন, কেউ বলে সাহিত্যিক গুণ্ডারা তাঁকে গুম-খুন করেছে, কেউ বলে সোভিয়েট সরকার তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে, তিনি কমিউনিস্ট শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ করছেন।

আসল কথা, রামধন দাস তাঁর নাম আর বেশ বদলে ফেলে বিষ্ণুপ্রয়াগে আছেন এবং গুরুর উপদেশে সস্ত্রীক যোগ সাধনা করছেন। কেন তিনি সাহিত্যচর্চা আর বিপুল প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আশ্রমবাসী তপস্বী হলেন তার রহস্য তাঁর মুখ থেকে কেবল একজন শুনেছেন—তাঁর গুরুদেবের প্রধান শিষ্য ও আশ্রম-সেক্রেটারি নিবিড়ানন্দ। এই নিবিড় মহারাজের পেটে কথা থাকে না। এঁর মুখ থেকে লোকপরম্পরায় যে খবর এখানে এসে পৌঁছেছে তাই বিবৃত করছি। কিন্তু শুধু এই খবরটি শুনলে চলবে না, রামধন দাসের ইতিহাস গোড়া থেকে জানা দরকার।

বি. এ. পাস করার পর রামধন একজন বড় প্রকাশকের অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। মনিবের ফরমাশে তিনি কতকগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যেমন ছেলেদের গীতা, ছোটদের বেদান্ত, কচিদের ভারতচন্দ্র, খোকাবাবুর গুপ্তকথা, খুকুমণির আত্মচরিত, ইত্যাদি। বইগুলি সস্তা সচিত্র আর প্রাইজ দেবার উপযুক্ত, সেজন্য কাটতি ভালই হল। একদিন রামধন এক বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে শুনলেন, গল্প রচনা খুব সোজা কাজ। সাহিত্যে কালো-বাজার নেই, কিন্তু চোরাবাজার অবারিত। বাঙালী লেখক ইংরিজী থেকে চুরি করে, হিন্দী লেখক বাংলা থেকে চুরি করে, এই হল দস্তুর। কথাটি রামধনের মনে লাগল। তিনি দেদার বিলিতী আর মার্কিন ডিটেকটিভ গল্প আত্মসাৎ করে বই লিখতে লাগলেন। খদ্দেরের অভাব হল না, তাঁর মনিবও তাঁকে লাভের মোটা অংশ দিলেন। কিন্তু রামধন দেখলেন, তাঁর রোজগার ক্রমশ বাড়লেও উচ্চ সমাজে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে না। মোটর ড্রাইভার, কারিগর, টিকিটবাবু, বকাটে ছোকরা, আর অল্পশিক্ষিত চাকরিজীবীই তাঁর বইএর পাঠক। পত্রিকাওয়ালারা বিজ্ঞাপন ছাপেন কিন্তু সমালোচনা প্রকাশ করতে রাজী হন না। বলেন, এ হল নীচু দরের সাহিত্য, এর সমালোচনা ছাপলে পত্রিকার জাত যাবে। রামধন মনে মনে বললেন, বটে! আমার রোমাঞ্চ-লহরীকে হরিজন-সাহিত্য ঠাউরেছ? প্রেমের প্যাঁচ চাও, মনস্তত্ত্ব চাও, যৌন আবেদন চাও? আচ্ছা, আমার শক্তি শীঘ্রই দেখতে পাবে।

রামধন হুঁশিয়ার কর্মবীর, আগাগোড়া না ভেবে কোনও কাজে হাত দেন না। তিনি প্রথমেই মনে মনে পর্যালোচনা করলেন—বাংলা কথাসাহিত্যের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত কি রকম পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের লেখকদের হাত পা বাঁধা ছিল, প্রণয়ব্যাপার দেখাতে হলে প্রাচীন হিন্দুযুগে অথবা মোগল-রাজপুতের আমলে যেতে হত, নইলে নায়িকা জুটত না। তার পরের লেখকরা

নোলক-পরা বালিকা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন, কিন্তু জুত করতে পারলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নেহাত বাচ্চা, তবু বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সসম্মানে 'তিনি' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নাবালিকা সাবালিকা কোনও নায়িকাকেই খাতির করেন নি, কিন্তু তাঁর কমলা সুচরিতা ললিতা এখনকার দৃষ্টিতে খুকী মাত্র। পরে অবশ্য তিনি বয়স বাড়িয়েছেন, যেমন শেষের কবিতার লাবণ্য, চার অধ্যায়ের এলা। বাংলা গল্পের মধ্যযুগে জোরালো প্রেম দেখাতে হলে মামুলী নায়িকায় কাজ চলত না, শালী বউদিদি বা বিধবা উপনায়িকাকে আসরে নামাতে হত। সেকেলে গল্পের নায়কদেরও বৈচিত্র্য ছিল না, হয় প্রতাপের মতন যোদ্ধা, না হয় গোবিন্দলালের মতন ধনি-সন্তান। দামোদর মুখুজ্যে ও তৎকালীন লেখকদের নায়করা প্রায় জমিদারপুত্র, তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, গরিব প্রজাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিত, এবং যথাকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে খুশী করে রায় বাহাদুর খেতাব পেত। তার পর ক্রমে ক্রমে বাঙালী সমাজের পটপরিবর্তন হল, সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও প্লটপরিবর্তন হল, বোমা স্বদেশী আর অসহযোগের সুযোগে মেয়ে-পুরুষের কাজের গণ্ডি বেড়ে গেল, মেলা-মেশা সহজ হল। অবশেষে এল কিষান-মজদুরের আহ্বান, কমরেডী কর্মক্ষেত্র, জাপানী আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নরহত্যা, দেশ-জবাই, স্বাধীনতা, বাস্তুত্যাগ, নারীহরণ, মহাকলিযুগ, লোক-লজ্জার লোপ, অবাধ দুষ্কর্ম। মানুষের দুর্দশা যতই বাড়ুক, গল্প লেখা যে খুব সুসাধ্য হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। এখনকার নায়ক কবি দোকানদার সৈনিক নাবিক বৈমানিক চোর ডাকাত দেশ-সেবক সবই হতে পারে। নায়িকাও নার্স টাইপিস্ট টেলিফোনবালা সিনেমাদেবী মজদুরনেত্রী সম্পাদিকা অধ্যাপিকা যা খুশি হতে পারে। সংস্কৃত কবিরা যাকে 'সংকেত' বলতেন, অর্থাৎ ট্রিস্ট, তারও বাধা নেই, রেস্তোরাঁ আছে, পার্ক আছে, লেক আছে, সিনেমা আছে। ভারতীয় কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হয়েছে, সমাজ আর

পরিবেশ বদলে গেছে, অতএব রামধন একটু চেষ্টা করলেই শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য গল্পকারদের সমকক্ষ হতে পারবেন।

আধুনিক বাঙালী লেখকরা বুঝেছেন যে সেক্স অ্যাপীলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্পের প্রাণ। এই জিনিসটি আসলে আমাদের সনাতন আদিরস। কিন্তু তার ফরমুলা বড় বাঁধাধরা, বৈচিত্র নেই, ঝাঁজও মরে গেছে, সেজন্য আধুনিক রুচির উপযুক্ত অদলবদল করে তার নাম দেওয়া হয়েছে যৌন আবেদন। এপর্যন্ত কোনও বাঙালী সাহিত্যিক এই আবেদন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন নি। ফরাসী লেখক ফ্লোবেয়ার প্রায় একশ বছর আগে 'মাদাম বোভারি' লিখেছিলেন, কিন্তু এদেশের কোনও গল্পকার তার অনুকরণ করেন নি। লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি', হাক্সলির 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' প্রভৃতির নকল করতে কারও সাহস হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কোনও নায়িকা "প্রেমের বীর্যে যশস্বিনী' হতে পারে নি। চারু কমলা বিমলা আর বিনোদ বোঠানকে তিনি রসাতলের মুখে এনেও রাস টেনে সামলে রেখেছেন। আর শরৎ চাটুজ্যেই বা কি করেছেন? গুটিকতক ভ্রষ্টাকে সুশীলা বানিয়েছেন। দুর্দান্ত লম্পট জীবানন্দকে পোষ মানিয়েছেন, অথচ কোনও লম্পটাকে গৃহলক্ষ্মী করতে পারেন নি। চারু বাঁড়ুজ্যে তাঁর 'পঙ্কতিলক'-এ এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা একেবারে পণ্ড হয়েছে। আসল কথা, এদেশের কথাসাহিত্য এখনও সতীত্বের মোহ কাটাতে পারে নি।

পাশ্চাত্ত্য লেখকরা যা পেরেছেন রামধনও তা পারবেন, এ ভরসা তাঁর আছে। সমাজের মুখ চেয়ে লিখবেন না, তিনি যা লিখবেন সমাজ তাই শিখবে। রামধন তাঁর পদ্ধতি স্থির করে ফেললেন এবং বাছা বাছা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস মন্থন করে তা থেকে সার উদ্ধার করলেন। এই বিদেশী নবনীতের সঙ্গে দেশী শাক-ভাত আর লঙ্কা মিশিয়ে তিনি যে ভোজ্য রচনা করলেন তা বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব।

প্রকাশক ভয়ে ভয়ে তা ছাপালেন। বইটি বেরুবামাত্র সাহিত্যের বাজারে হুলুস্থুল পড়ে গেল।

প্রবীণ লেখক আর সমালোচকরা বজ্রাহত হয়ে বললেন, এ কি গল্প না খিস্তি? তাঁরা পুলিস অফিসে দূত পাঠালেন, মন্ত্রীদের ধরলেন যাতে বইখানা বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু কিছুই হল না, কারণ কর্তারা তখন বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। প্রগতিবাদী নবীন সমাজ গল্পটিকে লুফে নিলেন। এই তো চাই, এই তো নবাগত যুগের বাণী, মিলনের সুসমাচার, প্রেমের মুক্তধারা, হৃদয়ের উর্ধ্বপাতন, আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণ। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক—যিনি চুলে কলপ না দিয়ে মনে কলপ লাগিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করছেন—বললেন, বেড়ে লিখেছে রামধন। এতে দোষের কি আছে? তোমাদের ঋষিকল্প সবজান্তা লেখক এচ. জি. ওয়েল্‌স-এর নভেল 'বলপিংটন অভ ব্লপ' পড়েছ? তাতে যদি কুরুচি না পাও তবে রামধনের বইএও পাবে না।

প্রথমে যে দু-চারটি বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছিল পরে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তোড়ে ভেসে গেল। বইটি কেনবার জন্য দোকানে দোকানে যে কিউ হল তার কাছে সিনেমার কিউ কিছুই নয়। এক বৎসরের মধ্যে সাতটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। রামধন পরম উৎসাহে গল্পের পর গল্প লিখতে লাগলেন। যেসব সম্পাদক পূর্বে তাঁকে গাল দিয়েছিলেন তাঁরাই এখন গল্পের জন্য রামধনের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। সমস্ত সাহিত্যসভায় রামধনই এখন সভাপতি বা প্রধান অতিথি। তাঁর উপাধিও অনেক—সাহিত্য-দিগ্‌গজ, গল্প-রাজচক্রবর্তী, উপন্যাসভাস্কর, কথারণ্যকেশরী, ইত্যাদি। তাঁর ভক্তের দল এক বিরাট সভায় প্রস্তাব করলেন যে তাঁকে জগত্তারিণী মেড়েল দেওয়া হক। কিন্তু সস্তা নাইন ক্যারাট গোল্ডের তৈরী জানতে পেরে রামধন বললেন, ও আমার চাই না, বাহাত্তুরে বুড়োদের জন্যই ওটা থাকুক।

যাঁর লক্ষ টাকা জমেছে তিনি ক্রোড়পতি হতে চান, যিনি এম. এল. সি. হয়েছেন তিনি মন্ত্রী হতে চান, সেকালে রায়বাহাদুররা সি. আই. ই. আর সার হবার জন্য লালায়িত হতেন। রামধনেরও উচ্চাশা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। তিনি স্থির করলেন এবারে এমন একটি উপন্যাস লিখবেন যার প্লট কোনও দেশের কোনও লেখক কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। ভীরু বাঙালী লেখক কদাচিৎ নায়ককে উচ্ছৃঙ্খল করলেও নায়িকাকে একান্নুরক্তাই করে। তারা বোঝে না যে নারীরও জংলী জই অর্থাৎ ওআইল্ড ওট্স বোনা দরকার, নতুবা তার চরিত্র স্বাভাবিক হতে পারে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লেখক অনেক গল্পে নায়িকাকে কিছুকাল স্বৈরিণী করে রাখেন, তাতে তার 'আবেদন' বেড়ে যায়। তার পর শেষ পরিচ্ছেদে তার বিয়ে দেন। কিন্তু এবারে রামধন দেশী বা বিদেশী কোনও গতানুগতিক পথে যাবেন না, একেবারে নতুন নায়িকা সৃষ্টি করবেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ভগবান নিজের মতলব অনুসারে নরনারীর চরিত্র রচনা করেন। কিন্তু গল্পজগতে ভগবানের হাত নেই, রামধন নিজেই তাঁর পাত্র-পাত্রীর স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তিনি প্রচলিত সামাজিক আদর্শ মানবেন না, যেমন খুশি চরিত্র রচনা করবেন।

মা বাপ একসঙ্গে অনেক সন্তানকে ভালবাসে, তাতে দোষ হয় না। নারী যদি এককালে একাধিক পুরুষে আসক্ত হয় তাতেই বা দোষ হবে কেন? এখনকার প্রগতিবাদী লেখকদের তুলনায় ব্যাসদেব ঢের বেশী উদার ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে একসঙ্গে পাঁচটি পতি দিয়েছেন, যযাতির কন্যা মাধবীর এক পতি থাকতেই অন্য পতির সঙ্গে পর পর চার বার বিবাহ দিয়েছেন। নিজের জননী মৎস্য-গন্ধাকেও তিনি ছেড়ে দেন নি, তাঁকে শান্তনু-মহিষী বানিয়েছেন। ব্যাস বেপরোয়া বাহাদুর লেখক, কিন্তু রামধন তাঁকেও হারিয়ে দেবেন। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পঞ্চপতি বরণ করেন নি, গুরুজনের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। মাধবী আর মৎস্যগন্ধাও নিজের মতে

চলেন নি। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কাকে বলে রামধন দাস তা এবারে দেখিয়ে দেবেন।

রামধন যে নতুন গল্পটি আরম্ভ করলেন তা খুব সংক্ষেপে বলছি রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান যেমন বৃন্দাবন, সিনেমার তারক-তারকার গগন যেমন টালিগঞ্জ, অভিজাত নায়ক-নায়িকার বিলাসক্ষেত্র তেমনি বালিগঞ্জ। আনাড়ী পাঠক—বিশেষত প্রবাসী আর পাড়াগেঁয়ে পাঠক—মনে করে বালিগঞ্জ হচ্ছে অলকাপুরী, যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরার দেশ। সেখানে মশা আছে, মাছি আছে, পচা ড্রেন আছে, দারিদ্র্যও আছে, কিন্তু তার খবর কে রাখে। সেই কল্পলোক বালিগঞ্জেই রামধন তাঁর গল্পের ভিত্তিস্থাপন করলেন।

তিন একর জমির মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তাতে থাকেন প্রৌঢ় ব্যারিস্টার পি. পি. মল্লিক আর তাঁর রূপসী বিদুষী যুবতী কন্যা রম্ভা। বাড়িতে অন্য কোনও আত্মীয়ের জঞ্জাল নেই, অবশ্য দারোয়ান খানসামা বাবুর্চী যথেষ্ট আছে। মল্লিক সাহেব সকালে ব্রেকফাস্ট করেই তাঁর চেম্বারে যান সেখান থেকে কোর্টে যান, ফিরে এসে বাড়িতে ঘণ্টা খানিক থেকেই ক্লাবে যান, তার পর অনেক রাত্রে টলতে টলতে ফিরে আসেন। কন্যার বিবাহের জন্য তাঁর কোনও চিন্তা নেই। বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, বুদ্ধিও আছে, সম্পত্তিও ঢের পাবে; উপযুক্ত বর ও নিজেই বেছে নেবে।

বাড়ির তিন দিকে বাগান, একদিকে গাছে ঘেরা সবুজ মাঠ। বিকেলে সেখানে নানা জাতের শৌখিন পুরুষের সমাগম হয়। তারা টেনিস খেলে, চা বা ককটেল খায়, তার পর রম্ভাকে ঘিরে আড্ডা দেয়। এরা সবাই তার প্রেমের উমেদার, কিন্তু এপর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্রয় পায়নি, রম্ভা সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছে। পূর্বে অনেক মেয়েও এখানে আসত, কিন্তু পুরুষগুলোর একচোখোমির জন্য রেগে গিয়ে তারা আসা বন্ধ করেছে।

এই রকমে কিছুকাল কেটে গেল। যাদের ধৈর্য কম তারা একে একে আড্ডা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করতে গেল। বাকী রইল শুধু আট জন পরম ভক্ত। সাড়ে সাত বলাই ঠিক, কারণ একজন হচ্ছে ইস্কুলের ছাত্র, এবারে ম্যাট্রিক দেবে। সে কথা বলে না, শুধু হাঁ করে রম্ভাকে দেখে আর বোকার মতন হাসে।

এই সাড়ে সাত জনের মধ্যে তিন জনের পরিচয় জানলেই চলবে, বাকী সব নগণ্য। প্রথম লোকটি ডক্টর বিদ্যাপতি ঘোষ, বিস্তর ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরেছে, সরকারী ভাল চাকরি পেয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে ফ্লাইট-লেফ্‌টেনাণ্ট বিক্রম সিং রাঠোর লম্বা চওড়া জোয়ান, এয়ার ফোর্সে কাজ করে, এখন ছুটিতে আছে। তৃতীয় লোকটি শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায়, উড়িষ্যার কোনও রাজার জ্ঞাতি, অতি সুপুরুষ, সরাইখেলার নাচ জানে।

ক্রমশ সকলের সন্দেহ হল যে বিদ্যাপতি ঘোষের দিকেই রম্ভা বেশী ঝুঁকেছে। কিন্তু দু দিন পরেই দেখা গেল, নাঃ, ওই ষণ্ডমার্ক বিক্রম সিংটার ওপরেই রম্ভার টান। আরও দু দিন পরে বোধ হল, উঁহু, ওই উড়িষ্যার নবকার্তিক শ্যামসুন্দরের প্রেমেই রম্ভা মজেছে।

কারও বুঝতে বাকী রইল না যে ওই তিন জনের মধ্যেই এক-জনকে রম্ভা বরমাল্য দেবে। অগত্যা আর সবাই আড্ডা থেকে ভেগে পড়ল, কিন্তু সেই ইস্কুলের ছেলেটি রয়ে গেল।

একদিন বিদ্যাপতি ঘোষ এক ঘণ্টা আগে এসে রম্ভাকে যথারীতি প্রণয়নিবেদন করলে। রম্ভা গদ্‌গদ স্বরে বললে, এর জন্যেই আমি অপেক্ষা করেছিলাম, অনেকদিন থেকেই তোমাকে আমি ভালবাসি। তবে আজ আর বেশী কথা নয়, দশ দিন পরে তোমার কাছে আমার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করব।

পরদিন বিক্রম সিং রাঠোর এক ঘণ্টা আগে এসে বিবাহের প্রস্তাব করলে। রম্ভা বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার, তুমি আমার

দল কা পিয়ার। লক্ষীটি, ন দিন সময় দাও, তার পর পাকা কথা হবে।

তার পরদিন শ্যামসুন্দর ভ্রমরবররায় সকাল সকাল এসে বললে, শুন রম্ভা, তুমার জন্য আমি পাগল, তুমি আমার হও। রম্ভা উত্তর দিলে, আমিও তোমার জন্য পাগল, আট দিন সবুর কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকলে উপস্থিত হলে চা খাওয়ার পর সেই ম্যাট্রিক ছাত্রটিকে রম্ভা বললে, গাবলু, তুমি বাড়ি যাও। গাবলুর পৌরুষে ঘা লাগল। একটু রুখে বললে, কেন?

—দু দিন পরে পরীক্ষা তা মনে নেই? তুমি অঙ্কে বেজায় কাঁচা। যাও, বাড়ি গিয়ে গসাগু লসাগু কষ গে, এখানে ইয়ারকি দিতে হবে না।

গাবলু সকলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে চলে গেল।

রম্ভা তার তিন প্রণয়ীকে বললে, এখন এখানে কোনও বাজে লোক নেই, আমার মনের কথা খোলসা করে বলছি শোন। তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছি, তিন জনই আমার বাঞ্ছিত বল্লভ, কান্ত দয়িত, দিলরুবা ডারলিং।

বিদ্যাপতি হতভম্ব হয়ে বললে, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? বিয়ে তো একজনের সঙ্গেই হতে পারে।

বিক্রম সিং বললে, মরদের অনেক জোরু হতে পারে, কিন্তু ঔরতের এক শৌহর। এই হল আইন। তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও, নয় তো ভারী গড়বড় হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, রম্ভা, তুমি একি বলছ? ছি ছি, হে জগন্নাথ দীনবন্ধু!

রম্ভা উত্তর দিলে, আমি সত্য বলেছি, আমার কথার নড়চড় হবে না। শোন বিদ্যাপতি, তুমি আমার দেশের লোক, বিদ্যার

জাহাজ, তোমাকে আমার চাইই। আর বিক্রম সিং, রাজপুত জাতটির ওপর আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা টান আছে। তোমার মতন নওজওআন বীরকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। আর শ্যামসুন্দর, তুমি ললাটেন্দুকেশরীর বংশধর, তোমরা চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক, তুমি নিজেও পরম সুন্দর। তোমাকে না হলে আমার চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তবে আর এদিক ওদিক করছ কেন রম্ভা? তুমি রাধা আমি শ্যাম, আমাকে বিয়া কর।

রম্ভা বললে, রাধার সঙ্গে শ্যামের বিয়ে হয় নি।

বিদ্যাপতি বললে, রম্ভা, তুমি স্পষ্ট করে বল তো কাকে বিয়ে করতে চাও।

—কাকেও নয়। বিবাহের কোনও দরকার নেই, তোমরা তিন জনেই মিলে মিশে আমার কাছে থাকবে। যদি নিতান্ত না বনে তবে নিজের নিজের বাড়িতেই থেকো, ডেট ফিক্‌স করে আমার কাছে আসবে।

—সমাজের ভয় কর না?

—আমরা নতুন সমাজ গড়ব। আবার বলছি শোন। তোমাদের তিন জনকেই আমি ভালবাসি। বিনা বিবাহে একসঙ্গে বা পালা করে যদি আমার সঙ্গে বাস কর তবে আমি ধন্য হব, তোমরাও নিশ্চয় সুখী হতে পারবে। তাতে যদি রাজী না হও তবে চিরবিদায়, আমি তিব্বতে চলে যাব। আমার আদর্শ বিসর্জন দিতে পারব না।

বিদ্যাপতি বললে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ঘর করতে পারে, কিন্তু পুরুষ সপতি বরদাস্ত করবে না, খুনোখুনি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, সে ভারী মুশকিলের কথা। আমরা মরে গেলে তুমি কার সঙ্গে ঘর করবে রম্ভা?

রম্ভা বললে, আমার আর একটু বলবার আছে শোন। তোমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর, বেশ করে ভেবে দেখ, সেকেলে সংস্কারের

বশে আমার এই মহৎ সামাজিক এক্সপেরিমেণ্টটি পণ্ড করে দিও না। দশ দিন পরে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাকে জানিও, তার মধ্যে এখানে আর এসো না, তাতে শুধু বাজে তর্ক আর কথা কাটাকাটি হবে। এই আমার শেষ কথা।

তিন প্রণয়ী সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল।

এই পর্যন্ত লেখার পর রামধন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গল্পের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস সমস্তই বাকী। এর পরেই প্লট জমে উঠবে, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক জটিলতর হবে, রামধন ভানুমতীর খেল দেখাবেন। তিনি তাঁর চমৎকার প্লটটির সমাধান মামুলী উপায়ে কিছুতেই হতে দেবেন না। দু জন নায়ককে মেরে ফেলে লাইন ক্লিয়ার করা অতি সহজ, কিন্তু তাতে বাহাদুরি কিছুই নেই। নায়িকাকেও তিনি মারবেন না অথবা দেশের কাজে বা ধর্মকর্মে তার জীবন উৎসর্গ করবেন না। রামধন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রম্ভার পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত করবেনই। কিন্তু শুধু তিনি নায়কের একমুখী প্রেম এবং এক নায়িকার ত্রিমুখী প্রেম দেখালেই চলবে না, অন্য নরনারীর সঙ্গেও তাদের প্রেমলীলা দেখাতে হবে, তবেই তাঁর গল্পটি একেবারে অভাবিতপূর্ব বৈচিত্র্যময় রসঘন চমকপ্রদ হবে। প্রথম ধাক্কায় ঘাবড়ে গেলেও সমঝদার পাঠকরা পরে ধন্য ধন্য করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন নায়কের সঙ্গে এক নায়িকার মিলন ঠিক কি ভাবে দেখাবেন, তাদের যৌথ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা কি রকম করবেন, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ভাবে বজায় থাকবে—এই রকম নানা সমস্যা তাঁর মনে উঠতে লাগল। রামধন দমবার পাত্র নন। এতটা যখন গড়তে পেরেছেন তখন শেষটাই বা না পারবেন কেন। তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না, তিনি দিনকতক

লেখা বন্ধ রেখে বিশ্রাম নেবেন। তার মধ্যে সমাধানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নিশ্চয় তাঁর মাথায় এসে পড়বে।

রামধন কলকাতা ছেড়ে কোন্নগরে গঙ্গার ধারে তাঁর এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বিশ্রাম ঠিক নয়, একরকম তপস্যা। তিনি তাঁর মনের বল্‌গা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর কল্পনা এলোমেলো নানা পথে সমস্যার সমাধান খুঁজছে।

রাত বারোটা, রামধন বিছানায় শুয়ে সশব্দে ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর নাক ডাকা থেমে গেল। জাগা আর ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থায় তিনি মশারির ভিতর থেকে দেখলেন, তিনটে ছায়ামূর্তি। মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে উঠল। রামধন তাদের চিনতে পারলেন, তাঁরই গল্পের তিন নায়ক। তারা একটা গোল টেবিল বৈঠকে বসে তর্ক করছে।

বিদ্যাপতি বলছে, এই যে বিশ্রী বিপরিস্থিতি, এ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় তো আমার মাথায় আসছে না।

বিক্রম সিং উত্তর দিলে, উপায় আছে। ডুয়েল লড়লে সহজেই ফয়সালা হতে পারবে। এই ধর, প্রথমে তোমার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের লড়াই হল, তুমি মরে গেলে। তার পর শ্যাম আর আমার লড়াই হল, শ্যাম মরল। তখন আর কোনও ঝঞ্চাট থাকবে না, আমার সঙ্গে রম্ভার শাদি হবে।

শ্যামসুন্দর বললে, তুমার মুণ্ড হবে, মানুষ খুন করার জন্য তুমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তা ছাড়া এখন হচ্ছে গান্ধীরাজ, খুন জখম চলবে না। আমি বলি কি—লটারি লাগাও।

বিদ্যাপতি বললেন, রম্ভা তাতে রাজী হবে না, ভারী বেয়াড়া মেয়ে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

এমন সময় রম্ভা হঠাৎ এসে বললে, তোমরা কি স্থির করলে? তিন জনে একমত হয়েছ তো?

শ্যামসুন্দর বললে, হাঁ, তুমার নাক কাটি দিব। তুমাকে চাই না, আমার ছু-গোটা ভাল ভাল বহু দেশে আছে, বিক্রম সিংএর ভি ওমদা ওমদা জোরু আছে। আর বিদ্যাপতিবাবুর বহু তো মজুত রয়েছে, উনি ইচ্ছা করলেই তেলেনা সরকারকে বিয়া করতে পারেন।

নায়কদের এই বিদ্রোহ দেখে রামধন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শুয়ে থেকেই হাত নেড়ে বললেন, না না, ওসব চলবে না।

শ্যামসুন্দর বললে, তু কোন্‌রে শড়া? তুই কে?

রামধন উত্তর দিলেন, আমিই গল্পলেখক, তোমাদের স্রষ্টা আর ভাগ্যবিধাতা। তোমরা নিজের মতলবে চলতে পার না, আমি যেমন চালাব তেমনি চলবে। আমার মাথা থেকেই তোমরা বেরিয়েছ।

বিক্রম সিং বললে, এই ছুছুন্দরটা বলে কি? এই আমাদের পয়দা করেছে? আমাদের বাপ দাদা পরদাদা নেই?

রম্ভা বললে, কেউ নেই, কেউ নেই, আমরা সব ঝুটো।

বিক্রম সিং একটানে খাটের ছতরি খুলে ফেলে একটা কাঠ হাতে নিয়ে রামধনকে বললে, এই, আমরা সব ঝুটা?

রামধন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, তা একরকম ঝুটা বই কি— যখন আমারই কল্পনাপ্রসূত আপনারা।

—তুই সাচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে আমি তো ঝুটা হতে পারি না।

—এই ডাণ্ডা সাচ্চা না ঝুটা?

—আজ্ঞে এও ঝুটা নয়।

অনন্তর তিন নায়ক আর এক নায়িকা ছতরির কাঠ দিয়ে বেচারা রামধনকে পিটতে লাগল। স্বামীর আর্তনাদ শুনে রামধন-পত্নী

ননীবালার ঘুম ভেঙে গেল, তিনি একটি চিৎকার ছেড়ে মূর্ছিত হলেন। তার পর চার মূর্তি তাণ্ডব নাচতে নাচতে অদৃশ্য হল।

রামধন বেশী জখম হন নি। একটু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কোনও রকমে বিছানা থেকে উঠলেন এবং ননীবালার মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করলেন।

ননীবালা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, গেছে?

—গেছে।

—ডাকাত?

—ডাকাত নয়।

—সাহিত্যিক গুণ্ডা?

—তাও নয়। বেতাল জান? নিরাশ্রয় প্রেত মরা মানুষের দেহে ভর করলে বেতাল হয়। শুনেছি, যদি পছন্দ মত লাশ না পায় তবে তারা গল্পের খাতায় ঢুকে গিয়ে নায়ক-নায়িকার ওপর ভর করে। এ তাদেরই কাজ।

—তোমার ওপর ওদের রাগ কেন?

—বোধ হয় সেকেলে প্রেতাত্মা, আমার প্লটের রসগ্রহণ করতে পারে নি।

—তুমি আর ছাই ভস্ম লিখো না বাপু।

—রাম বল, আবার লিখব! দেখছ না, আমার সমস্ত খাতা কুচি কুচি করে ছিঁড়েছে, দামী ফাউনটেন পেনটা চিবিয়ে নষ্ট করেছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে দিয়েছে। তোমার দিদিমার গুরুদেব বিষ্ণুপ্রয়াগে থাকেন না? তাঁর আশ্রমেই বাস করব ভাবছি। ভোরের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাই চল, তার পর দিন দুইয়ের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বিষ্ণুপ্রয়াগ রওনা হব।

১৩৫৮

ভরতের ঝুমঝুমি

হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গার ধারে যে ধর্মশালা আছে তারই সামনের বড় ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছি—আমি আমার মামাতো ভাই পুলিন, আর তার দশ বছরের ছেলে পল্টু। তা ছাড়া টহলরাম চাকর আর চারটে সাদা ইঁদুরও আছে। ইঁদুর আনতে আমাদের খুব আপত্তি ছিল, কিন্তু পল্টু বললে, বা রে, আমি সঙ্গে না নিলে এদের খাওয়াবে কে? বাড়ির ছটা বেরালেই তো এদের খেয়ে ফেলবে। যুক্তি অকাট্য, ইঁদুরের ভাড়াও লাগে না, সুতরাং সঙ্গে আনা হয়েছে। তারা রাত্রে একটা খাঁচার মতন বাক্সে বাস করে, দিনের বেলায় পল্টুর পকেটে বা মুঠোর মধ্যে থাকে, অথবা তার গায়ের ওপর চরে বেড়ায়।

সমস্ত সকাল টো টো করে বেড়িয়েছি, এখন বেলা এগারোটা, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। চা তৈরির সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে এনেছি, কিন্তু রান্নার কোনও যোগাড় নেই, তার হাঙ্গামা আমাদের পোষায় না। দোকান থেকে এক ঝুড়ি মোটা মোটা আটার লুচি, খানিকটা স্বচ্ছন্দ-বনজাত কচুঘেঁচুর ঘণ্ট, আর সের খানিক নুড়ির মতন শক্ত পেড়া আনানো হয়েছে? আমরা স্নান সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে কোলের ওপর শালপাতা বিছিয়েছি, টহলরাম পরি-বেশনের উপক্রম করছে, এমন সময় বাইরে থেকে ভাঙা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল—অয়মহং ভোঃ!

কথাটা কোথায় যেন আগে শুনেছি। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলুম, একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধ হয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া,

যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নিচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি বড় গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝুলি আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলী সাধুসজ্জা কিছুই নেই।

প্রশ্ন করলুম, ক্যা মাংতা বাবাজী? বাবাজী উত্তর দিলেন না, সোজা ঘরে ঢুকে আমার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। টহলরাম বাঙালীর সংসর্গে থেকে একটু নাস্তিক হয়ে পড়েছে, অচেনা সাধুবাবাদের ওপর তেমন ভক্তি নেই। রুখে উঠে বললে, আরো কৈসা বেহুদা আদমী তুম, উঠো খাটিয়াসে!

সাধুবাবা ভ্রুকুটি করে রাষ্ট্রভাষায় যে গালাগালি দিলেন তা অশ্রাব্য অবাচ্য অলেখ্য। পুলিন অত্যন্ত রেগে গিয়ে গলাধাক্কা দিতে গেল। আমি তাকে জোর করে থামিয়ে বললুম, কর কি, বাবাজীর সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক না।

প্রমোদ চাটুজ্যে মশাই বিস্তর সাধুসঙ্গ করেছেন। সাধুচরিত্র তাঁর ভাল রকম জানা আছে, যোগী অবধূত বামাচারী তান্ত্রিক অঘোরপন্থী প্রভৃতি হরেক রকম সাধক সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে এইটুকু বুঝেছি যে গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধপুরুষদের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি। তাঁদের কটুবাক্যের চোটে অনধিকারী বাজে ভক্তরা ভেগে পড়ে, শুধু নাছোড়বান্দা খাঁটি মুক্তিকামীরা রয়ে যায়। এই আগন্তুক সাধুবাবাটির মুখখিস্তির বহর দেখে মনে হল নিশ্চয় এঁর মধ্যে বস্তু আছে। সবিনয়ে বললুম, ক্যা মাংতে হুকুম কিজিয়ে বাবা।

বাবা বললেন, ভোজন মাংতা। আরে তোমরা তো দেখছি বাঙালী, বাংলাতেই বল না ছাই।

বাবাজীর মুখে আমাদের মাতৃভাষা শুনে খুশী হয়ে বললুম, এই পুরি তরকারি পেড়া আপনার চলবে কি ?

—খুব চলবে। কিন্তু ওইটুকুতে কি হবে। আমি আছি, তোমরা তিন জন আছ, আর তোমাদের ওই রাক্ষস চাকরটা আছে। আরও সের দুই আনাও।

টহলরামকে আবার বাজারে পাঠালুম। পুলিনের পেশা ওকালতি কিন্তু মক্কেল তেমন জোটে না, তাই বেচারা সুবিধে পেলেই যাকে তাকে সওয়াল করে শখ মিটিয়ে নেয়। বললে, আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ।

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি ? আমার ভাষা সংস্কৃত, তবে তোমরা তা বুঝবে না তাই বাংলা বলছি।

—আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, গিরি পুরি ভারতী অরণ্য না আর কিছু ?

—ওসব অর্বাচীন দলের মধ্যে আমি নেই। আমার আদি আশ্রম ব্রহ্মলোক, আমি একজন ব্রহ্মর্ষি।

—নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

—বাবা যখন নও তখন না পারবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে কি ? তোমরা তো পাষণ্ড নাস্তিক। আমি হচ্ছি মহামুনি দুর্বাসা।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর প্রণিপাত করে আমি বললুম, ধন্য আমরা! চেহারা যেমনটি শুনেছি তেমনটি দেখছি বটে, কিন্তু লোকে যে আপনাকে অত্যন্ত বদরাগী বলে তা তো মনে হচ্ছে না। এই তো আমাদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন হয়ে কথা বলছেন।

—বদরাগী কেন হব। তবে এককালে আমার তেজ খুব বেশী ছিল বটে। কিন্তু সেই বজ্জাত মাগীটা আমার দফা সেরেছে।

হাত জোড় করে বললুম, তপোধন, যদি গোপনীয় না হয় তবে

কৃপা করে এই অধমদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আপনি তো সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোক, এই ঘোর কলিযুগে আমাদের মতন পাপীদের কাছে এলেন কি করে?

—পিতা অত্রি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, বৎস, তুমি হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গাতীরবর্তী ধর্মশালায় যাও, সেখানে তোমার সংকটমোচন হবে।

—আপনার আবার সংকট কি প্রভু? আপনিই তো লোককে সংকটে ফেলেন।

—সব বলব, কিন্তু আগে ভোজন সমাপ্ত হক। তোমরাও খেয়ে নাও।

পুলিন বললে, আপনি স্নান করবেন না?

—সে তো কোন্ কালে সেরেছি, ব্রাহ্ম মুহূর্তেই গঙ্গায় একটি ডুব দিয়েছি।

—কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে। যদি অনুমতি দেন তো একটু ডিডিটি স্প্রে করে দিই। আমাদের সঙ্গেই আছে।

—খবরদার, ওসব করতে যেয়ো না। গুটিকতক অসহায় প্রাণী যদি আমার গাত্রে বস্ত্রে আর জটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তো থাকুক না। তুমি তাদের তাড়াবার কে?

টহলরাম খাবার নিয়ে এল। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে আমরা তাঁর সঙ্গেই খাটিয়ায় বসে ভোজন করলুম। ভোজনান্তে আমি সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, প্রভু, এ জিনিস চলবে কি? এর চেয়ে উঁচুদরের ধূমোৎপাদক বস্তু তো আমাদের নেই।

একটি সিগারেট তুলে নিয়ে দুর্বাসা বললেন, এতেই হবে। গঞ্জিকা আমার সয় না, বাতিক বৃদ্ধি হয়। কই, তোমরা ধূমপান করবে না?

লজ্জায় জিব কেটে বললুম, হেঁ হেঁ, আপনার সামনে কি তা পারি?

—ভণ্ডামি ক'রো না। আমার সামনে একরাশ লুচি গিলতে বাধল না, আর যত লজ্জা ধোঁয়ায়! নাও নাও, টানতে আরম্ভ কর।

অগত্যা পুলিন আর আমিও সিগারেট ধরালুম। শোনবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি দেখে দুর্বাসা তাঁর ইতিহাস আরম্ভ করলেন।

শকুন্তলার কথা জান তো? কালিদাস তার নাটকে লিখেছে। মেয়েটা আমার ডাকে সাড়া দেয় নি তাই হঠাৎ রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিলুম—তুমি যার কথা ভাবছ সে তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। শকুন্তলা এমনি বেহুঁশ যে আমার কোনও কথাই তার কানে গেল না। কিন্তু তার এক সখী শুনতে পেয়েছিল। সে আমার কাছে এসে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করলে। তার নাম অনসূয়া। আমার মায়েরও ওই নাম, তাই প্রসন্ন হয়ে অভিশাপ খুব হালকা করে দিলুম। কিন্তু সখীটা অতি কুটিলা, শকুন্তলার মা মেনকার কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাল।

এই ঘটনার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেল। তখন আমি শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গোত্তরীর নিকট বাস করছি। একদিন প্রাতঃকালে ভাগীরথীতীরে বসে আছি এমন সময় একজন শিষ্য এসে জানালে, একটি অপূর্ব রূপবতী নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। বিরক্ত হয়ে বললুম, আঃ জ্বালাতন করলে, এখানেও রূপবতী নারী! নির্জনে একটু পরমার্থচিন্তা করব তারও ব্যাঘাত। কে এসেছে পাঠিয়ে দাও এখানে।

দেখেই চিনলুম মেনকা অপ্সরা। ভব্যতার জ্ঞান নেই, দাঁতন

চিবুতে চিবুতে এসেছে, বোধ হয় ভেবেছে তাতে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠে বললুম, কিজন্য আসা হয়েছে এখানে? জান, আমি মহাতেজস্বী দুর্বাসা মুনি, বিশ্বামিত্রের মতন হ্যাংলা পাওনি যে লাস্য হাস্য ছলা কলা হাব ভাব ঠসক ঠমক দেখিয়ে আমাকে ভোলাবে।

মেনকা ভেংচি কেটে বললে, আ মরি মরি! জগতে তো আর কেউ নেই যে তোমাকে ভোলাতে আসব! তোমার ভালর জন্যই দেখা করতে এসেছি। তা যদি না চাও তো চললুম, কিন্তু এর পরে বিপদে পড়লে দোষ দিতে পাবে না। এই বলে মেনকা এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

মাগীর আস্পর্ধা কম নয়, আমাকে তুমি বলছে। শাপ দিতে যাচ্ছিলুম—তুই এক্ষুনি শুঁয়োপোকা হয়ে যা। কিন্তু ভাবলুম, উহু, ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। বললুম, কিজন্য এসেছ বলই না ছাই।

মেনকা বললে, মহাদেব যে তোমার ওপর রেগে আগুন হয়েছেন, শকুন্তলাকে তুমি বিনা দোষে শাপ দিয়েছিলে শুনে। আর একটু হলেই তোমাকে ভস্ম করে ফেলতেন, নেহাত আমি পায়ে ধরে বোঝালুম তাই এবারকার মতন তুমি বেঁচে গেছ।

আমি দেবতা মানুষ কাকেও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মহাদেবকে ডরাই। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বললে তুমি তাঁকে?

—বললুম, আহা নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে ফেলেছে। তা শকুন্তলা তো বেশী দিন কষ্ট পাবে না, আপনি দুর্বাসা মুনিকে এবারটি ক্ষমা করুন। মহাদেব আমাকে স্নেহ করেন, তাঁর শাশুড়ীর নাম আর আমার নাম একই কি না। বললেন, বেশ, ক্ষমা করব, কিন্তু আগে তুমি তাকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাও।

—কি প্রায়শ্চিত্ত করাবে শুনি?

—তোমার ভয় নেই ঠাকুর, খুব সোজা প্রায়শ্চিত্ত। শকুন্তলা এখন হেমকূট পর্বতে প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রমে আছে। আমি খবর পেয়েছি সম্প্রতি তার একটি খোকা হয়েছে। কশ্যপ বলেছেন, এই ছেলে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হবে এবং পৃথিবী শাসন করবে। মনে করেছিলুম গিয়ে একবার দেখে আসব, কিন্তু তা আর হল না। ইন্দ্র সব অপ্সরাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ব্যাটা জয়ন্ত বিগড়ে যাচ্ছে —হবে না কেন, বাপের ধাত পেয়েছে—তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিচ্ছেন। ছ মাস ধরে অষ্ট প্রহর নৃত্য গীত পান ভোজন চলবে। আজই আমাকে যেতে হবে। দেবতাদের যাট দিনে মানুষের যাট বৎসর। আমি যখন ফিরে আসব তখন শকুন্তলার ছেলে বুড়ো হয়ে যাবে। তাই তোমাকেই তার কাছে পাঠাতে চাই।

আমি ভাবলুম, এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি যদি শকুন্তলার কাছে গিয়ে তাকে আর তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসি তবে দেখতে শুনতে ভালই হবে। মেনকাকে বললুম, আমি যেতে রাজী আছি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা কি, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?

—একটি কাজের ভার নিয়ে তোমাকে যেতে হবে। এই ঝুমঝুমিটি খোকার হাতে দেবে আর আমার হয়ে তাকে একটু আদর করবে। কিন্তু তুমি বড় নোংরা, আগে ভাল করে হাত ধোবে, তার পর খোকার থুতনিতে ঠেকিয়ে আলগোছে একটি চুমু খাবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, সে আবার কি রকম?

—এই রকম আর কি। এই বলে মেনকা তার হাত আমার দাড়িতে ঠেকিয়ে মুখের কাছে এনে একটা শব্দ করলে,—চুঃ কি থুঃ বুঝতে পারলুম না। তার পর বললে, এই নাও ঝুমঝুমি। খবরদার হারিও না যেন, তা হলে মজা টের পাবে।

ঝুমঝুমিটা নিয়ে আমি বললুম, হারাব কেন, খুব সাবধানে রাখব। আহা, তুমি তোমার নাতিটিকে দেখতে পাবে না, বড় দুঃখের কথা।

দেখ মেনকা, তুমি তো চলে যাচ্ছ, যদি আমার কাছে কোন বর চাইবার থাকে তো এই বেলা বল।

—নাঃ, বর টর আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, নেই কেন? যদি চাও তো আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটি পুত্র দিতে পারি। যদি তিন-চারটি বা শ-খানিক চাও তাও দিতে পারি।

নাক সিটকে মেনকা উত্তর দিলে, হয়েছে আর কি! তুমি নিজেকে কি মনে কর, কার্তিক না কন্দর্প? তোমার সন্তান তো রূপে গুণে একেবারে বোকা পাঁঠা হবে।

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে আমি বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, না চাও তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি অপাত্রে দান করি না। বেশ, এখন তুমি বিদেয় হও, একটা শুভদিন দেখে আমি শকুন্তলার কাছে যাব।

পুলিন জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু, মেনকার বয়স কত?

দুর্বাসা বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। অপ্সরার আবার বয়স কি? জোৎস্না বিদ্যুৎ রামধনু—এসবের বয়স আছে নাকি? তার পর শোন। মেনকা চলে গেল। তিন দিন পরে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হল স্বর্গবেশ্যা, লৌকিকতার কোনও জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্যবোধ আছে। শুধু ঝুমঝুমি নিয়ে গেলে ভাল দেখাবে কেন, কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেই হবে। সেজন্য আশ্রমের নিকটস্থ বন থেকে একটি সুপুষ্ট ওল আর সেরখানিক বড় বড় তিন্তিড়ী সংগ্রহ করে ঝুলির ভেতর নিলুম।

পুলিন বললে, এক মাসের খোকা বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল খাবে?

আমি বললুম, তা আর না খাবে কেন। সেকালের ক্ষত্রিয় খোকারা পাথর হজম করত, বিলিতী গুঁড়ো দুধের তোয়াক্কা রাখত না।

দুর্বাসা বললেন, তোমরা অত্যন্ত মূর্খ। ওল আর তেঁতুল ছেলে কেন খাবে, আশ্রমবাসী তপস্বী আর তপস্বিনীরা সবাই খাবেন। তার পর শোনো। যথাকালে হেমকূটে পেঁাছে মরীচিপুত্র ভগবান কশ্যপ ও তৎপত্নী ভগবতী অদিতিকে বন্দনা করলুম, তার পর শকুন্তলার কাছে গেলুম। আমি যে শাপ দিয়েছিলুম তা বোধ হয় সে জানত না, আমাকে দেখে খুশীই হল। ওল আর তেঁতুল উপহার দিলুম, মেনকার কথামত ছেলেকে আদর করে আশীর্বাদও করলুম। বললুম, শকুন্তলা, তোমার এই শ্রীমান সর্বদমন-ভরত আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে। এর প্রজারা যে ভূখণ্ডে থাকবে তার নাম হবে ভারতবর্ষ,—বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ। তুমিও অচিরে পতির সহিত মিলিত হবে। তার পর ট্যাঁক থেকে ঝুমঝুমি বার করতে গিয়েই চক্ষুস্থির।

আমি বললুম, বলেন কি, ঝুমঝুমি পেলেন না?

—মোটেই না। আমার পরনের কাপড় উত্তরীয় কম্বল সব ঝাড়লুম, ঝুলি ঘটি মায় জটা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। শকুন্তলার মুখটি কাঁদোকাঁদো হল, আহা, তার মায়ের দেওয়া উপহারটি হারিয়ে গেল! মেনকা যতই নচ্ছার হক, নিজের মা তো বটে। আমি বললুম, দুঃখ ক'রো না শকুন্তলা, আরও ভাল ঝুমঝুমি এনে দেব।

দুজন বুড়ি তপস্বিনী শকুন্তলার কাছে ছিল। একজন বললে, পাগলের মতন যা তা ব'লো না ঠাকুর। ছেলের দিদিমার দেওয়া যৌতুক আর তোমার ছাইপাঁশ কি সমান? তুমি ভারী অলবড্যে মুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও, এখন রাজ্যের রুই-কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখ গে।

অন্য বুড়িটা বললে, কি বলছ গা দিদি! শুধু রুইকাতলা কেন,

মিরগেল চিতল বোয়াল কালবোস শোল শাল চাঁই চাঁই এসব মাছের পেটেও থাকতে পারে।

পুলিন বললে, কচ্ছপের পেটেও যেতে পারে।

আমি বললুম, হাঙর কুমির শুশুক সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তীর পেটে যেতেও বাধা নেই।

দুর্বাসা আমাদের দিকে একবার কটমট করে চাইলেন, তার পর বলে যেতে লাগলেন।—

আমি আর দাঁড়ালুম না, কথাটি না বলে পালিয়ে এলুম। যে পথে এসেছিলুম সেই পথের সর্বত্র খুঁজে দেখলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। আমি অত্যন্ত ভুলো লোক, কিন্তু ঝুমঝুমিটা তো ট্যাঁকেই গোঁজা ছিল। নিশ্চয় নাইবার সময় জলে পড়ে গেছে। যেখানে যেখানে স্নান করেছিলুম সর্বত্র জলে নেমে হাতড়ে দেখলুম, কিন্তু পাওয়া গেল না। তাহলে বোধ হয় রুই মাছেই গিলেছে, শকুন্তলার আংটির মতন। বোয়াল কালবোস চাঁই চাঁইও হতে পারে। জেলেদের ডেকে ডেকে বললুম, ওরে মাছের পেটে ঝুমঝুমি পেয়েছিস? বার করে দে, আশীর্বাদ করব। ব্যাটারা বললে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি থাকে না ঠাকুর, পটকা থাকে। এই বলে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আমি অভিশাপ দিলুম, তোরা দেঁতো কুমির হয়ে যা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

ওঃ, মেনকার কথা রাখতে গিয়ে কি সংকটেই পড়েছি! ঝুমঝুমি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা যে মহাপাপ। তার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, অসংখ্য বার অসংখ্য স্থানে খুঁজেছি, কিন্তু ঝুমঝুমি পাই নি। আমার আর শান্তি নেই, ব্রহ্মতেজ নেই, অভিশাপ দিলে ফলে না, আমি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি। শিষ্যরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি বললুম, মহামুনি, শান্ত হ'ন, আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন।

ভরত রাজা তো কবে স্বর্গলাভ করেছেন, তাঁর আর ঝুমঝুমির দরকার কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তপস্যা করুন, যোগ-সাধনা করুন, হরিনাম করুন। অথবা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জীবন-স্মৃতি লিখুন, জটাশ্মশ্রুধারী উগ্রতপা মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গ্ল্যামার গার্ল অপ্সরাদের মোলাকাত বিবৃত করুন, পত্রিকাওয়ালারা তা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। ঝুমঝুমির কথা একেবারে ভুলে যান।

—হায় হায়, ভোলবার জো কি! ওই ঝুমঝুমিই হচ্ছে মেনকার অভিশাপ, শকুন্তলার প্রতিশোধ। আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, যখন তখন ঝুমঝুম শব্দ শুনি।

দুর্বাসা হঠাৎ চিৎকার করে হাত পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের ছেলে পল্টু তাঁর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল—মেরে ফেললে রে, সব কটাকে মেরে ফেললে!

ব্যাপার গুরুতর। পল্টু নিবিষ্ট হয়ে ঝুমঝুমির ইতিহাস শুনছিল। সেই অবকাশে ইঁদুরগুলো তার পকেট থেকে বেরিয়ে দুর্বাসাকে আক্রমণ করেছে। দুটো তাঁর কাঁধে উঠেছে, একটা অধোবাসে ঢুকে গেছে, আর একটা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর নাচের ঝাঁকুনিতে তিনটে ইঁদুর নীচে পড়ে গেল। পল্টু কোনও রকমে সেগুলোকে দুর্বাসার পদাঘাত থেকে রক্ষা করলে।

দুর্বাসা বললেন, তুই অতি দুর্বিনীত বালক।

পুলিন বললে, টেক কেয়ার তপোধন, আমার ছেলেকে যদি শাপ দেন তো ভাল হবে না বলছি।

দুর্বাসা বললেন, ইঁদুর পোষা মহাপাপ, চণ্ডালেও পোষে না।

পল্টু রেগে গিয়ে বললে, বা, রে, আপনি যে নিজের গায়ে ছারপোকা পোষেন তা বুঝি খুব ভাল? দেখ না বাবা, ঋষি মশায়ের গা থেকে কত ছারপোকা আমাদের বিছানায় এসেছে। আর একটা ইঁদুর কোথা গেল? খুঁজে পাচ্ছি না যে—

দুর্বাসা আবার চিৎকার করে নাচতে লাগলেন। পল্টু বললে, ওই ওই, দাড়ির ভেতর একটা সেঁধিয়েছে!

অনুমতি না নিয়েই পল্টু দুর্বাসার দাড়িতে হস্তক্ষেপ করে তার ভেতর থেকে ইঁদুরটাকে টেনে বার করলে। তার পর বললে ঝুম-ঝুম শব্দ হচ্ছে কেন?

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, ঝুমঝুম শব্দ? বলিস কি-রে! প্রভু, আপনার দাড়িটি একবার নাড়ুন তো।

দুর্বাসা দাড়ি নাড়লেন। সেই নিবিড় শ্মশ্রুজাল ভেদ করে ক্ষীণ শব্দ নির্গত হল—ঝুম ঝুম ঝুম। যেন নৃত্যপরা মেনকার নূপুরনিক্কণ দূরদূরান্তর থেকে ভেসে আসছে।

পুলিন দাড়ির নীচের ঝুঁটিটা একবার টিপে দেখলে, তার পর গেরো খুলতে লাগল। দুর্বাসা বললেন, আরে লাগে লাগে! কে তাঁর কথা শোনে। আমি তাঁর মাথাটি জোর করে ধরে রইলুম, পুলিন পড়পড় করে দাড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে ঝুম ঝুমি বার করলো। সোনার কি রূপোর কি টিনের বোঝা গেল না, ময়লায় কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বাজছে ঠিক।

পল্টু চুপি চুপি বললে, এক্স-রে করলে কোন্ কালে বেরিয়ে পড়ত, নয় বাবা? পল্টুর অভিজ্ঞতা আছে, বছর দুই আগে সে একটা পয়সা গিলেছিল।

দুর্বাসা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, একেই বলে গেরোর ফের। ঝুমঝুমিটি যে যত্ন করে দাড়ির গেরোর মধ্যে গুঁজে রেখেছিলুন তা মনেই ছিল না। তার পর পল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বৎস, আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হবে।

আমি বললুম, ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই প্রভু, রাজা

টাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।

—বেশ, সেই আশীর্বাদ করছি। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজ-কার্য চলবে কি করে?

—আজকাল তা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে কর্তা না থাকলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দুর্বাসা বললেন, আমি এখন উঠি। যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে সত্বর দায়মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যেতে চাই।

—অর্পণ করবেন কাকে?

—কেন, মহারাজ ভরতের বংশধর নাই?

—কেউ নেই, ভরতবংশ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির-পরীক্ষিতের বংশ লোপ পেয়েছে। তাঁদের যাঁরা উত্তরাধিকারী—নন্দ মৌর্য শুঙ্গ অন্ধ্র গুপ্ত প্রভৃতি, তার পর পাঠান মোগল ইংরেজ, এঁরাও ফৌত হয়েছেন। ভরতের রাজ্য এখন দুভাগ হয়েছে, বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্থান।

—একজন চক্রবর্তী রাজা আছেন তো?

—এখন আর নেই, দুই রাজ্যে দুই রাষ্ট্রপতি বাহাল হয়েছেন, একজন দিল্লিতে আর একজন করাচিতে থাকেন। আইন অনুসারে এঁরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ঝুমঝুমিটি এঁদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আর একজন ইউ-এন-ও-তে নালিশ করবেন, না হয় ঘুষি বাগিয়ে বলবেন, লড়কে লেংগে ঝুমঝুম্মা।

দুর্বাসা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। তার পর মট্ করে ঝুমঝুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা, যাতে পাথর-কুচি আছে, নাড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।

টাকা নিয়ে দুর্বাসা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

১৩৫৮

রেবতীর পতীলাভ

বিষ্ণুপুরাণে রাজা রৈবত-ককুদ্মী ও তাঁর কন্যা রেবতীর একটি বিচিত্র আখ্যান আছে। সেই ছোট আখ্যানটি বিস্তারিত করে লিখছি। এই পবিত্র পুরাণকথা যে কন্যা শ্রদ্ধাসহকারে একাগ্র চিত্তে পাঠ করে তার অচিরে সর্বগুণান্বিত বাঞ্ছিত পতিলাভ হয়।

পুরাকালে কুশস্থলী নগরীতে রৈবত-ককুদ্মী নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তিনি রেবত রাজার পুত্র সেজন্য তাঁর এক নাম রৈবত, এবং ককুদযুক্ত বৃষ অর্থাৎ ঝুঁটিওয়ালা ষাঁড়ের তুল্য তেজস্বী সেজন্য অপর নাম ককুদ্মী। সেকালে মহত্ত্ব ও বীরত্বের নিদর্শন ছিল সিংহ ব্যাঘ্র ও বৃষ, সেজন্য কীর্তিমান লোকের উপাধি দেওয়া হত—পুরুষসিংহ, নরসার্দুল, ভরতর্ষভ, মুনিপুংগব, ইত্যাদি।

রৈবত রাজার রেবতী নামে একটি কন্যা ছিলেন, তিনি রূপে গুণে অতুলনা। রেবতী বড় হলে তাঁর বিবাহের জন্য রাজা পাত্রের খোঁজ নিতে লাগলেন। অনেক পাত্রের বিবরণ সংগ্রহ করে রৈবত একদিন তাঁর কন্যাকে বললেন, দেখ রেবতী, আর বিলম্ব করতে পারি না, তোমার বয়স ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি অত খুঁত ধরলে তোমার বরই জুটবে না। আমি বলি কি, তুমি কাশীরাজ তুন্দবর্ধনকে বিবাহ কর।

রেবতী ঠোঁট কুঁচকে বললেন, অত্যন্ত মোটা আর অনেক স্ত্রী। আমি সতিনের ঘর করতে পারব না।

রাজা বললেন, তবে গান্ধারপতি গণ্ডবিক্রমকে বিবাহ কর, তাঁর স্ত্রী বেশী নেই।

—গণ্ডমুর্খ আর অনেক বয়স।

—আচ্ছা, ত্রিগর্ত দেশের যুবরাজ কড়ম্বকে কেমন মনে হয়?

—কাঠির মতন রোগা।

—কোশলরাজকুমার অর্ভক ?

—সে তো নিতান্ত ছেলেমানুষ।

—তবে আর কথাটি নয়, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বরণ কর। অমন রূপবান ধনবান বলবান আর ধর্মপ্রাণ পাত্র সমগ্র জম্বুদ্বীপে নেই।

রেবতী বললেন, উনি তো দিনরাত হরি হরি করেন, ও রকম ভক্ত লোকের সঙ্গে আমার বনবে না।

রৈবত হতাশ হয়ে বললেন, তবে তুমি নিজেই একটা পছন্দ মতন স্বামী জুটিয়ে নাও। যদি চাও তো স্বয়ংবরের আয়োজন করতে পারি, যাকে মনে ধরবে তার গলায় মালা দিও।

—কার গলায় দেব ? সব সমান অপদার্থ।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। যথাবিধি পূজা গ্রহণ করে কুশলপ্রশ্নের পর নারদ বললেন, তোমরা পিতা-পুত্রীতে কিসের বাদানুবাদ করছিলে ?

রৈবত উত্তর দিলেন, আর বলবেন না দেবর্ষি। এখনকার মেয়েরা অত্যন্ত অবুঝ হয়েছে, কিছুতেই বর মনে ধরে না। আমি অনেক চেষ্টায় পাঁচটি ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। স্বয়ংবরা হতেও চায় না, বলছে সব অপদার্থ। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

নারদ বললেন, রেবতী নিতান্ত অন্যায় কথা বলে নি, আজকাল রূপে গুণে উত্তম পাত্র পাওয়া দুরূহ। চেহারা দেখে আর খবর নিয়ে স্বভাব-চরিত্র জানা যায় না। এক কাজ কর, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ধর, তিনিই রেবতীর বর স্থির করে দেবেন।

রাজা বললেন, ব্রহ্মার নির্বাচিত বরও হয়তো রেবতীর মনে ধরবে না।

নারদ বললেন, না ধরবে কেন। আমাদের পিতামহ বিরিঞ্চি সর্বজ্ঞ, তাঁর নির্বাচনে ভুল হবে না। আর, তোমার কন্যারও তো কোনও বিশেষ পুরুষের উপর টান নেই। আছে নাকি রেবতী ?

রেবতী ঘাড় নেড়ে জানালেন যে নেই।

নারদ বললেন, তবে আর কি, অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে যাত্রা কর। আমি এখন কুবেরের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে বলব তোমাদের যাতায়াতের জন্য পুষ্পক রথটা পাঠিয়ে দেবেন।

রাজা করজোড়ে বললেন, দেবর্ষি, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন, নইলে ভরসা পাব না।

নারদ বললেন, বেশ, আমি শীঘ্রই কুবেরপুরী থেকে রথ নিয়ে এখানে আসব, তার পর একসঙ্গে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যাবে।

নারদ ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে রৈবত-ককুদ্মী ও রেবতী পুষ্পক বিমানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করলেন। তখন হিমালয় এখনকার মতন উঁচু হয় নি, মাথায় সর্বদা বরফ জমে থাকত না। হিমালয়ের উত্তর দিকে সমুদ্রতুল্য বিশাল একটি হ্রদ ছিল। তাঁরা হিমালয় হেমকূট নিষধ প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হৈমবত হরি ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ অর্থাৎ বড় বড় দেশ অতিক্রম করে দুর্গম ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হলেন। সেই অলৌকিক সভার বিবরণ দেবার চেষ্টা করব না, মহাভারতে আছে যে তা অবর্ণনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়।

নারদের সঙ্গে রৈবত আর রেবতী যখন ব্রহ্মসভায় প্রবেশ করলেন তখন সেখানে গীত বাদ্য নৃত্য চলছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা একটি উচ্চ বেদীতে রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করছেন, তাঁর বামে ব্রাহ্মণী এবং চারি পাশে দক্ষ প্রচেতা সনৎকুমার অসিতদেবল প্রভৃতি মহাত্মা এবং আদিত্য রুদ্র বসু প্রভৃতি গণদেবতা বসে আছেন। দুই বিখ্যাত গন্ধর্ব কালোয়াত হাহা হূহূ অতিতান-রাগে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে গান গাইছেন, অন্য দুই গন্ধর্ব তুম্বুরু ও ডুম্বুরু দুন্দুভি অর্থাৎ দামামা বাজাচ্ছেন। তখন মৃদঙ্গ আর বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি হয় নি। দশজন

বিদ্যাধর দশটি প্রকাণ্ড বীণায় ঝংকার দিচ্ছেন এবং উর্বশী রম্ভা মেনকা ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরার দল ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছেন। একজন মহাকায় দানব একটি অজগরতুল্য রামশিঙা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে তাতে ফুঁ দিয়ে প্রচণ্ড নিনাদে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করছে। সভাস্থ সকলে তন্ময় হয়ে সংগীত-রস পান করছেন এবং ভাবের আবেশে মাথা দোলাচ্ছেন।

ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রণাম করে নারদ নিঃশব্দে সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বসলেন। একজন বেত্রধারিণী প্রতিহারী যক্ষী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রৈবত ও রেবতীর কাছে এল এবং ইঙ্গিত করে ডেকে নিয়ে তাঁদের সুখাসনে বসিয়ে দিলে।

একটু পরেই আব্রহ্ম-দেব-গন্ধর্ব-মানব প্রভৃতি সভাস্থ সকলে সবেগে মাথা আর হাত নেড়ে বলে উঠলেন—হা-হা-হাঃ। সাধু সাধু, অতি উত্তম! নৃত্যগীতবাদ্য নিবৃত্ত হল। ব্রহ্মা তখন রৈবত ও রেবতীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিকটে আসবার জন্য সংকেত করলেন।

পিতা-পুত্রী সষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ব্রহ্মা বললেন, রাজা, তোমার কন্যাটি তো দেখছি পরমা সুন্দরী, বড়ও হয়েছে, এর বিবাহ দাও নি কেন?

রৈবত বললেন, ভগবান, কন্যার বিবাহের জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমি অনেক ভাল ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু রেবতী কাকেও পছন্দ করছে না। কাশীরাজ তুন্দবর্ধন, গান্ধারপতি গণ্ডবিক্রম, ত্রিগর্তযুবরাজ কড়ম্ব, কোশলরাজকুমার অর্ভক, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ—

ব্রহ্মা স্মিতমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।

রৈবত বললেন, আপনিও কি এঁদের সুপাত্র মনে করেন না?

ব্রহ্মা বললেন, ওরা কেউ এখন জীবিত নেই, ওদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদিও গত হয়েছে।

—বলেন কি পিতামহ!

—হাঁ, সব পঞ্চত্ব পেয়েছে। তোমারও আত্মীয়-স্বজন কেউ জীবিত নেই।

মস্তকে করাঘাত করে রৈবত বললেন, হা হতোস্মি! ভগবান, আমার রাজ্যের আর সকলে কেমন আছে? মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত রেখে আপনার চরণদর্শনে এসেছি, এর মধ্যে অকস্মাৎ কোন্ দুর্বিপাকে আমার আত্মীয়বর্গ বিনষ্ট হল? আমার কোন্ পাপের এই পরিণাম?

ব্রহ্মা বললেন, মহারাজ, শান্ত হও। অকস্মাৎ বা তোমার পাপের ফলে কিছুই হয় নি, যথাবিধি কালবশে ঘটেছে। তোমার মন্ত্রী মিত্র ভৃত্য কলত্র বন্ধু প্রজা সৈন্য ধন কিছুই অবশিষ্ট নেই, কেবল তুমি আর তোমার কন্যা আছ।

আকুল হয়ে রৈবত বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না প্রভু। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, স্বপ্ন নয় সবই সত্য। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। জান তো, আমার এক অহোরাত্র হচ্ছে মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর। আচ্ছা, তুমি এই সভায় কতক্ষণ এসেছ?

রৈবত একটু ভেবে বললেন, বেশীক্ষণ নয়, সওয়া দণ্ড হবে।

ব্রহ্মা বললেন, গণনা করে বল তো, আমার এই ব্রহ্মসভার সওয়া দণ্ডে নরলোকের কত বৎসর হয়?

মাথা চুলকে রৈবত বললেন, ভগবান, আমি গণিতশাস্ত্রে চির-কালই কাঁচা। দেবর্ষি নারদ যদি কৃপা করে অঙ্কটি কষে দেন—

নারদ বললেন, হরে মুরারে! অঙ্ক টঙ্ক আমার আসে না, ও হল নীচ গ্রহবিপ্রের কাজ। রেবতী, তুমি তো শুনেছি খুব বিদুষী, নানা বিদ্যা জান, বল না কত হয়।

রেবতী বললেন, পিতামহ ব্রহ্মার এক অহোরাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় যদি মানুষের ৮৬৪ কোটি বৎসর হয়, তবে সওয়া দণ্ডে অর্থাৎ

আধ ঘণ্টায় কত বৎসর হবে—এই তো? তা হল গিয়ে ১৮ কোটি বৎসর। ভগবান, ভুল হয় নি তো?

ব্রহ্মা বললেন, না না, ঠিক হয়েছে। মহারাজ, বুঝতে পারলে? তুমি যতক্ষণ এখানে সংগীত শুনছিলে ততক্ষণে নরলোকে আঠারো কোটি বৎসর কেটে গেছে। তোমরা সত্যযুগের গোড়ায় এসেছিলে তার পর বহু চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন যে চতুর্যুগ চলছে তারও সত্য ত্রেতা গত হয়েছে, দ্বাপরও গতপ্রায়, কলিযুগ আসন্ন।

শোকে অবসন্ন হয়ে রৈবত বললেন, ভগবান, আমার গতি কি হবে?

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, কি আবার হবে, তোমার ভাববার কিছু নেই। এখন ফিরে গিয়ে কন্যার বিবাহ দাও, তাহলেই তুমি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। অমরাবতী তুল্য তোমার যে রাজধানী ছিল —কুশস্থলী, তার নাম এখন দ্বারকাপুরী হয়েছে, তা যাদবগণের অধিকারে আছে। পরমেশ্বর বিষ্ণু সম্প্রতি নরলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাদববংশে জন্মগ্রহণ করে স্বকীয় অংশে বলদেবরূপে নরলীলা করছেন। সেই মায়ামানব বলদেবকে তোমার কন্যা দান কর। তিনি আর রেবতী সর্বাংশে পরস্পরের যোগ্য।

রৈবত বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য, বলদেবকেই কন্যাদান করব। কিন্তু আমার গতি কি হবে প্রভু?

—আবার বলে গতি কি হবে! বৃদ্ধ হয়েছ, একমাত্র সন্তান রেবতীকে সৎপাত্রে দিচ্ছ, আর তোমার বেঁচে থেকে লাভ কি, রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? তোমার রাজ্য তো রেবতীরই শ্বশুরবংশের অধিকারে আছে। মেয়ের বিবাহ দিয়ে তুমি সোজা ব্রহ্মলোকে ফিরে এস এবং সশরীরে আমার কাছে সুখে বাস কর। এর চাইতে আর কি সদ্‌গতি চাও?

রৈবত বললেন, তাই হবে প্রভু। কিন্তু দেবর্ষি নারদও আমার সঙ্গে মর্তলোকে চলুন, আমি বড় অসহায় বোধ করছি।

নারদ বললেন, বেশ তো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। কোনও চিন্তা করো না, রেবতীর বিবাহব্যাপারে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করব।

ফেরবার সময় রৈবত ও রেবতী আকাশ থেকে দেখলেন, হিমালয়ের উত্তরে যেখানে নিম্নভূমি ছিল সেখানে অত্যুচ্চ মালভূমির উদ্ভব হয়েছে। যে জলরাশি ছিল তা শুকিয়ে বালুকাময় মরুভূমি হয়ে গেছে। হিমালয় আর ঢিপির মতন নেই, সুবিশাল অধিত্যকা আর উপত্যকায় তরঙ্গায়িত হয়েছে, শতশত চূড়া আকাশে উঠেছে, তার উপর দিক তুষারে আচ্ছন্ন, সেই তুষার সূর্যতাপে দ্রবীভূত হয়ে অসংখ্য নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। গাছপালাও আর আগের মতন নেই, জন্তুদের আকৃতিও বদলে গেছে। নারদ বুঝিয়ে দিলেন যে বিগত আঠারো কোটি বৎসরে ধীরে ধীরে এইসব প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে।

পুষ্পক রথ যখন রৈবত-ককুদ্মীর ভূতপূর্ব রাজ্যের নিকটে এল তখন নারদ বললেন, মহারাজ, লোকালয়ে নেমে কাজ নেই, লোকে তোমাদের রাক্ষস মনে করে গোলযোগ বাধাতে পারে।

রৈবত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, রাক্ষস মনে করবে কেন? কালক্রমে মানুষের বুদ্ধিও কি লোপ পেয়েছে?

নারদ বললেন, আমাকে দেখে কিছু বলবে না, কারণ আমার অণিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য আছে, ইচ্ছামত লম্বা কিংবা বেঁটে হয়ে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি। কিন্তু তোমাদের তো সে শক্তি নেই।

—কিছুই বুঝতে পারছি না দেবর্ষি। আবার কি নূতন সংকট উপস্থিত হল?

—নূতন কিছু হয় নি, সবই যুগপরিবর্তনের ফল। তোমরা সত্য-

যুগের গোড়ায় জন্মেছে, যুগলক্ষণ অনুসারে তুমি লম্বায় একুশ হাত। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে একটু খাটো হয়, তাই রেবতী উনিশ হাত লম্বা। কিন্তু ও এখনও ছেলেমানুষ, পরে আরও আধ হাত বাড়বে।

—আপনি কি যা-তা বলছেন! আমার এই রাজদণ্ডটি ঠিক এক হাত। এই দিয়ে আমাকে মেপে দেখুন না, আমি লম্বায় বড় জোর চার হাত হব।

—তোমার হাতের মাপে তাই হতে পার বটে, কিন্তু সে মাপ ধরছি না। কলিযুগে মানুষের হাতের যে মাপ, সকল শাস্ত্রে তাই প্রামাণিক গণ্য হয়। সেই কলিযুগীয় মাপে তুমি একুশ হাত আর রেবতী উনিশ হাত লম্বা।

—তা হলেই বা ক্ষতি কি?

—সত্যযুগে মানুষ যেমন একুশ হাত লম্বা, তেমনি ত্রেতায় চোদ্দ হাত, দ্বাপরে সাত হাত, কলিতে সাড়ে তিন হাত। এখন নরলোকে দ্বাপরের অন্তিম দশা, কলিযুগ আসন্ন, সেজন্য মানুষ খাটো হতে হতে চার হাতে দাঁড়িয়েছে, বড় জোর সওয়া চার হাত। এখানকার বেঁটে লোকরা যদি সহসা তোমাদের দেখে তবে রাক্ষস মনে করে ইট পাথর ছুড়বে। বিবাহের পূর্বে এরকম গোলযোগ হওয়া কি ভাল?

—আমাদের কি কর্তব্য আপনিই বলুন।

নারদ বললেন, নীচে ওই পাহাড়টি চিনতে পারছ?

রৈবত বললেন, হাঁ হাঁ খুব পারছি, ও তো আমারই প্রমোদ-গিরি, ওর উপরে নীচে অনেক উপবন আছে, রেবতী ওখানে বেড়াতে ভালবাসে।

—রাজা, তুমি কীর্তিমান। আঠারো কোটি বৎসর অতীত হয়েছে তথাপি লোকে তোমাকে ভোলে নি, তোমার নাম অনুসারে ওই পর্বতের নাম দিয়েছে রৈবতক। ওখানেই রথ নামানো হক। রেবতীর বিবাহ পর্যন্ত তুমি ওখানে গোপনে বাস কর।

একটু উত্তেজিত হয়ে রৈবত বললেন, লুকিয়ে থাকব কার ভয়ে? এ তো আমারই রাজ্য। আর, আপনিই তো বলেছেন এখানকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। আমি একাই সকলকে যমালয়ে পাঠিয়ে নিজ রাজ্য অধিকার করব।

নারদ বললেন, মহারাজ রৈবত-ককুদ্মী, তুমি সার্থকনামা, একগুঁয়ে ষাঁড়ের মতন কথা বলছ, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। সকলকে মেরে ফেললে কাকে নিয়ে রাজত্ব করবে? তোমার ভাবী জামাতার বংশ ধ্বংস হলে রেবতীর বিবাহ কি করে হবে? ওসব কুবুদ্ধি ত্যাগ কর।

রৈবত বললেন, আমার মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেছে। আপনি যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।

ইন্দ্রের দিব্য বিমানের একজন সারথি আছে—মাতলি। কুবেরের পুষ্পক রথ আরও উঁচু দরের, সারথির দরকার হয় না। রথটি সচেতন ও জ্ঞানবান, কথা বুঝতে পারে, বলতেও পারে। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

নারদ বললেন, বৎস পুষ্পক, তুমি যথাসম্ভব নিম্নমার্গে ওই রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে উড়তে থাক। পুষ্পক 'যে-আজ্ঞে' বলে মণ্ডলাকারে চলতে লাগল। তিন বার প্রদক্ষিণের পর নারদ বললেন, আমার সব দেখা হয়েছে, এইবারে অবতরণ কর। পুষ্পক রথ ভূমিস্পর্শ করে স্থির হল।

সকলে নামলে নারদ বললেন, পর্বতের এই পশ্চিম দিকটি বেশ নির্জন, বাসের উপযুক্ত গুহাও আছে। তোমরা এখন এখানেই থাক। আমি বরের পিতা বসুদেবের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মার ইচ্ছা জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করব। তোমরা স্নানাদি সেরে নিয়ে আহার ও বিশ্রাম কর। পিতামহী ব্রহ্মাণী

প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন, শয্যাও রথে আছে, সেসব নামিয়ে নাও। আমি রথ নিয়ে যাচ্ছি, শীঘ্রই ফিরে আসব।

নারদ চলে গেলেন। স্নান ও আহারের পর রেবতী একটি গুহায় বিছানা পেতে বললেন, পিতা, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু বেড়িয়ে আসছি। রৈবত বললেন, তা বেড়াও গে, কিন্তু ফিরতে বেশী দেরি ক'রো না যেন।

রৈবতকের পাদবর্তী উপবনে বেড়াতে বেড়াতে রেবতী নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবতে লাগলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শুধু পিতা আছেন, বিবাহের পর তিনিও ব্রহ্মলোকে চলে যাবেন। যিনি রেবতীর একমাত্র ভাবী অবলম্বন, সেই বলদেব কেমন লোক? ব্রহ্মা যাঁকে নির্বাচন করেছেন তিনি কুপাত্র হতে পারেন না—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কিন্তু নারদ যা বলেছেন সে যে বড় ভয়ানক কথা। রেবতী উনিশ হাত লম্বা, পরে আরও একটু বাড়বেন। কিন্তু তাঁর ভাবী স্বামী বলদেব যুগধর্ম অনুসারে নিশ্চয় খুব বেঁটে, বড় জোর সওয়া চার হাত, অর্থাৎ মানুষের তুলনায় যেমন বেরাল। এমন বিসদৃশ বেমানান বেয়াড়া দম্পতির কথা রেবতী কস্মিন্ কালে শোনেন নি। মাকড়সা-জাতির মধ্যে দেখা যায় বটে—স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু তার পরিণাম বড়ই করুণ, মিলনের পরেই স্ত্রী-মাকড়সা তার ক্ষুদ্র পতিটিকে ভক্ষণ করে ফেলে। ছি ছি, রেবতীর কপালে কি এই আছে? বরকন্যার এই বিশ্রী বৈষম্যের কথা কি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মা আর নারদের খেয়াল হয় নি? দেবতা আর দেবর্ষি হলে কি হবে, দুজনেরই ভীমরতি ধরেছে।

রেবতী একটি বকুল গাছে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলেন। দুঃখে তাঁর কান্না এল। হঠাৎ পিছন দিকে মৃদু মর্মর শব্দ শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার নূতন মেঘের ন্যায় তার কান্তি, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা গোছা গোছা কালো চুল সরু ফিতের মতন সোনার

পটি দিয়ে ঘেরা, তার এক পাশে একটি ময়ূরের পালক বাঁকা করে গোঁজা। পরনে বাসন্তী রঙের ধুতি, গায়েও সেই রঙের উত্তরীও, গলায় আজানুলম্বিত বনমালা। অতি সুশ্রী সুঠাম কিশোর বিগ্রহ। রেবতী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি, মানুষ না পুতুল?

সহাস্যে নমস্কার করে সেই অদ্ভুত মূর্তিটি উত্তর দিলে, আমি আপনার আজ্ঞাবহ কিংকর।

—তোমার নাম কি, পরিচয় কি? কিজন্য এখানে এসেছ?

—আমার নাম কৃষ্ণ, আমি বসুদেবের পুত্র, বলদেবের অনুজ। আপনি আমার ভাবী জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া, পূজনীয়া বধূঠাকুরাণী, তাই প্রণাম করতে এসেছি।

অবজ্ঞা ও কৌতুক মিশ্রিত স্বরে রেবতী বললেন, আমাকে দেখে ভয় করছে না? শুনেছি তোমার দাদা নাকি একটি অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছেন। তুমি অবতার নাকি?

কৃষ্ণ বললেন, আমি অত ভাগ্যবান নই, দশ অবতারের তালিকায় আমার নাম ওঠে নি। এখন আমার বার্তা শুনুন। দেবর্ষি নারদ আমার পিতার কাছে গিয়ে আপনার সঙ্গে বলদেবের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। পিতা পরমানন্দে সম্মত হয়েছেন। কালই বিবাহ। আমার অগ্রজ এখনই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, সেই সুসংবাদ দেবার জন্য আমি তাঁর অগ্রদূত হয়ে এসেছি।

রেবতী প্রশ্ন করলেন, সম্পর্কে তুমি আমার কে হবে? শ্যালক?

কলহাস্য করে কৃষ্ণ বললেন, আপনি দেখছি নিতান্ত সেকেলে, কাকে কি বলতে হয় তাও জানেন না। পত্নীর ভ্রাতাই শ্যালক, পতির ভ্রাতাকে তা বলতে নেই। আমি আপনার দেবর। এই যে, দাদা এসে গেছেন।

রেবতী দেখলেন, তাঁর ভাবী স্বামী কৃষ্ণের চাইতে ঈষৎ লম্বা আর মোটা, রজতগিরিতুল্য শুভ্র কান্তি, চন্দনচর্চিত প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, নীল চোখ, সিংহকেশরের মতন কটা রঙের চুল মুক্তামালা দিয়ে

ঘেরা, তার এক পাশে একটি সারসের পালক গোঁজা। পরনে নীল ধুতি, গায়ে নীল উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা। কাঁধে বাঁশের লাঠি, তার উপর দিকে একটি সুমার্জিত লাঙ্গলের ফলা লাগানো, অস্তগামী সূর্যের কিরণে তা ঝকমক করছে।

দীর্ঘাঙ্গী রেবতী উনিশ হাত উঁচু থেকে তার ভাবী স্বামীকে যুগপৎ সতৃষ্ণ ও বিতৃষ্ণ নয়নে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করলেন। হা বিধাতা, এই একরত্তি পুরুষ তাঁর বর! এত সুন্দর কিন্তু এত ক্ষুদ্র! রেবতী কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলেন এবং শিষ্টাচার স্মরণ করে যুক্ত করে নমস্কার জানালেন।

বলদেব স্মিতমুখে বললেন, ভদ্রে, আমাকে মনে ধরে?

রেবতী উত্তর দিলেন, শুনেছি আপনি একজন অবতার, নারায়ণের অংশে জন্মেছেন। আমার মতন সামান্য নারী কি আপনার যোগ্য?

বলদেব বললেন, অর্থাৎ আমিই তোমার যোগ্য নই। তুমি অতিকায় মহামানবী, আমি ক্ষুদ্রদেহ মাণবক। তুমি উচ্চ তালতরু, আমি তুচ্ছ এরণ্ড। তুমি তেতলা সমান উঁচু, আর আমি একটা উইঢিপি। রেবতী, তুমি ভাবছ আমি তোমার নাগাল পাব কি করে। দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, আমি এখনই তোমার যোগ্য হব।

এই বলে বলদেব একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন এবং কাঁধ থেকে লাঙ্গলটি নামিয়ে তার দণ্ড ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটি লম্বা হতে লাগল। একটু পরে কৃষ্ণ বললেন, ওই হয়েছে, আর ঘুরিও না দাদা। তখন বলদেব লাঙ্গলের ফলা রেবতীর কাঁধে আটকে বললেন, সুন্দরী, অপরাধ নিও না, এই লাঙ্গল আমার বাহুর প্রতিনিধি হয়ে তোমার কম্বুগ্রীবা আলিঙ্গন করছে।

রেবতী মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল হয়ে রইলেন। বলদেব ধীরে ধীরে লাঙ্গলদণ্ড আকর্ষণ করলেন। সলতে টেনে নিলে প্রদীপের শিখা যেমন ক্রমশ ছোট হতে থাকে, রেবতীও সেইরকম ছোট হতে

লাগলেন। কৃষ্ণ সতর্ক হয়ে দেখছিলেন। বলে উঠলেন, থাম থাম, আর নয়—এঃ দাদা, তুমি বড্ড বেশী টেনে ফেলেছ!

বলদেব লাঙ্গল নামিয়ে নিলেন। তার পর নিজের হাত দিয়ে রেবতীকে মেপে বললেন, তাই তো, করেছি কি, রেবতী তিন হাত হয়ে গেছে! আচ্ছা, এখনই ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি রেবতীকে তুলে ধরে বললেন, প্রিয়ে, আমার অপটুতা মার্জনা কর। তুমি এই বকুলশাখা অবলম্বন করে ক্ষণকাল ঝুলতে থাক।

রেবতীর তখন ভাববার শক্তি নেই। তিনি দু হাতে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে লাগলেন, বলদেব তাঁর দুই পা ধরে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, আর একটু—আর একটু—এই-বারে থাম, ঠিক হয়েছে।

রেবতীকে নামিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে বলদেব সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ, বর বড় না কনে বড়?

কৃষ্ণ বললেন, লম্বায় কনে সাত আঙুল ছোট, কিন্তু মর্যাদায় তোমার চাইতে ঢের বড়, কারণ ইনি আঠারো কোটি বৎসর আগে জন্মেছেন। চমৎকার মানিয়েছে। এই বলে কৃষ্ণ দুজনকে প্রণাম করলেন।

নিকটে একটি ছোট জলাশয় ছিল। রেবতীকে তার ধারে এনে যুগল মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলদেব বললেন, রেবতী, দেখ তো, এইবারে আমি তোমার যোগ্য হয়েছি কিনা। এখন মনে ধরেছে কি?

রেবতী বললেন, মনে না ধরলেই বা উপায় কি। অবতার না আরও কিছু! দুই ভাই দুটি ডাকাত। তোমাদের মতলব আগে টের পেলে আমিই দুজনকে টেনে লম্বা করে দিতুম।

তার পর মহা সমারোহে রেবতী-বলদেবের বিবাহ হয়ে গেল। রৈবত-ককুদ্মী বরকন্যাকে আশীর্বাদ করে নারদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করলেন।

১৩৫৮

লক্ষ্মীর বাহন

সাত বৎসর পরে মুচুকুন্দ রায় আলিপুর জেল থেকে খালাস পেলেন। তাঁকে নিতে এলেন শুধু তাঁর শালা তারাপদবাবু; দুই ছেলের কেউ আসে নি। মুচুকুন্দ যদি বিপ্লবী বা কংগ্রেসী আসামী হতেন তবে ফটকের সামনে আজ অভিনন্দনকারীর ভিড় লেগে যেত, ফুলের মালা চন্দনের ফোঁটা জয়ধ্বনি---কিছুরই অভাব হত না। যদি তিনি জেলে যাবার আগে প্রচুর টাকা সরিয়ে রাখতে পারতেন, উকিল ব্যারিস্টার যদি তাঁকে চুষে না ফেলত, তা হলে অন্তত আত্মীয় বন্ধুরা অনেকে আসতেন। কিন্তু নিঃস্ব অরাজনীতিক জেল-ফেরত লোককে কেউ দেখতে চায় না। ভালই হল, মুচুকুন্দ-বাবু মুখ দেখাবার লজ্জা থেকে বেঁচে গেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ি গেলেন না; কারণ বাড়িই নেই, বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি তাঁর শালার সঙ্গে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চড়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে এলেন; সেখানে তাঁর স্ত্রী মাতঙ্গী দেবী অপেক্ষা করছিলেন। তার পর দুপুরের ট্রেনে তাঁরা কাশী রওনা হলেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সেখানেই বাস করবেন; মাতঙ্গী দেবীর হাতে যে টাকা আছে, তাতেই কোনও রকমে চলে যাবে।

মুচুকুন্দবাবুর এই পরিণাম কেন হল? এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মুচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধ হয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এঁদের একটি অলিখিত ধর্মশাস্ত্র আছে; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট

মিউনিসিপ্যালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদিই বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয় তবে ধর্মকর্ম আর লোক-হিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু। মুচুকুন্দর দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি, দৈব তাঁর পিছনে লেগেছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত মুচুকুন্দবাবু আজকাল কি করছেন তা জানবার আগ্রহ কারও থাকতে পারে না। কিন্তু এককালে তাঁর খুঁটিনাটি সমস্ত খবরের জন্য লোকে উৎসুক হয়ে থাকত, তাঁর নাম-ডাকের সীমা ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মুচুকুন্দ, ভারতজ্যোতি বঙ্গচন্দ্র কলিকাতাভূষণ মুচুকুন্দ—এইসব কথা ভক্তদের মুখে শোনা যেত। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা বলতেন, ধন্য শ্রীমুচুকুন্দ, যাঁর কীর্তিতে কুল পবিত্র হয়েছে, জননী কৃতার্থা হয়েছেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়েছেন। বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, বাহাদুর বটে মুচুকুন্দ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ আর গভর্নমেণ্ট সর্বত্র ওঁর খাতির ; ভদ্রলোক বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, উনি একাই সমস্ত মারোয়াড়ী গুজরাটী পারসী আর পঞ্জাবীর কান কাটতে পারেন, লাট মন্ত্রী পুলিস—সবাই ওঁর মুঠোর মধ্যে। বকাটে ছেলেরা বলত, মুচুর মতন মানুষ হয় না মাইরি, চাইবামাত্র আমাদের সর্বজনীনের জন্য পাঁচ শ টাকা ঝড়াক্‌সে ঝেড়ে দিলে। সেই আট-দশ বৎসর আগেকার খ্যাতনামা উদ্‌যোগী পুরুষসিংহের কথা এখন বলছি।

মুচুকুন্দ রায়ের প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড মোটর, প্রকাণ্ড পত্নী। তিনি নিজে একটু বেঁটে আর পেট-মোটা, কিন্তু তাঁর জন্য তাঁর আত্ম-সম্মানের হানি হয় নি ; বন্ধুরা বলতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে

নেপোলিয়নের খুব মিল আছে। ইংরেজ জার্মান মার্কিন প্রভৃতির খ্যাতি শোনা যায় যে তারা সব কাজ নিয়ম অনুসারে করে; কিন্তু মুচুকুন্দ তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। সদ্য অয়েল করা দামী ঘড়ির মতন সুনিয়ন্ত্রিত মসৃণ গতিতে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পরিহাস করে বলেন, তাঁর কাছে দাঁড়ালে টিকটিক শব্দ শোনা যায়। আরও আশ্চর্য এই যে, ইহকাল আর পরকাল দু দিকেই তাঁর সমান নজর আছে, তবে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে মাথা ঘামান না, তাঁর পত্নীর আজ্ঞাই পালন করেন।

প্রত্যহ ভোর পাঁচটার সময় মুচুকুন্দর ঘুম ভাঙে, সেই সময় একজন মাইনে করা বৈরাগী রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁকে পাঁচ মিনিট হরিনাম শোনায়। তার পর প্রাতঃকৃত্য সারা হলে একজন ডাক্তার তাঁর নাড়ীর গতি আর ব্লাডপ্রেশার দেখে বলে দেন আজ সমস্ত দিনে তিনি কতখানি ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন প্রভৃতি উদরস্থ করবেন এবং কতটা পরিশ্রম করবেন। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত পুরুত ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করেন, মুচুকুন্দ কাগজ পড়তে পড়তে চা খেতে খেতে তা শোনেন। তার পর নানা লোক এসে তাঁর নানা রকম ছোটোখাটো বেনামী কারবারের রিপোর্ট দেয়। যেমন—রিক্‌শ, ট্যাক্সি, লরি, হোটেল, দেশী মদের এবং আফিম গাঁজা ভাং চরসের দোকান ইত্যাদি। বেলা নটার সময় একজন মেদিনীপুরী নাপিত তাঁকে কামিয়ে দেয়, তার পর দুজন বেনারসী হাজাম তাঁকে তেল মাখিয়ে আপাদমস্তক চটকে দেয়, যাকে বলে দলাই-মলাই বা মাসাঝ। দশটার সময় একজন ছোকরা ডাক্তার তাঁর প্রস্রাব পরীক্ষা করে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেয়। তার পর মুচুকুন্দ চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করে বিশ্রাম করেন এবং ঠিক পৌনে বারোটায় প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে তাঁর অফিসে হাজির হন।

বড় বড় ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ মুচুকুন্দ তাঁর অফিসেই নির্বাহ করেন। অনেক লিমিটেড কম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি তাঁর হাতে,

কাপড়-কল, চট-কল, চা-বাগান, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক, ইনশিওরেন্স ইত্যাদি ; তা ছাড়া তিনি কনট্রাকটারিও করেন। কাজ শেষ হলে তিনি মোটরে চড়ে একটু বেড়ান এবং ঠিক ছটার সময় বাড়িতে ফেরেন। তার পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করে তাঁর ড্রইংরুমে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তাঁর অনুগত বন্ধু আর হিতৈষীরাও একে একে উপস্থিত হন। এই সময় ভক্তিরত্ন মশাই আধ ঘণ্টা ভাগবত পাঠ করেন, মুচুকুন্দ গল্প করতে করতে তা শোনেন।

মুচুকন্দর ধনভাগ্য যশোভাগ্য পত্নীভাগ্য সবই ভাল, কিন্তু ছেলে দুটো তাঁকে নিরাশ করেছে। বড় ছেলে লখা (ভাল নাম লক্ষ্মীনাথ) কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গেছে, দু বেলা বাড়িতে এসে তার মায়ের কাছে খেয়ে যায়, তার পর দিন রাত কোথায় থাকে কেউ জানে না। মুচুকুন্দ বলেন, ব্যাটা পয়লা নম্বর গর্ভস্রাব। ছোট ছেলে সরা (ভাল নাম সরস্বতীনাথ) লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু কলেজ ছেড়েই ঝাঁকড়া চুল আর জুলফি রেখে আল্ট্রা-আধুনিক সুপার-দুর্বোধ্য কবিতা লিখছে। অনেক চেষ্টা করেও মুচুকুন্দ তাকে অফিসের কাজ শেখাতে পারেন নি, অবশেষে হতাশ হয়ে বলেছেন, যা ব্যাটা দু নম্বর গর্ভস্রাব, কবিতা চুষেই তোকে পেট ভরাতে হবে। মুচুকুন্দর শালা তারাপদই তাঁর প্রধান সহায়, একটু বোকা, কিন্তু বিশ্বস্ত কাজের লোক।

মুচুকুন্দ-গৃহিণী মাতঙ্গী দেবী লম্বা-চওড়া বিরাট মহিলা (হিংসুটে মেয়েরা বলে একখানা একগাড়ি মহিলা), যেমন কর্মিষ্ঠা তেমনি ধর্মিষ্ঠা। আধুনিক ফ্যাশন আর চাল-চলন তিনি দু চক্ষে দেখতে পারেন না। ধর্মকর্ম ছাড়া তাঁর অন্য কোনও শখ নেই, কেবল নিমন্ত্রণে যাবার সময় এক গা ভারী গহনা আর ন্যাফথালিনবাসিত বেনারসী পরেন। তিনি স্বামীর সব কাজের খবর রাখেন এবং ধনবৃদ্ধি আর পাপক্ষয় যাতে সমান তালে চলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। মুচুকুন্দ যদি অর্থের জন্য কোনও কুকর্ম করেন তবে

মাতঙ্গী বাধা দেন না, কিন্তু পাপ খণ্ডনের জন্য স্বামীকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনেন, তেমন তেমন হলে স্বস্ত্যয়ন আর ব্রাহ্মণভোজনও করান। মুচুকুন্দর অট্টালিকায় বার মাসে তের পার্বণ হয়, পুরুত ঠাকুরের জিম্মায় গৃহদেবতা নারায়ণশিলাও আছেন। কিন্তু মাতঙ্গীর সব চেয়ে ভক্তি লক্ষ্মীদেবার উপর। তাঁর পূজোর ঘরটি বেশ বড়, মারবেলের মেঝে, দেওয়ালে নকশা-কাটা মিনটন টালি, লক্ষ্মীর চৌকির উপর আলপনাটি একজন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি ঝুলছে এবং উঁচু বেদীর উপর একটি রুপোর তৈরী মাদ্রাজী লক্ষ্মীমূর্তি আছে। মাতঙ্গী রোজ এই ঘরে পূজো করেন, বৃহস্পতিবারে একটু ঘটা করে করেন। সম্প্রতি তাঁর স্বামীর কারবার তেমন ভাল চলছে না সেজন্য মাতঙ্গী পূজোর আড়ম্বর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, মুচুকুন্দ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সহধর্মিণীর সঙ্গে ব্রতপালন করছেন। সমস্ত রাত দুজনে লক্ষ্মীর ঘরে থাকবেন, মাতঙ্গী মোটেই ঘুমুবেন না, স্বামীকেও কড়া কফি আর চুরুট খাইয়ে জাগিয়ে রাখবেন। শাস্ত্রমতে এই রাত্রে জুয়া খেলতে হয় সেজন্য মাতঙ্গী পাশা খেলার সরঞ্জাম আর বাজি রাখবার জন্য শ-খানিক টাকা নিয়ে বসেছেন। মুচুকুন্দ নিতান্ত অনিচ্ছায় পাশা খেলছেন, ঘন ঘন হাই তুলছেন আর মাঝে মাঝে কফি খাচ্ছেন।

রাত বারটার সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের মাথার উপর উঠল। ঘরে পাঁচটা ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে এবং খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর জ্যোৎস্না আসছে। মুচুকুন্দ আর মাতঙ্গী দেখলেন, জানালার বাইরে একটা বড় পাখি নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, তার ডানায় চাঁদের আলো পড়ে ঝকমক করে উঠছে। মাতঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন,

কি পাখি ওটা? মুচুকুন্দ বললেন, পেঁচা মনে হচ্ছে। পাখিটা হঠাৎ হুহু-হুম হুহু-হুম শব্দ করে ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর মূর্তির নীচে স্থির হয়ে বসল। মুচুকুন্দ তাড়াতে যাচ্ছিলেন, মাতঙ্গী তাঁকে থামিয়ে বললেন, খবরদার, অমন কাজ ক'রো না, দেখছ না মা-লক্ষ্মীর বাহন এসেছেন। এই বলে তিনি গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন, তাঁর দেখাদেখি মুচুকুন্দও করলেন। পেঁচা মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে হুহু-হুম শব্দ করতে লাগল।

লক্ষ্মী পেঁচা তাতে সন্দেহ নেই, কারণ মুখটি সাদা, পিঠে সাদার উপর ঘোর খয়েরী রঙের ছিট। কাল পেঁচা নয়, কুটুরে পেঁচা নয়, হুতুমও নয়, যদিও আওয়াজ কতকটা সেই রকম। পেঁচার ডাক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। সংস্কৃতে বলে ঘূৎকার, ইংরেজীতে বলে হূট। শেকস্পীয়ার লিখেছেন, টু হুইট টু হু। মদনমোহন তর্কালংকার তাঁর শিশুশিক্ষায় লিখেছেন, ছোট ছেলের কান্নার মতন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কাল পেঁচা কুক-কুক-কুক অথবা করুণ শব্দ করে, কুটুরে পেঁচা কেচা-কেচা-কেচা রব করে, হুতুম পেঁচা হুউম হুউম করে। লক্ষ্মী পেঁচার বুলি তিনি লেখেন নি। মুচুকুন্দর গৃহাগত পেঁচাটির ডাক শুনে মনে হয় যেন দেওয়ালের ফুটো দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

মাতঙ্গী একটি রুপোর রেকাবিতে কিছু লক্ষ্মীপূজোর প্রসাদ রেখে পেঁচাকে নিবেদন করলেন। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে পেঁচা একটু ক্ষীর আর ছানা খেলে, বাদাম পেস্তা আঙুর ছুঁলে না। মুচুকুন্দ বললেন, মাংসাশী প্রাণী, যদি পুষতে চাও তো আমিষ খাওয়াতে হবে। মাতঙ্গী বললেন, কাল থেকে মাগুর মাছ আর কচি পাঁঠার ব্যবস্থা করব।

পেঁচা মহা সমাদরে বাড়িতেই রয়ে গেল। মুচুকুন্দ তাকে কাকাতুয়ার মতন দাঁড়ে বসাবেন স্থির করে পায়ে রুপোর শিকল বাঁধতে গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন চিৎকার করে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। তার পর থেকে সে যথেচ্ছাচারী মহামান্য কুটুম্বের মতন বাস

করতে লাগল। লক্ষ্মীপূজোর ঘরেই সে সাধারণত থাকে, তবে মাঝে মাঝে অন্য ঘরেও যায় এবং রাত্রে অনেকক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পালাবার চেষ্টা মোটেই করে না। বাড়ির চাকররা খুশী নয়, কারণ পেঁচা সব ঘর নোংরা করছে। মাতঙ্গী সবাইকে শাসিয়ে দিয়েছেন—খবরদার, পেঁচাবাবাকে যে গাল দেবে তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।

পেঁচার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুচুকুন্দবাবুর কারবারের উন্নতি দেখা গেল। বার-তের বৎসর আগে তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই পঞ্চানন চৌধুরীর সঙ্গে কনট্রাকটারি আরম্ভ করেন। যুদ্ধ বাধলে এঁরা বিস্তর গরু ভেড়া ছাগল শুওর এবং চাল ডাল ঘি তেল ইত্যাদি সরবরাহের অর্ডার পান, তাতে বহু লক্ষ টাকা লাভও করেন। তার পর দুজনের ঝগড়া হয়, এখন পঞ্চানন আলাদা হয়ে শেঠ কৃপারাম কচালুর সঙ্গে কাজ করছেন। গত বৎসর মুচুকুন্দ মিলিটারি ঠিকাদারিতে সুবিধা করতে পারেন নি, কৃপারাম আর পঞ্চাননই সমস্ত বড় বড় অর্ডার বাগিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পেঁচা আসবার পরদিনই মুচুকুন্দ টেলিগ্রাম পেলেন যে তাঁর দশ হাজার মন ঘিএর টেণ্ডারটি মঞ্জুর হয়েছে।

এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং তাঁর বাহনটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যতদিন মুচুকুন্দ তার পক্ষপুটের আশ্রয়ে থাকবেন ততদিন কৃপারাম আর পঞ্চানন কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না।

তিন দিন পরে কৃপারাম কচালু সকালবেলা মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মুচুকুন্দ বললেন, আসুন আসুন শেঠজী, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলুম। হুকুম করুন কি করতে হবে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে কৃপারাম বললেন, আপনাকে হুকুম করবার আমি কে বাবুসাহেব, আপনি হচ্ছেন কলকত্তা শহরের মাথা। আমি এসেছি একটি খবর জানতে। আপনার এখানে একটি উল্লু আছে?

মুচুকুন্দ বললেন, উল্লুক? একটি কেন, দুটি আছে, আমার ছেলে দুটোর কথা বলছেন তো?

—আরে রাম কহ। উল্লুক নয় উল্লু, যাকে বলে পেঁচ।

—ইস্ক্রুপ? সে তে হার্ডওয়ারের দোকানে দেদার পাবেন।

—আঃ হা, সে পেঁচ নয়, চিড়িয়া পেঁচ, তাকেই আমরা উল্লু বলি, রাত্রে চুপচাপ উড়ে বেড়ায়, চুহা কবুতক মেরে খায়।

—ও, পেঁচা! তাই বলুন। হাঁ, একটি পেঁচা কদিন থেকে এখানে দেখছি বটে।

কৃপারাম হাত জোড় করে বললেন, বাবুসাহেব, ওই পেঁচা আমার পোষা, শ্রীমতীজী—মানে আমার ঘরবালী—ওকে খুব পিয়ার করেন। আপনি রেখে কি করবেন, আমার চিড়িয়া আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার পোষা চিড়িয়া! তবে এখানে এল কি করে? পিঁজরায় রাখতেন না?

—ও পিঁজরায় থাকে না বাবুজী। এক বছর আগে আমার বাড়িতে ছাতে এসেছিল, সেখানে একটা কবুতরকে মার ডাললে। আমি তাড়া করলে আমার কোঠির হাথায় যে আমগাছ আছে তাতে চড়ে বসল। সেখানেই থাকত, শ্রীমতীজী তাকে খানা দিতেন। সেখান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে। এখন দয়া করে আমাকে দিয়ে দিন।

মুচুকুন্দবাবু সহাস্যে বললেন, শেঠজী, মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার জন্য এত লড়ছেন তবু এখনও আমরা ইংরেজের গোলাম হয়ে আছি। কিন্তু জংলী পাখি কারও গোলাম নয়। ওই পেঁচা মর্জি মাফিক কিছুদিন আপনার আমগাছে ছিল, এখন আমার বাড়িতে

এসেছে। ও কারও পোষা নয়, স্বাধীন পক্ষী, আজাদ চিড়িয়া। দু দিন পরে হয়তো তেলরাম পিছলচাঁদের গদিতে যাবে, আবার সেখান থেকে আলিভাই সালেজীর কোঠিতে হাজির হবে। ও পেঁচার ওপর মায়া করবেন না।

কৃপারাম রেগে গিয়ে বললেন, আপনি ফিরত দিবেন না?

মুচুকুন্দ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন, আমি ফেরত দেবার কে শেঠজী? মালিক তো পরমাৎমা, তিনিই তামাম জানোয়ারকে চালাচ্ছেন।

—তবে তো আদালতে যেতে হবে।

—তা যেতে পারেন। আদালত যদি বলে যে ওই জংলী পেঁচা আপনার সম্পত্তি তবে বেলিফ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবেন।

মুচুকুন্দ রায়ের বাড়ি থেকে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়ি বেশী দূরে নয়। কৃপারাম সেখানে উপস্থিত হলেন। পঞ্চানন বললেন, নমস্কার শেঠজী, অসময়ে কি মনে করে? খবর সব ভাল তো?

কৃপারাম বললেন, ভাল আর কোথা পঞ্চু ভাই, ঘিএর কনট্রাক্ট তো বিলকুল মুচুবাবু পেয়ে গেলেন। আমার আশা ছিল যে কম-সে-কম চার লাখ মুনাফা হবে, আমার তিন লাখ তোমার এক লাখ থাকবে, তা হল না। এখন শুন পঞ্চুবাবু, তোমাকে একটি কাম করতে হবে। একটি উল্লু—তোমরা যাকে বল পেঁচা—আমার কোঠি থেকে পালিয়ে মুচুকুন্দবাবুর কোঠিতে গেছে। তিনি ফিরত দিতে চাচ্ছেন না। ছিনিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, পেঁচার আপনার কি দরকার?

—বহুত ভাল পেঁচা, আমার ঘরবালীর খুব পিয়ারের পেঁচা। তাঁর এক বঙ্গালিন সহেলী আছেন, তিনি বলেছেন পেঁচাটি হচ্ছে লছমী মায়ীর সওয়ারি অসলী লক্ষ্মী পেঁচা। এই পেঁচার

আশীর্বাদেই তো পরসাল আমাদের কনট্রাক্ট মিলেছিল। আবার যেমনি সে মুচুকুন্দবাবুর কাছে গেল অমনি তিনি ঘিএর অর্ডার পেয়ে গেলেন।

—বটে! তা হলে তো পেঁচাটিকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি মুচুকুন্দর নামে নালিশ ঠুকে দিন।

—নালিশে কিছু হবে না, পেঁচা তো পিঁজরায় ছিল না, আমার কোঠির হাথায় আমগাছে থাকত। তুমি দুসরা মতলব কর, যেমন করে পার পেঁচাটিকে আমার কাছে পৌঁছে দাও, খরচ যা লাগে আমি দিব।

পঞ্চানন একটু ভেবে বললেন, শক্ত কাজ, সময় লাগবে, হাজার দু-হাজার খরচও পড়তে পারে।

—খরচার জন্য ভেবো না, পেঁচা আমার চাই। কিন্তু দেরি করবে না, আবার তো এক মাসের মধ্যেই একটি বড় টেণ্ডার দিতে হবে।

পঞ্চানন বললেন, আচ্ছা, আপনি ভাববেন না, যত শীঘ্র পারি পেঁচাটিকে আমি উদ্ধার করব।

মুচুকুন্দর বড় ছেলে লখা ছেলেবেলায় পঞ্চুকাকার খুব অনুগত ছিল, এখনও তাঁকে একটু খাতির করে। পঞ্চানন তার গতি-বিধির খবর রাখেন, রাত নটায় যখন সে খাওয়ার পর বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরুচ্ছে তখন তাকে ধরলেন। লখাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে বললেন, বাবা লখু, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, তার জন্যে অনেক টাকা পাবে। এই নাও আগাম পঞ্চাশ টাকা এখনই দিচ্ছি, কাজ হাসিল হলে আরও দেব।

টাকা পকেটে পুরে লখা বললে, কি কাজ পঞ্চুকাকা?

পঞ্চানন লখার কাঁধে একটি আঙুল ঠেকিয়ে চোখ টিপে কণ্ঠস্বর

নীচু করে বললেন, খুব লুকিয়ে কাজটি উদ্ধার করতে হবে বাবা, কেউ যেন টের না পায়।

—বাবার লোহার আলমারি ভাঙতে হবে?

—আরে না না। অমন অন্যায় কাজ আমি করতে বলব কেন। তোমাদের বাড়িতে একটা পেঁচা আছে না? সেটা আমার চাই, চুপি চুপি ধরে আনতে হবে। যেন না চেঁচায়, তাহলে সবাই জেনে ফেলবে।

লখা বললে, মা বলে ওটা লক্ষ্মী পেঁচা, খুব পয়মন্ত। যদি অন্য পেঁচা ধরে এনে দিই তাতে চলবে না?

—উঁহু, ওই পেঁচাটিই দরকার। আমার গুরুদেব অঘোরী বাবা চেয়েছেন, কি এক তান্ত্রিক সাধনা করবেন। যে-সে পেঁচায় চলবে না, তোমাদের বাড়ির পেঁচাটিরই শাস্ত্রোক্ত সব লক্ষণ আছে। পারবে না লখু?

কিছুক্ষণ ভেবে লখা বললে, তা আমি পারব, কিন্তু দিন দশ-বার দেরি হবে, পেঁচাটাকে আগে বশ করতে হবে। এখন তো ব্যাটা আমাকে দেখলেই ঠোকরাতে আসে। কত টাকা দেবেন?

—পঞ্চাশ দিয়েছি, পেঁচা আনলে আরও পঞ্চাশ দেব।

—তাতে কিছুই হবে না, অন্তত আরও পাঁচ-শ চাই। তা ছাড়া কোকেনের জন্য শ-খানিক। দারোয়ানটাকেও ঘুষ দিতে হবে, নইলে বাবাকে বলে দেবে।

—কোকেন কি হবে, তুমি খাও নাকি?

—রাম বল, ভদ্রলোকে কোকেন খায় না। আমার জন্যে নয়, ওই পেঁচাটাকে কোকেন ধরিয়ে বশ করতে হবে, তবে তাকে আনতে পারব।

অনেক দর কষাকষির পর রফা হল যে পেঁচা পঞ্চাননের হস্তগত হলে লখা আরও আড়াই-শ টাকা পাবে।

কৃপারাম নিজে এসে বা টেলিফোন করে রোজ খবর নিতে লাগলেন পেঁচা এল কিনা। পঞ্চানন তাঁকে বললেন, অত ব্যস্ত হবেন না, জানাজানি হয়ে যাবে। এলেই আপনাকে খবর দেব, আপনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।

দশ দিন পরে রাত এগারটার সময় লখা একটা রিক্শয় চড়ে পঞ্চাননের বাড়িতে এল। তার সঙ্গে একটি ঝুড়ি, কাপড় দিয়ে মোড়া। পঞ্চানন অত্যন্ত খুশী হয়ে মালসমেত লখাকে নিজের অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। কাপড় সরিয়ে নিলে দেখা গেল পেঁচা বুঁদ হয়ে চুপ করে বসে আছে।

লখা বললে, শুনুন পঞ্চুকাকা, এটাকে দিনের বেলায় ঘরে বন্ধ করে রাখবেন, কিন্তু রাত্রে ছেড়ে দেবেন, ও ইঁদুর পাখির ছানা এইসব ধরে খাবে, নইলে বাঁচবে না। আর এই শিশিটা রাখুন, এতে পাঁচ শ ভাগ চিনির সঙ্গে এক ভাগ কোকেন মিশানো আছে। রোজ বিকেলে চারটের সময় পেঁচাকে অল্প এক চিমটি খেতে দেবেন। একটা ছোট রেকাবিতে রেখে নিজের হাতে ওর সামনে ধরবেন, তা হলেই খুঁটে খুঁটে খাবে। যেখানেই থাকুক রোজ মৌতাতের সময় ঠিক আপনার কাছে হাজির হবে।

পঞ্চানন মুগ্ধ হয়ে বললেন, উঃ লখু, তোমার কি বুদ্ধি বাবা! কোকেন ধরালে পেঁচা আর কারও বাড়ি যাবে না, কি বল?

লখা বললে, যাবার সাধ্য কি, ও চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।

বার দিন হয়ে গেল তবু পেঁচার কোনও খবর আসছে না দেখে কৃপারাম উদ্বিগ্ন হয়ে পঞ্চাননের বাড়ি এলেন। পঞ্চানন জানালেন, অনেক হাঙ্গামা আর খরচ করে তিনি পেঁচাটিকে হস্তগত করতে পেরেছেন।

কৃপারাম উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবা পঞ্চু ভাই! এনে দাও, এনে দাও, আমি এখনই মোটরে করে নিয়ে যাব। খরচ কত পড়েছে বল, আমি চেক লিখে দিচ্ছি।

পঞ্চানন একটু চুপ করে থেকে বললেন, খরচ বিস্তর লাগবে।

—কত? পাঁচ শ? হাজার?

—উঁহু ঢের বেশী।

—বল না কত।

পঞ্চানন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শুনুন শেঠজী— লাখ পেঁচার মধ্যে একটি লক্ষ্মী পেঁচা মেলে, আবার দশ লাখ লক্ষ্মী পেঁচার মধ্যে একটি রাজলক্ষ্মী পেঁচা পাওয়া যায়। ইনি হলেন সেই আদত রাজলক্ষ্মী পেঁচা, সাত রাজার ধন এক মাণিক। পঞ্চাশটি গণেশজীর চাইতে এঁর কুদরত বেশী। এমন ইনভেস্টমেণ্ট আর কোথাও পাবেন না, আপনার বাড়িতে থাকলে বহু লক্ষ টাকা আপনি কামাতে পারবেন, আমি তার ভাগ চাই না। আমাকে দশ লাখ নগদ দিন, আমি পেঁচা ডেলিভারি দেব।

কৃপারাম অত্যন্ত চটে গিয়ে বললেন, পঞ্চুবাবু, তুমি এত বড় বেইমান নিমকহারাম ঠক জুয়াচোর তা আমার মালুম ছিল না। দু হাজার টাকা নিয়ে পেঁচা দেবে কি না বল, না দাও তো মুশকিলে পড়বে।

—আমার এক কথা, নগদ দশ লাখ চাই, ডেলিভারি এগেন্স্ট ক্যাশ। আপনি না দেন তো অন্য লোক দেবে, এই লড়াই-এর বাজারে রাজলক্ষ্মী পেঁচার খদ্দের অনেক আছে।

কৃপারাম বললেন, আচ্ছা, তোমাকে আমি দেখে লিব। এই বলে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কৃপারাম তুখড় লোক। তিনি ভেবে দেখলেন, পঞ্চাননের কাছ থেকে পেঁচা চুরি করে আনলে ঝঞ্ঝাট মিটবে না, তাঁর বাড়ি থেকে আবার চুরি যেতে পারে। অতএব এক শত্রুর সঙ্গে রফা করে আর এক শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তিনি মুচুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। মুচুকুন্দর মন ভাল নেই, তাঁর গৃহিণীও পেঁচার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

কৃপারাম বললেন, নমস্তে মুচুবাবু। আমার চিড়িয়া আপনি দিলেন না, জবরদস্তি ধরে রাখলেন, এখন দেখছেন তো, সে দুসরা জায়গায় গেছে।

মুচুকুন্দ ব্যগ্র হয়ে বললেন, আপনি জানেন নাকি কোথায় আছে?

—হাঁ, জানি। আপনার ভাই সেই পঞ্চু শালা চোরি করে নিয়ে গেছে, দশ লাখ টাকা না পেলে ছাড়বে না। মুচুবাবু, আমার কথা শুনুন, আমার সাথ দোস্তি করুন। ব্যাঙ্ক কটন-মিল ওগয়রহ আপনার থাকুক, আমি তার ভাগ চাই না, কেবল মিলিটারি ঠিকার কাজ আপনি আর আমি এক সাথ করব, মুনাফার বখরা আধাআধি। পঞ্চুর সঙ্গে আমার ফরাগত হয়ে গেছে। লক্ষ্মী পেঁচা পালা করে এক মাস আপনার কাছে এক মাস আমার কাছে থাকবে, তাহলে আর আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে না। বলুন, এতে রাজী আছেন?

মুচুকুন্দ বললেন, আগে পেঁচা উদ্ধার করুন।

—সে আপনি ভাববেন না, দু দিনের মধ্যে পেঁচা আপনার বাড়ি হাজির হবে। আমার মতলব শুনুন। ফজলু আর মিসরিলাল গুণ্ডাকে আমি লাগাব। তারা তাদের দলের লোক নিয়ে গিয়ে কাল দুপহর রাতে পঞ্চুর বাড়িতে ডাকাতি করবে, যত পারে লুঠ করবে, পঞ্চুকে ঐসা মার লাগাবে যে আর কখনও সে খাড়া হতে পারবে না।

—পেঁচার কি হবে?

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাছেই ছিপিয়ে থাকব, ফজলু আর মিসরিলাল আমার হাতেই পেঁচা দেবে।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আমি রাজী আছি। পেঁচা নিয়ে আসুন, আপনার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেণ্ট করব।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ সাহেব করিমুল্লা মুচুকুন্দবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। রাত আটটার সময় তাঁর কাছে গিয়ে মুচুকুন্দ বললেন, খাঁ সাহেব, সুখবর আছে। কি খাওয়াবেন বলুন।

তেঁতুল-বিচির মতন দাঁত বার করে করিমুল্লা বললেন—তওবা! আপনি যে উলটো কথা বলছেন সার। পুলিস খাওয়ায় না, খায়।

মুচুকুন্দ বললেন, বেশ, আপনি আমার কাজ উদ্ধার করে দিন, আমিই আপনাকে খাওয়াব। এখন শুনুন—আমি খবর পেয়েছি, কাল দুপুর রাতে পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি হবে। পঞ্চুকে আপনি জানেন তো? দূর সম্পর্কে আমার ভাই হয়। ডাকাতের সর্দার হচ্ছেন স্বয়ং শেঠ কৃপারাম।

—বলেন কি, কৃপারাম কচালু?

—হাঁ, তিনিই। তাঁর সঙ্গে ফজলু আর মিসরিলালের দলও থাকবে। আপনি পঞ্চুর বাড়ির কাছাকাছি পুলিস মোতায়েন রাখবেন। ডাকাতির পরেই সবাইকে গ্রেপ্তার করে চালান দেবেন, মায় কৃপারাম। তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না, বরং ফজলু আর মিসরিকে ছাড়তে পারেন।

—ডাকাতির পরে গ্রেপ্তার কেন? আগে করাই তো ভাল।

—না না, তা হলে সব ভেস্তে যাবে। আর শুনুন—আমার একটি পেঁচা ছিল, পঞ্চু সেটাকে চুরি করেছে। আবার কৃপারাম পঞ্চুর ওপর বাটপাড়ি করতে যাচ্ছে। সেই পেঁচাটি আপনি আমাকে এনে দেবেন, কিন্তু যেন জখম না হয়।

—ও, তাই বলুন, পেঁচাই হচ্ছে বখেড়ার মূল! মেয়েমানুষ হলে বুঝতুম, পেঁচার ওপর আপনাদের এত খাহিশ কেন? কাবাব বানাবেন নাকি?

—এসব হিন্দুশাস্ত্রের কথা, আপনি বুঝবেন না। আমার কাজটি উদ্ধার করে দিন, সরকারের কাছে আপনার সুনাম হবে, খাঁ বাহাদুর খেতাব পেয়ে যাবেন, আমিও আপনার মান রাখব।

করিমুল্লার কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুচুকুন্দবাবু বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন রাত বারটার সময় পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়িতে ভীষণ ডাকাতি হল। নগদ টাকা আর গহনা সব লুট হয়ে গেল। পঞ্চাননের মাথায় আর পায়ে এমন চোট লাগল যে, তিনি পনের দিন হাঁসপাতালে বেহুঁশ হয়ে রইলেন। তিনটে ডাকাত ধরা পড়ল, কিন্তু ফজলু আর মিসরিলাল পালিয়ে গেল। কৃপারাম পেঁচার খাঁচা নিয়ে একটা গলি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। সকালবেলা স্বয়ং খাঁ সাহেব করিমুল্লা মুচুকুন্দর হাতে পেঁচা সমর্পণ করলেন। মাতঙ্গী দেবী শাঁখ বাজিয়ে লক্ষ্মীর বাহনকে ঘরে তুললেন।

পেঁচা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার ফুর্তি নেই। সমস্ত দিন সে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। নিশ্চিত হবার জন্য পঞ্চানন তাকে ডবল মাত্রা খাওয়াচ্ছিলেন, তাই বেচারা ঝিমিয়ে আছে। বিকালবেলা মৌতাতের সময় সে ছটফট করতে লাগল, মুচুকুন্দ কাছে এলে তাঁর হাতে ঠুকরে দিলে। মাতঙ্গী আদর করে বললেন, কি হয়েছে কি হয়েছে আমার পেঁচু বাপধনের। পেঁচা তাঁর হাতে ঠোকর মেরে গালে নখ দিয়ে আঁচড়ে রক্তপাত করে দিলে। মাতঙ্গী রাগ সামলাতে পারলেন না, দূর হ লক্ষ্মীছাড়া বলে তাকে হাত-পাখা দিয়ে মারলেন। পেঁচা বিকট চ্যাঁ চ্যাঁ রব করে

ঘর থেকে উড়ে কোথায় চলে গেল। মাতঙ্গী ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে লোক পাঠালেন, কিন্তু পেঁচার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনাবলী খুব দ্রুত। মুচুকুন্দর উত্থান গত পনের বৎসরে ধীরে ধীরে হয়েছিল, কিন্তু এখন ঝুপ করে তাঁর পতন হল। কিছুকাল থেকে ফটকাবাজিতে তাঁর খুব লোকসান হচ্ছিল। সম্প্রতি তিনি যে দশ হাজার মণ ঘি পাঠিয়েছিলেন, ভেজাল প্রমাণ হওয়ায় তার জন্য বিস্তর টাকা গচ্চা দিতে হল। তাঁর মুরুব্বী মেজর রবসন হঠাৎ বদলি হওয়াতেই এই বিপদ হল, তিনি থাকলে অতি রাবিশ মালও পাস করে দিতেন। মুচুকুন্দবাবুর কম্পানিগুলোরও গতিক ভাল নয়। এমন অবস্থায় ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা যা করে থাকেন তিনিও তাই করলেন, অর্থাৎ এক কারবারের তহবিল থেকে টাকা সরিয়ে অন্য কারবার ঠেকিয়ে রাখতে গেলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁর পিছনে লাগল। তার পর এক দিন তাঁর ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়ল, যথারীতি পুলিসের তদন্ত এবং খাতাপত্র পরীক্ষা হল, এক বৎসর ধরে মকদ্দমা চলল, পরিশেষে মুচুকুন্দ তহবিল-তছরূপ জালিয়াতি ফেরববাজি প্রভৃতির দায়ে জেলে গেলেন।

মাতঙ্গী দেবী তাঁর ভাই তারাপদর কাছে আশ্রয় নিলেন। লখা আর সরা কোথায় থাকে কি করে তার স্থিরতা নেই। তারাপদবাবু বলেন, দিদি আর জামাইবাবু মস্ত ভুল করেছিলেন। পেঁচাটা লক্ষ্মী-পেঁচাই নয়, নিশ্চয় হুতুমপেঁচা, ভোল ফিরিয়ে এসেছিল। সেই অলক্ষ্মীর বাহনই সর্বনাশ করে গেল। তারাপদ দিল্লি থেকে খবর পেয়েছেন যে সেই পেঁচা এখন কিং এডোআর্ড রোডের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে একটা পেঁচীও জুটেছে, কোথায় আস্তানা গাড়বে বলা যায় না।

১৩৫৮

অক্রূরসংবাদ

নমস্কার মশাই। আপনার পাশে একটু বসবার জায়গা হবে কি? ঢাকুরে লেকের ধারে একটা বেঞ্চে একলা বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে ওঠবার উপক্রম করছি এমন সময় আগন্তুক ভদ্রলোকটি উক্ত প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলুম, নিশ্চয় নিশ্চয়, বসবেন বই কি, ঢের জায়গা রয়েছে।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, লম্বা রোগা ফরসা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সযত্নে সিঁথি-কাটা, মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতন গোঁফ-দাড়ি। পরনে মিহি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি, হাতে রূপো-বাঁধানো লাঠি। দেখলেই মনে হয় সেকেলে শৌখিন বড়লোক। পকেট থেকে একটা বড় কাগজ বার করে বেঞ্চের এক পাশে বিছিয়ে তার ওপর বসে পড়ে বললেন, আমি হচ্ছি অক্রূর নন্দী। মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

আমি বললুম, নিশ্চয় পারেন, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র।

—আপনার কি বাড়ি ফেরবার তাড়া আছে? না থাকে তো খানিকক্ষণ বসুন না, আলাপ করা যাক। দেখুন, আমি হচ্ছি একটু খাপছাড়া ধরনের, লোকের সঙ্গে সহজে মিশতে পারি না, যার তার সঙ্গে বনেও না।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম, তবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছেন কেন? যদি না বনে?

অক্রূর নন্দী ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি। আপনার বয়স চল্লিশের নীচে, কি বলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা হলে বনবে। বুড়োদের সঙ্গে আমার মোটেই বনে না, তাদের হাড় চামড়া মন সব শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভাবছেন লোকটা বলে কি, নিজেও তো বুড়ো। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু আমার মন শুখিয়ে যায় নি।

—অর্থাৎ আপনি এখনও তরুণ আছেন।

অক্রূরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তরুণ ফরুন নই। আমি হচ্ছি একজন বোদ্ধা অর্থাৎ ফিলসফার, জগৎটাকে হ্যাংলা বোকার মতন গবগব করে গিলতে চাই না, চেখে চেখে চিবিয়ে চিবিয়ে ভোগ করতে চাই। চলুন না আমার বাড়ি, খুব কাছেই। রাত্রের খাবারটা আমার সঙ্গেই খাবেন, আমার জীবনদর্শনও আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোল আছে তাতে সন্দেহ নেই। বললুম, আজ তো বাড়িতে বলে আসি নি, ফিরতে দেরি হলে সবাই ভাববে যে।

—বেশ, কাল এই সময় এখানে আসবেন, আমি আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব, সেখানেই আহার করবেন। ভাবছেন লোকটা আবুহোসেন নাকি? কতকটা তাই বটে! একা একা থাকি, কথা কইবার উপযুক্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই, কিন্তু লাখে একজনও মেলে না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনিও একজন বোদ্ধা। কি করা হয়?

—কলেজে ফিলসফি পড়াই।

—বাহা বাহা! তবেই দেখুন আমি কি রকম মানুষ চিনতে পারি।

সবিনয়ে বললুম, যা ভাবছেন তা নই, আমার বিদ্যা বুদ্ধি অতি সামান্য। পুরুত যেমন করে যজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমিও তেমনি করে ছাত্রদের পড়াই। নিজেও কিছু বুঝি না, তারাও কিছু বোঝে না।

—ও কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আচ্ছা, এখন আলোচনা থাক, আপনি বোধ হয় ওঠবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাল ঠিক আসবেন তো?

অক্রূর নন্দী বাতিকগ্রস্ত বটে, কিন্তু শেক্সপীয়ার যেমন বলেছেন —এঁর পাগলামিতে শৃঙ্খলা আছে। লোকটিকে ভাল করে জানবার জন্য খুব কৌতূহল হল। বললুম, আজ্ঞে হাঁ, ঠিক আসব।

পরদিন যথাকালে উপস্থিত হয়ে দেখলুম অক্রূরবাবু বেঞ্চে বসে আছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। এখানে সময় নষ্ট করে কি হবে, আমার বাড়ি চলুন। খুব কাছেই, এই সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর পাশ থেকে বেরিয়েছে হর্ষবর্ধন রোড, তারই দশ নম্বর হচ্ছে আমার বাড়ি।

যেতে যেতে আমি বললুম, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—মশায়ের কি করা হয়?

অক্রূরবাবু প্রতিপ্রশ্ন করলেন, আপনি আত্মা মানেন?

—বড় কঠিন প্রশ্ন। আমার একটা আত্মা জন্মাবধি আছে বটে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলেও যাচ্ছে, কিন্তু জন্মের আগেও সেই আত্মাটা ছিল কিনা তা তো জানি না।

—ও, আপনি হচ্ছেন আজ্ঞাবাদী অ্যাগ্‌নস্টিক। আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি জন্মান্তরীণ আত্মা মানি। আমার গত জন্মের আত্মাটি খুব চালাক ছিল মশাই, বেছে-বেছে বড়লোকের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছে।

—আপনি ভাগ্যবান লোক।

—তা বলতে পারেন। বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যে, রোজগারের কোনও দরকারই নেই। অন্নচিন্তা থাকলে উচ্চচিন্তা

করতে পারতুম না। আমি বেকার অলস লোক নই, দিনরাত গবেষণা করি কিসে মানুষের বুদ্ধি বাড়বে, সমাজের সংস্কার হবে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমি অন্তত দু শ বৎসর আগে জন্মেছি, এখনকার লোকে আমার থিওরি বুঝতেই পারে না।

—আমিই যে বুঝব সে ভরসা করছেন কেন?

—বুঝবেন, একটু চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আপনার দুই কানের ওপরে একটু ঢিপি মতন আছে, ওই হল বোদ্ধার লক্ষণ। আসুন, এই আমার আস্তানা অক্রূরধাম। পৈতৃক বাড়িটি কাকারা পেয়েছেন, এ বাড়ি আমি করেছি।

অক্রূরধাম বিশেষ বড় নয় কিন্তু গড়ন ভাল। বারান্দায় চারপাঁচ জন দারোয়ান চাকর ইত্যাদি একটা বেঞ্চে বসে গল্প করছিল, মনিবকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। অক্রূরবাবু হাতের ইশারায় তাদের বসতে বলে আমাকে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি মাঝারি, আসবাব অল্প, কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন।

ঘরে ঢোকবার সময় দরজার পাশের দেওয়ালে আমার হাত ঠেকে গিয়েছিল। দেখলুম একটু আঁচড়ে গেছে। অক্রূরবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, খোঁচা খেয়েছেন বুঝি? ভয় নেই, ওষুধ দিচ্ছি। এই বলে তিনি আমার হাতে বেগনী কালির মতন কি একটা লাগিয়ে দিলেন।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, ও কিছুই নয়, একটু ছড়ে গেছে। বোধ হয় ওখানে একটা পেরেক আছে।

—একটা নয় মশাই, সারি সারি পিন বসানো আছে, হাত দিলেই ফুটবে। কেন লাগাতে হয়েছে জানেন? ভারতবর্ষ হচ্ছে বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারির দেশ। এখানকার লোকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চাকর ধোবা গোয়ালা নাপিত যেই হক—এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকও—দরজায় বা দেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সেই শ্রীকৃষ্ণের আমল থেকে চলে আসছে, অজন্টার ছবিতে আর পুরী মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতির মন্দিরে একটাও সোজা মূর্তি

পাবেন না। বাড়ির চাকর আর আগন্তুক লোকদের গা-হাত লেগে দেওয়াল আর দরজা ময়লা হয়, কিছুতেই কদভ্যাস ছাড়াতে পারি না। নিরুপায় হয়ে মেঝে থেকে এক ফুট বাদ দিয়ে দেওয়াল আর দরজার ছ ফুট পর্যন্ত, মায় সিঁড়ির রেলিংএ সারি সারি গ্রামোফোন পিন লাগিয়েছি, প্রায় দু লক্ষ পিন। এখন আর বাছাধনরা অজণ্টা প্যাটার্নে ত্রিভঙ্গ হয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসতেও পারে না।

—বাড়িতে চাকর টিঁকে থাকে কি করে?

—মাইনে আড়াইগুণ করে দিয়েছি। কেউ কেউ ভুলে ঠেস দিয়ে জখম হয়, তাই এক বোতল জেনশ্যান ভায়োলেট লোশন রেখেছি। খুব ভাল অ্যান্টিসেপটিক, আর দাগও তিন-চার দিন থাকে, তা দেখে লোকে সাবধান হয়!

—কিন্তু বাচ্চাদের সামলান কি করে? বাড়িতে ছেলেপিলে আছে তো?

অট্টহাস্য করে আক্রূরবাবু বললেন, ছেলে হচ্ছি আমি, আর পিলে ওই চাকরগুলো।

—সেকি, আপনার সন্তানাদি নেই?

—দেখুন সুশীলবাবু, বিবাহ করব না অথচ সন্তানের জন্ম দেব এমন আহাম্মক আমি নই।

—কেন, বিবাহ করেন নি?

—চেষ্টা ঢের করেছি, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।

—আপনার মতন লোকের এ পর্যন্ত পত্নীলাভ হয় নি এ বড় আশ্চর্য কথা। আপনি ধনী সুপুরুষ সুশিক্ষিত জ্ঞানী—

—আমার আরও অনেক গুণ আছে। নেশা করি না, পান তামাক চা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য স্পর্শ করি না, মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি আমার রান্নাঘরে ঢুকতে পায় না। আমি

গান্ধীজীর থিওরি মানি, তরকারির খোসা বাদ দেওয়া আর মসলা দিয়ে রাঁধা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি রশুন খেতেন, আমি তাও খাই না। নুনও খুব কমিয়ে দিয়েছি, তাতে ব্লাড-প্রেশার বাড়ে!

—দুধ খান তো?

—তা খাই, কিন্তু বাছুরকে বঞ্চিত করি না। বাড়িতে তিনটে গরু আছে, বাছুরের জন্য যথেষ্ট দুধ রেখে বাকীটা নিজে খাই।

অক্রূরবাবুর কথা শুনে বুঝলুম আজ রাত্রে আমার কপালে উপবাস আছে। মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড দেখেছি—ঔদরিক এম্পোরিয়াম। ফেরবার সময় সেখানেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে।

অক্রূরবাবু বললেন, ও ঘরে চলুন, খেতে খেতেই আলাপ করা যাবে। শাস্ত্রে বলে, মৌনী হয়ে খাবে। তা আমি মানি না, বিলিতী পদ্ধতিতে গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে খেলেই ভাল হজম হয়।

খাবার এল। অক্রূর নন্দী খেয়ালী লোক হলেও তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে, আমার জন্য ভাল ভাল খাবারেরই আয়োজন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য এল খান কতক মোটা রুটি, কিছু সিদ্ধ তরকারি, কিছু কাঁচা তরকারি, আর এক বাটি দুধ।

অক্রূরবাবু বললেন, কোনও জন্তু ক্যালরি প্রোটিন ভাইটামিন নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষরা জন্তুর মতনই কাঁচা জিনিস খেতেন, তাতেই তাঁদের পুষ্টি হত। সভ্য হয়ে সেই সদভ্যাস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন কাঁচা লাউ কুমড়ো অনেকেই হজম করতে পারে না, তাই আপনাকে দিই নি। আমি কিন্তু কাঁচা খাওয়া অভ্যাস করেছি, একটু একটু করে ঘাস খেতেও শিখছি। যাক ও কথা। আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আপনার কণ্ঠাগত হয়ে আছে। চক্ষুলজ্জা করবেন না, অসংকোচে বলে ফেলুন।

আমি বললুম, কিছু যদি মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—

আপনি বলেছেন যে, বিবাহের জন্য ঢের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। কেন হয়ে ওঠে নি বলবেন কি?

—আরে সে কথা বলতেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি। শুনুন। দাম্পত্য হচ্ছে তিন রকম। এক নম্বর, যাতে স্বামীর বশে স্ত্রী চলে, যেমন গান্ধী-কস্তুরবা। দু নম্বর, যাতে স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর বশ, অর্থাৎ স্ত্রৈণ ভেড়ো বা হেনপেক, যেমন জাহাঙ্গীর-নুরজাহান। দুটোই হল ডিক্টেটারী ব্যবস্থা, কিন্তু দুক্ষেত্রেই দম্পতি সুখী হয়। তিন নম্বর হচ্ছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী কিছুমাত্র রফা না করে নিজের নিজের মতে চলে, অর্থাৎ দুজনেই একগুঁয়ে। এই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক আদর্শ দাম্পত্য-সম্বন্ধ, কিন্তু এর পদ্ধতি বা টেকনিক লোকে এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি।

—আপনি নিজে কিরকম দাম্পত্য পছন্দ করেন?

—তিন রকমেরই চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনওটাই অবলম্বন করতে পারি নি। তারই ইতিহাস আপনাকে বলব। যখন বয়স কম ছিল তখন আর পাঁচ জনের মতন এক নম্বর দাম্পত্যই পছন্দ করতুম। যেমন বাঁদর ষাঁড় ছাগল মোরগ প্রভৃতি জন্তু তেমনি মানুষেরও পুংজাতি সাধারণত প্রবল, তারাই স্ত্রীজাতি শাসন করতে চায়। কিন্তু মুশকিল কি হল জানেন? কাকেও পীড়ন করা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু আমার সংসারযাত্রার আদর্শ এত বেশী র‍্যাশন্যাল কোনও স্ত্রীলোকই তা বরদাস্ত করতে পারেন না।

পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম বইকি। আমার বয়স যখন চব্বিশ তখন আমার মেজকাকী তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনঝির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করলেন। আমাদের সমাজে কোর্টশিপের চলন তখনও হয় নি, অভিভাবকরাই সম্বন্ধ স্থির করতেন। আমার বাপ-মা তখন গত হয়েছেন, কাকাদের সঙ্গেই থাকতুম। আমি মেজকাকীকে বললুম, বিয়েতে মত দেবার আগে তোমার বোনঝিকে আমার মনের কথা

জানাতে চাই। কাকী বললেন, বেশ তো, যত খুশি জানিও, আমি না হয় আড়ালে থাকব। তার পর এক দিন মেয়েটিকে আনা হল। আমি তাকে একটি লেকচার দিলুম।—শোন উজ্জ্বলা, আমি স্পষ্ট-বক্তা লোক, আমার কথায় কিছু মনে ক'রো না যেন। তুমি দেখতে ভালই, ম্যাট্রিক পাস করেছ, শুনেছি গান বাজনা আর গৃহকর্মও জান। ওতেই আমি তুষ্ট। তুমিও আমাকে বিয়ে করলে ঠকবে না, একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ বিদ্বান ধনবান আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান স্বামী পাবে, আমার নতুন বাড়ির সর্বেসর্বা গিন্নী হবে, বিস্তর টাকা খরচ করতে পাবে। কিন্তু তোমাকে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। দু-এক গাছা চুড়ি ছাড়া গহনা পরতে পাবে না, শৃঙ্গী নখী আর দন্তী প্রাণীর মতন সালংকারা স্ত্রীও ডেঞ্জারস। নিমন্ত্রণ গিয়ে যদি নিজের ঐশ্বর্য জাহির করতে চাও তো ব্যাঙ্কের একটা সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে যেতে পার। সাজগোজেও অন্য মেয়ের নকল করবে না, আমি যেমন বলব সেইরকম সাজবে। আর শোন—ছবি টাঙিয়ে দেওয়াল নোংরা করবে না, নতুন নতুন জিনিস আর গল্পের বই কিনে বাড়ির জঞ্জাল বাড়াবে না, গ্রামোফোন আর রেডিও রাখবে না। ইলিশ মাছ কাঁকড়া পেঁয়াজ পেয়ারা আম কাঁঠাল ত্যাগ করতে হবে, ওসবের গন্ধ আমার সয় না। পান খাবে না, রক্তদন্তী স্ত্রী আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। সাবান যত খুশি মাখবে, কিন্তু এসেন্স পাউডার নয়, ওসব হল ফিনাইল জাতীয় জিনিস দুর্গন্ধ চাপা দেবার অসাধু উপায়। এই রকম আরও অনেক বিধিনিষেধের কথা জানিয়ে তাকে বললুম, তুমি বেশ করে ভেবে দেখ, তোমার বাপ-মার সঙ্গে পরামর্শ কর, যদি আমার শর্ত মানতে পার তবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে খবর দিও। কিন্তু এক হপ্তা হয়ে গেল, তবু কোনও খবর এল না।

—বলেন কি!

—অবশেষে আমিই মেজকাকীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? তিনি পাত্রীর বাড়িতে তাগাদা পাঠালেন। তার পর আমি একটা

পোস্টকার্ড পেলুম। পাত্রীর দাদা ইংরাজীতে লিখেছে—গো টু হেল।

—কন্যাপক্ষ দেখছি অত্যন্ত বোকা, আপনার মতন বরের মূল্য বুঝল না।

—হাঁ, বেশীর ভাগই ওই রকম বোকা, তবে গোটাকতক চালাক কন্যাপক্ষও জুটেছিল। তাদের মতলব, ভাঁওতা দিয়ে আমার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দেওয়া। তখন একটা নতুন শর্ত জুড়ে দিলুম—ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে তখনই তাকে বিদেয় করব। খোরপোষ দেব, কিন্তু আমার সম্পত্তি সে পাবে না। এই কথা শুনে সব ভেগে পড়ল। জ্ঞাতিশত্রুরাও রটাতে লাগল যে আমি একটা উন্মাদ। কিন্তু একটি মেয়ে সত্যই রাজী হয়েছিল। অত্যন্ত গরিবের মেয়ে, দেখতেও তেমন ভাল নয়। আমার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে তখনই বললে যে, সে রাজী। আমি বললুম, অত তাড়াতাড়ি নয়, তোমার বাপ মায়ের মত নিয়ে জানিও। পরদিন খবর এল বাপ-মাও খুব রাজী। আমার সন্দেহ হল। খোঁজ নিয়ে জানলুম, রূপ আর টাকার অভাবে তার পাত্র জুটছে না। বাপ মা অত্যন্ত সেকেলে, মেয়েকে কেবল অভিশাপ দেয়। এখন সে শরৎ চাটুজ্যের অরক্ষণীয়ার মতন মরিয়া হয়ে উঠেছে, নির্বিচারে যার-তার কাছে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত। মেয়ের বাপের সঙ্গে দেখা করে আমি বললুম, আপনার মেয়ে শুধু আপনাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, আমার শর্তগুলো মোটেই বিচার করে দেখে নি। এমন বিয়ে হতে পারে না। এই নিন পাঁচ হাজার টাকা, আমি যৌতুক দিলুম, মেয়েকে আপনাদের পছন্দ মত ঘরে বিয়ে দিন। বাপ খুব কৃতজ্ঞ হয়ে বললে, আপনিই খুকীর যথার্থ পিতা, আমি জন্মদাতা মাত্র। মেয়েটি ভাল ঘরেই পড়েছিল, বিয়ের পর বরের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল।

আমি বললুম, আপনি মহাপ্রাণ দয়ালু ব্যক্তি।

—তা মাঝে মাঝে দয়ালু হতে হয়, টাকা থাকলে দান করায় বাহাদুরি কিছু নেই। তার পর শুনুন। আমার বয়স বেড়ে চলল, পঁয়ত্রিশ পার হয়ে বুঝলুম আমার আদর্শের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে এমন কৃচ্ছ্রসাধিকা নারী কেউ নেই। তখন আমার একটা মানসিক বিপ্লব হল, যাকে বলে রিভলিউশন। এক নম্বর দাম্পত্য যখন হবার নয় তখন দু নম্বরের চেষ্টা করলে দোষ কি? আমার অনেক আত্মীয় তো স্ত্রীর বশে বেশ সুখে আছে। স্ত্রৈণতাও সংসার-যাত্রার একটি মার্গ। জগতে কর্তাভজা বিস্তর আছে, তারা বিচারের ভার কর্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। যা করেন গুরুমহারাজ, যা করেন পণ্ডিতজী, যা করেন কমরেড স্তালিন আর মাও-সে-তুং। তেমনি গিন্নীভজাও অনেক আছে। তারা বলে, আমার মতামতের দরকার কি, যা করেন গিন্নী।

—কিন্তু আপনার স্বভাব যে অন্য রকম, আপনার পক্ষে গিন্নী-ভজা হওয়া অসম্ভব।

—অবস্থাগতিকে বা সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। একটি সার সত্য আপনাকে বলছি শুনুন। যে নারী রাজার রানী হয়, বড়-লোকের স্ত্রী হয়, নামজাদা গুণী লোকের গৃহিণী হয়, সে নিজেকে মহাভাগ্যবতী মনে করে, অনেক সময় অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু রানীকে বা টাকাওয়ালী মেয়েকে যে বিয়ে করে, কিংবা যার স্ত্রী মস্ত বড় দেশনেত্রী লেখিকা গায়িকা বা নটী, এমন পুরুষ প্রথম প্রথম সংকুচিত হয়ে থাকে। সে স্বনামধন্য নয়, স্ত্রীর নামেই তার পরিচয়, লোকে তাকে একটু অবজ্ঞা করে। কিন্তু কালক্রমে তার সয়ে যায়, ক্ষোভ দূর হয়, সে খাঁটি স্ত্রৈণ হয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে।

—আপনিও সে রকম হতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—করেছিলুম। কুইন ভিক্টোরিয়া, সারা বার্নহার্ড, ভার্জিনিয়া

উল্‌ফ বা সরোজিনী নাইডুর মতন পত্নী যোগাড় করা অবশ্য আমার সাধ্য নয়, কিন্তু যদি একজন বেশ জবরদস্ত নামজাদা মহিলার কাছে চোখ কান বুজে আত্মসমর্পণ করতে পারি তবে হয়তো দু নম্বর দাম্পত্যও আমার সয়ে যেতে পারে, আমার মত তার আদর্শও বদলে যেতে পারে।

—আপনার পক্ষে তা অসম্ভব মনে করি।

—আমি কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তখন আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, পুরীতে স্বর্গদ্বারের পুব দিকে নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, ওশন-ভিউ হোটেলে আছি। আমার পুরনো সহপাঠী ভূপেন সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন মস্ত গভর্নমেন্ট অফিসার, ছুটি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আছে তার বোন সত্যভামা সরকার। দুজনে আমার হোটেলেই উঠল। সত্যভামা বিখ্যাত মহিলা, দু বার বিলাত ঘুরে এসেছে, হুণ্ডাগড়ের রানী সাহেবাকে ইংরিজী পড়ায় আর আদব কায়দা শেখায়, অনেক বইও লিখেছে। নাম আগেই শোনা ছিল, এখন আলাপ হল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দশাসই চেহারা, মুখটি গোবদা গোছের, ড্যাবড়েবে চোখ, নীচের ঠোঁট একটু বাইরে ঠেলে আছে। দেখলেই বোঝা যায় যে ইনি একজন জবরদস্ত মহীয়সী মহিলা, স্বামীকে বশে রাখবার শক্তি এঁর আছে। ভাবলুম, এই সত্যভামার কাছেই আত্মসমর্পণ করলে ক্ষতি কি। দু দিন মিশেই বুঝলুম, আমি যেমন তাকে বাজিয়ে দেখেছি, সেও তেমনি আমাকে দেখেছে।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন শিকার কাহিনী শুনছি।

—কতকটা সেই রকম বটে। যেন একটা বাঘিনী ওত পেতে আছে, আর একটা বাঘ তার পিছনে ঘুরছে। তার পর একদিন আমার নতুন বাড়ি তদারক করতে গেছি, ভূপেন আর সত্যভামাও সঙ্গে আছে। সত্যভামা বললে, জানেন তো সমস্ত ইট বেশ করে ভিজিয়ে নেওয়া চাই, আর ঠিক তিন ভাগ সুরকির সঙ্গে এক ভাগ

চুন মেশানো চাই, নয়তো গাঁথুনি মজবুত হবে না। আমার একটু রাগ হল। সাতটা বাড়ি আমি নিজে তৈরি করিয়েছি, কোনও ওভারশিয়ারের চাইতে আমার জ্ঞান কম নয়, আর আজ এই সত্যভামা আমাকে শেখাতে এসেছে!

—আপনার কিন্তু রাগ হওয়া অন্যায়, আপনি তো আত্মসমর্পণ করতেই চেয়েছিলেন। দু নম্বর দাম্পত্যে স্বামীকে স্ত্রীর উপদেশ শুনতেই হয়।

—তা ঠিক, কিন্তু হঠাৎ অনভ্যস্ত উপদেশ একটু অসহ্য বোধ হয়েছিল। তখনকার মতন সামলে নিলুম, কিন্তু পরে আবার গোল বাধল। রাত্রে হোটেলে এক টেবিলে খেতে বসেছি। সত্যভামা বললে, দেখুন মিস্টার নন্দী, আপনার খাওয়া মোটেই সায়েন্টিফিক নয়, মাছ মাংস ডিম টোমাটো ক্যারট লেটুস এই সব খাওয়া দরকার, যা খাচ্ছেন তাতে ভাইটামিন কিচ্ছু নেই। এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ক্যালরি প্রোটিন অ্যামিনোঅ্যাসিড আর ভাইটামিনের হাড় হদ্দ আমার জানা আছে, তার বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি গুলে খেয়েছি, আর এই মাষ্টারনী আমাকে লেকচার দিচ্ছে! রাগের বশে একটা অসত্য কথা বলে ফেললুম—দেখুন মিস সত্যভামা, ভাইটামিন আমার সয় না। সত্যভামা বললে, সয় না কি রকম! উত্তর দিলুম, না, একদম সয় না, ডাক্তার বারণ করেছে। সত্যভামা ঘাবড়ে গিয়ে চুপ মেরে গেল।

—আপনার ধৈর্য দেখছি বড়ই কম।

—সেই তো হয়েছে বিপদ, উপদেশ আমার বরদাস্ত হয় না। তার চার দিন পরে যা হল একবারে চূড়ান্ত। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছি, শুধু আমি আর সত্যভামা, ভূপেন বোধ হয় ইচ্ছে করেই আসে নি। সত্যভামা হঠাৎ বললে, ওহে অক্রূর, তুমি গোঁফ-দাড়িটা কালই কামিয়ে ফেল, ওতে তোমাকে মানায় না, জংলী জংলী মনে হয়। কি আস্পর্ধা দেখুন! যার ছাগল-দাড়ি

বা ইঁদুরে খাওয়ার মতন বিশ্রী দাড়ি তার অবশ্য না রাখাই উচিত। কিন্তু আমার মতন যার সুন্দর নিরেট দাড়ি সে কামাবে কোন্ দুঃখে? সত্যভামার কথায় আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কোটি কোটি বৎসর ধরে পুরুষত্বের যে বীজ প্রাণিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে এসেছে, যার প্রভাবে সিংহের কেশর, ষাঁড়ের ঝুঁটি, ময়ূরের পেখম আর মানুষের দাড়ি-গোঁফ উদ্‌ভূত হয়েছে, সেই দুর্দান্ত পুং-হরমোন আমার রক্তে মাংসে মজ্জায় কুপিত হয়ে উঠল, আমি ধমক দিয়ে বললুম, চোপ রও, ও কথা মুখে আনবে না, কামাতে চাও তো নিজের মাথা মুড়িয়ে ফেল। সত্যভামা একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাল, তারপর উঠে চলে গেল। রাত্রে খাবার সময় ভাই বোন কাকেও দেখলুম না। পরদিন সকালের ট্রেনে আমি কলকাতায় রওনা হলুম।

—তার পর আর কোথাও দু নম্বর দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

—রাম বল, আবার! বুঝতে পারলুম এক নম্বর দু নম্বর কোনওটাই আমার ধাতে সইবে না। তার পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম, দাম্পত্যের তিন নম্বরও আছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী নিজের নিজের মতে চলে অথচ সংঘর্ষ হয় না। আবিষ্কারটা ঠিক আমি করি নি, রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন—

—বলেন কি!

—হাঁ, রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন। কিন্তু লোকে তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, তাঁর লেখা থেকে আমিই পুনরাবিষ্কার করেছি। তিনি কি লিখেছেন শুনতে চান?

অক্রূরবাবু পাশের ঘর থেকে 'শেষের কবিতা' এনে পড়তে লাগলেন।—

অমিত রায় লাবণ্যকে বলছে—ওপারে তোমার বাড়ি, এপারে আমার।...একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়ায় বসিয়ে দেব, মিলনের

সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল।...অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনো মতেই যেতে পাব না।...তোমার নিমন্ত্রণ মাসে এক দিন পূর্ণিমার রাতে।...পূজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দু জনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু জনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে। এই তো আমার দাম্পত্যের দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। তোমার কি মত? লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—মেনে নিতে রাজী আছি।...আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেই জন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।...তার পর লাবণ্য প্রশ্ন করছে—কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে? টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, থাকবে থাকবে থাকবে।

আমি বললুম, অমিত রায় হচ্ছে একটি কথার তুবড়ি। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে তাকে দিয়ে যা বলিয়েছেন আপনি তা সত্য মনে করছেন কেন?

অক্রূরবাবু টেবিলে কিল মেরে বললেন, মোটেই পরিহাস নয়, একবারে খাঁটী সত্য। তিনি সর্বদর্শী কবি ছিলেন, দাম্পত্যের যা পরাকাষ্ঠা সেই তিন নম্বরেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তার ভাবার্থ হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা বাড়িতে বাস করবে, কালেভদ্রে দেখা করবে, তবেই তাদের প্রীতি স্থায়ী হবে, নববধূ চিরদিন নববধূ থাকবে।

—আপনি এ রকম দাম্পত্যের চেষ্টা করেছিলেন?

একবার মাত্র চেষ্টা করেছিলুম, তা বিফল হয়েছে। কিন্তু বিফলতার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের থিওরি ভুল, আমার নির্বাচনেই গলদ ছিল। যাই হক, আর চেষ্টা করবার প্রবৃত্তি নেই।

—ঘটনাটা বলবেন কি?

—শুনুন। আমার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের ফরমুলাটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে মনে হল, বাঃ, এই তো দাম্পত্যের শ্রেষ্ঠ মার্গ, চেষ্টা করে দেখা যাক না। আমার গোটাকতক বাড়ি আছে, ছোট-বড় ফ্ল্যাটে ভাগ করা, সেগুলো ভাড়া দিয়ে থাকি। একদিন একটি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। নাম বাগেশ্রী দত্ত, বয়স আন্দাজ চল্লিশ, কিন্নরবিদ্যাপীঠে গান বাজনা নাচ শেখান। দেখতে মন্দ নয়, আমার পছন্দ হল, ক্রমে ক্রমে আলাপও হল। ভাবলুম, এক নম্বর দাম্পত্যের আশা নেই, দু নম্বরেও রুচি নেই। এই বাগেশ্রীকে নিয়ে তিন নম্বরের চেষ্টা করা যাক। যখন আলাদা আলাদা বাস করব তখন তো আদর্শ আর মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। তার সঙ্গে দেখা করে বললুম, শোন বাগেশ্রী আমাকে বিয়ে করবে? আমি নিজের বসত বাড়িতে থাকব, তোমাকে আমার রসা রোডের বাড়িটা দেব, সেটাও বেশ ভাল বাড়ি। তোমাকে টাকাও প্রচুর দেব। তুমি নিজের বাড়িতে নিজের মতে চলবে, আমার পছন্দ অপছন্দ মানতে হবে না। মাসে এক দিন আমি তোমার অতিথি হব, আর এক দিন তুমি আমার অতিথি হবে। এই শর্তে বিয়ে করতে রাজী আছ? বাগেশ্রী বললে, এক্ষুনি। খাসা হবে, আমার বাড়িতে আমার মা দিদিমা মাসী দুই ভাই আর চার বোনকে এনে রাখব, এই ফ্ল্যাটটায় তো মোটেই কুলয় না। আমি বললুম, তা তো চলবে না, তোমার বাড়িতে আমি গেলে ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব যে। বাগেশ্রী বললে, তোমাকে সেখানে যেতে কে বলছে? নিজের বাড়িতেই তুমি থাকবে, আমিও তোমার কাছে থাকব। তুমি যা ন্যালাখ্যাপা মানুষ, আমি না দেখলে চাকর বাকর সর্বস্ব লোপাট করবে, বাপ রে, সে আমি সইতে পারব না। আমার পিসেমশায়ের ভাগনে প্রাণতোষ দাদাও আমার কাছে থাকবে, সেই সব দেখবে শুনবে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাগেশ্রীর মতলবটি শুনে আমি তখনই সরে পড়লুম। তার পর সে

তিন দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি।

আমি প্রশ্ন করলুম, উকিলের চিঠি পান নি?

অক্রূরবাবু বললেন, পেয়েছিলুম। উত্তরে জানালুম, ব্রীচ অভ প্রমিস হয় নি, আমি খেসারত এক পয়সাও দেব না। তবে বাগেশ্রী যদি ছ মাসের মধ্যে তার প্রাণতোষ দাদা বা আর কাকেও বিবাহ করে তবে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। বাগেশ্রী তাতেই রাজী হয়েছিল।

—সকলকেই যৌতুক দিলেন, শুধু সত্যভামা বেচারী ফাঁকে পড়লেন।

—তিনিও একবারে বঞ্চিত হন নি। পুরী থেকে চলে আসবার তিন মাস পরে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলুম—হুণ্ডাগড়ের খুড়া সাহেবের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ হচ্ছে। আমি একটি ছোট্ট পিকিনীজ কুকুর সত্যভামাকে উপহার পাঠিয়ে দিলুম, খুব খানদানী কুকুর, তার জন্য প্রায় আট শ টাকা খরচ হয়েছিল।

—এক দু তিন নম্বর সবই তো পরীক্ষা করেছেন, আপনার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম কি?

—কিছুই স্থির করতে পারি নি। আপনি তো বোদ্ধা লোক, একটা পরামর্শ দিন না।

—দেখুন অক্রূরবাবু, আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা হয়েছে। যা বলছি তাতে দোষ নেবেন না। আমি সামান্য লোক, শরীর বা মনের তত্ত্ব কিছুই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যে পুং-হরমোনের কথা বলেছেন তা হরেক রকম আছে। একটাতে দাড়ি গজায়, আর একটাতে গুঁতিয়ে দেবার অর্থাৎ আক্রমণের শক্তি আসে, আর একটাতে সর্দারি করবার প্রবৃত্তি হয়। তা ছাড়া আরও একটা আছে যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। বোধ হচ্ছে আপনার

সেইটের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। আপনি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অক্রূরবাবু বললেন, তাই করা যাবে।

আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তার পরে আর অক্রূর নন্দীর সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছি তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করে দ্বারকাধামে তপস্বিনী জগদম্বা মাতাজীর আশ্রমে বাস করছেন। ভদ্রলোক শেষকালে আত্মসমর্পণই করলেন। আশা করি তিনি শান্তি পেয়েছেন।

১৩৫৯

বদন চৌধুরীর শোকসভা

বদনচন্দ্র চৌধুরী একজন নবাগত নারকী, সম্প্রতি রৌরবে ভরতি হয়েছেন। যমরাজ আজ নরক পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে বদন হাত জোড় করে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যম বললেন, কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি।

—কবে এসেছ এখানে?

—আজ এক মাস হল।

—এর মধ্যেই ছুটি কেন? ছুটি নিয়ে কি করবে?

—আজ্ঞে, একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাই। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার জন্যে শোকসভা হবে, বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখে আসি।

যমালয়ের নিবন্ধক অর্থাৎ রেজিষ্ট্রার চিত্রগুপ্ত কাছেই ছিলেন। যম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই প্রেতটার প্রাক্তন কর্ম কি?

চিত্রগুপ্ত বললেন, এর পূর্বনাম বদনচন্দ্র চৌধুরী, পেশা ছিল ওকালতি তেজারতি আর নানা রকম ব্যবসা। প্রায় দশ বছর করপোরেশনের কাউন্সিলার আর পাঁচ বছর বিধান সভার সদস্য ছিল। এক মাস হল এখানে এসেছে, হরেক রকম বজ্জাতির জন্য হাজার বছর নরকবাসের দণ্ড পেয়েছে। এখন রৌরব নরকে গ-বিভাগে আছে। বর্তমান আচরণ ভালই। ঘণ্টা দুইএর জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। শোকসভায় ওর বন্ধু আর স্তাবকরা কে কি বলে তা শোনবার জন্য আগ্রহ হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—ও খবর পেলে কি করে যে আজ শোকসভা হবে?

—খবরের অভাব কি ধর্মরাজ, রোজ কত লোক মরছে আর সোজা নরকে চলে আসছে। তাদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছে।

যম আজ্ঞা দিলেন, বেশ, দু ঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দাও, সঙ্গে একজন প্রহরী থাকে যেন।

চিত্রগুপ্ত হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে কাকজঙ্ঘ, তুমি এই পাপীর সঙ্গে মর্ত্যলোকে যাও। দেখো যেন নতুন পাপ কিছু না করে। ঠিক দু ঘণ্টা পরেই ফেরত আনবে।

যে আজ্ঞে বলে যমদূত কাকজঙ্ঘ বদন চৌধুরীর হাত ধরে যমালয় থেকে বেরিয়ে গেল।

অনন্তর যমরাজ অন্য এক মহলে এলেন। তাঁকে দেখে ঘনশ্যাম ঘোষাল কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হলেন।

যম বললেন, তোমার আবার কি চাই?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি। একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাচ্ছি।

—তোমারও শোকসভা হবে নাকি? এখানে এসেছ কবে?

—দু বছর হল এখানে এসেছি, রৌরবে থ-বিভাগে আছি। আমার জন্যে কেউ শোকসভা করে নি প্রভু। বন্ধুরা বড়ই নিমকহারাম, আমার মৃত্যুর পর আমারই 'কালকেতু' কাগজে মোটে আধ-কলম ছেপেছিল, একটা ভাল ছবি পর্যন্ত দেয় নি। বদন চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁরই শোকসভায় যাবার জন্য ছুটি চাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা দেখে বললেন, তুমি অতি পাজী প্রেত, যমালয়ে এসেও মিছে কথা বলছ। তোমার কাগজে তো চিরকাল বদন চৌধুরীকে গালাগালি দিয়েছ।

—আজ্ঞে, সম্পাদকের কঠোর কর্তব্য হিসেবে তা করতে হয়েছে। কিন্তু আগে বদনের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, পরে মনান্তর হয়। এখন মরণের পর শত্রুতার অবসান হয়েছে, মরণান্তানি বৈরাণি, আমরা আবার বন্ধু হয়ে গেছি।

যম চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাক গে, দু ঘণ্টার জন্য একেও ছেড়ে দিতে পার। সঙ্গে যেন একটা প্রহরী থাকে।

চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূত ভৃঙ্গরোল ঘনশ্যামের সঙ্গে গেল।

পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় খুব লোকসমাগম হয়েছে। বেদীর উপরে আছেন সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায়-বাহাদুর গোবর্ধন মিত্র, তাঁর ডান পাশে আছেন প্রধান বক্তা প্রবীণ অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী, বাঁ পাশে আছেন বদনের বন্ধু ও সভার আয়োজক ব্যারিস্টার কোকিল সেন। আরও কয়েক জন গণ্যমান্য লোক কাছেই বসেছেন। বক্তাদের জন্য দুটো মাইক্রোফোন খাড়া হয়ে আছে এবং সভার বিভিন্ন স্থানে গোটা কতক লাউড স্পীকার বসানো হয়েছে।

বদন চৌধুরী তাঁর রক্ষী যমদূতের সঙ্গে বেদীর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘনশ্যাম ঘোষালকে দেখে বললেন, তুমি কি মতলবে এখানে এসেছ? সভা পণ্ড করতে চাও নাকি?

ঘনশ্যাম বললেন, আরে না না, পণ্ড করব কেন, তুমি হলে আমার পুরনো বন্ধু। তোমার গুণকীর্তন শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করতে এসেছি। যমরাজ আজ খুব সদয় দেখছি, দু-দুটো নারকীকে ছুটি দিয়েছেন।

প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর পিছনে বদন চৌধুরী এবং সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের পিছনে ঘনশ্যাম ঘোষাল দাঁড়ালেন। দুই যমদূত নিজের নিজের বন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে রইল। সভার কোনও লোক এই চার জনের অস্তিত্ব টের পেলে না।

প্রথমেই শ্রীযুক্তা ভূপালী বসুর পরিচালনায় সংগীত হল।—আজি স্মরণ করি পুণ্য চরিত বদনচন্দ্র চৌধুরীর, সেই স্বর্গগত রাজর্ষির; লোকমান্য অগ্রগণ্য কর্মযোগী ধর্মবীর।...ইত্যাদি। গান থামলে বাঁশি আর মাদলের করুণ সংগত সহযোগে কুমারী লুলু চ্যাটার্জি

একটি সময়োচিত শোকনৃত্য নাচলেন। তার পর সভাপতির আজ্ঞাক্রমে অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মৃত মহাত্মার কীর্তিকথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন।—

আজ যাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য আমরা এখানে এসেছি তিনি আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করে দিব্যধামে গেছেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে তাঁর আত্মা এই সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। স্বর্গত বদনচন্দ্র চৌধুরী আকারে চরিত্রে কর্মে ধর্মে এক লোকোত্তর মহীয়ান পুরুষ ছিলেন। তাঁর এই তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে দেখুন, কি বিরাট সৌম্য মূর্তি। নিবিড় শ্যামবর্ণ শালপ্রাংশু বিশাল বপু পদ্মপলাশ নেত্র, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু। তিনি একাধারে কর্মযোগী ধর্মযোগী আর জ্ঞানযোগী ছিলেন, যেমন উপার্জন করেছেন তেমনি বহুবিধ সৎকার্যে ব্যয়ও করেছেন। এক কথায় তিনি যে একজন খাঁটি রাজর্ষি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশা করি তাঁর উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁদের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।......এই রকম বিস্তর কথা আঙ্গিরসবাবু এক ঘণ্টা ধরে শোনালেন।

ঘনশ্যাম জনান্তিকে বললেন, আহা, কানে যেন মধু ঢেলে দিলে, নয় হে বদন?

তার পর একজন তরুণ কবি একটি গদ্য কবিতা পাঠ করলেন।

—আকাশের গায়ে সোনালী আঁচড়। কিসের দাগ ওটা? দিব্যরথের টায়ারের কর্ষণ। ওই সড়কে বদনচন্দ্র দেবযানে গেছেন। কে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে? উর্বশী না আফ্রোদিতি?...ইত্যাদি।

আরও কয়েক জন বক্তৃতা দেবার পর ব্যারিস্টার কোকিল সেন দাঁড়ালেন। পূর্বের বক্তারা যেটুকু বাকী রেখেছিলেন তা নিঃশেষে বিবৃত করে ইনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের একটি মর্মরমূর্তি দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপন করা হক,

এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা আর অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য অমুক অমুক অমুককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হক।

পিছনে বেঞ্চ থেকে একজন শ্রোতা বললেন, বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। মরা মানুষের নিন্দে করতে চাই না, কিন্তু তার মূর্তির জন্য আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না।

সভায় হাততালি হল, প্রথমে অল্প, যেন ভয়ে ভয়ে, তার পর খুব জোরে। গোলমাল থামলে কোকিল সেন বললেন, আমরা অশ্রদ্ধার দান চাই না, মৃত মহাপুরুষের পুত্রগণই সব খরচ দেবেন। বেদীর উপর থেকে একজন আস্তে আস্তে বললেন, হিয়ার হিয়ার।

অতঃপর সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের বক্তৃতার পালা। জজিয়তির সময় তিনি লম্বা লম্বা রায় দিয়েছেন, দু-চারটে ফাঁসির হুকুমও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সভায় কিছু বলতে গেলেই তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কোকিল সেনই লিখে দিয়েছেন। গোবর্ধনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ভাষণটি পড়বার উপক্রম করছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘনশ্যাম ঘোষাল তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন। যমদূত ভৃঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম নিমিষের মধ্যে গোবর্ধনবাবুর কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মরমে প্রবেশ করলেন।

মানুষের শরীরের মধ্যে যেটুকু ফাঁক আছে তাতে একটা আত্মা কোনও গতিকে থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুটো আত্মার জায়গা নেই। ঘনশ্যাম ঢুকে পড়ায় গোবর্ধনবাবুর নিজের আত্মাটি কোণ-ঠাসা হয়ে গেল, তাকে দাবিয়ে রেখে ঘনশ্যামের প্রেতাত্মা তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করলে।—

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আমার বেশী কিছু বলবার নেই। শেষের বেঞ্চের ওই ভদ্রলোকটি যা বলেছেন তা খুব খাঁটি কথা। বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। যত দিন বেঁচে ছিল তত দিন সে নিজের ঢাক নিজে পিটেছে। এখন সে মরেছে, তবু আমরা রেহাই পাই নি। তার খোশামুদে আত্মীয় স্বজন তাকে দেবতা

বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন আর ধাপ্পাবাজি চলবে না। বদন স্বর্গে যায় নি, নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর ছ্যাচঁড় হারামজাদা লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর অ্যাসেম্ব্লিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে, পারমিটে আর কালোবাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা—

বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাক-জঙ্ঘকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মাননীয় সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ হয়ে নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদন-চন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়স কাগজী গুণ্ডা কালকেতু-সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গোবেচারা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে—

সভাপতির জবানিতে ঘনশ্যাম বলিলেন, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। সেই বজ্জাত বদনার ভূতই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মশাইকে কাবু করে যা-তা বলছে—

আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর মারফত বদন চৌধুরী বললেন, আপনারা কি সেই ব্ল্যাকমেলার শয়তান ঘনা ঘোষালকে ভুলে গেছেন? ব্যাটা টাকা খেয়ে তার কাগজে কালোবাজারী চোরদের প্রশংসা ছাপত, টাকা না পেলে গাল দিত। মন্ত্রীদের ভয় দেখিয়ে সে নিজের ওয়ার্থলেস ছেলে মেয়ে শালা শালীদের জন্যে ভাল ভাল চাকরি যোগাড় করেছিল। স্বর্গত মহাত্মা বদন চৌধুরী তাকে ঘুষ দেন নি সেই রাগে ঘনা ঘোষালের ভূত আজ নরককুণ্ড থেকে উঠে এসে এখানে কুৎসা রটাচ্ছে। ওর দুর্গন্ধে সভা ভরে গেছে, টের পাচ্ছেন না? ভূতের কথায় কান দেবেন না আপনারা।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। একজন ষণ্ডা গোছের লোক একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বললে, ভূত টুত গ্রাহ্য করি না মশাই,

আমার নাম রামলাল সিংগি। ভূত আমার সম্বন্ধী, শাঁকচুন্নী আমার শাশুড়ী। আসল কথা কি জানেন—আমাদের গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু খুব মহাশয় লোক, কিন্তু দুজনেই বেশ টেনে এসেছেন, নেশায় চুচ্চুরে হয়ে বক্তিমে করেছেন। বদন চৌধুরী মরেছে, সবাই মিলে শোকসভা করছিল, এ তো বহুত আচ্ছা। তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি, দুটো হা-হুতোশ করবি, বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিবি, আউর ভি আচ্ছা। কিন্তু একি কাণ্ড, দু' হাজার লোকের সমানে মাতলামি করছিস! আরে ছ্যা ছ্যা। আমরা যা করি নিজের আড্ডায় করি, সভায় দাঁড়িয়ে এমন বেলেল্লাপনা করি না। হাঁ মশাই, হক কথা বলব।

এই সময়ে দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র আর আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বললে, বেরিয়ে এস শীগ্‌গির, দু ঘণ্টা কাবার হয়েছে। দুই প্রেতাত্মা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল, যমদূতরা তখনই তাদের নিয়ে উধাও হল।

শরীর থেকে প্রেত নিস্ক্রান্ত হওয়া মাত্র গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় এঁরা শীঘ্রই চঙ্গা হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বললেন, এই দুটো গেলাসের শরবত এঁরা খেয়েছিলেন। টেস্ট করা দরকার, নিশ্চয় কোনও বদ লোক ভাঙ কিংবা ধুতরো মিশিয়ে দিয়েছিল।

প্রেততত্ত্ববিশারদ হারাধন দত্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, সিদ্ধি গাঁজা ধুতরো নয়, মদও নয়, ওসব আমার ঢের পরীক্ষা করা আছে। এ হল আসল ভৌতিক ব্যাপার মশাই, আজ আপনারা স্বকর্ণে দুই প্রেতের ঝগড়া শুনেছেন। এর ফল বড় খারাপ, বাড়ি গিয়ে কানে একটু তুলসীপাতার রস দেবেন।

সভা ভেঙে গেল।

১৩৫৯

যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট

ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠক বসেছে। আজ বক্তৃতা দিলেন ডাক্তার হরিশ চাকলাদার, এম ডি, এল আর সি পি, এম আর সি এস। মৃত্যুর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বললেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা শ্বাস-রোধের পরেও আবার নিঃশ্বাস পড়ে, ফাঁসির পরেও কিছুক্ষণ হৃৎস্পন্দন চলতে থাকে, দুই হাত দুই পা কাটা গেলেও এবং দেহের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গেলেও মানুষ বাঁচতে পারে, ইত্যাদি। অতএব রাইগার মর্টিস না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় কুঁকড়ে আড়ষ্ট হয়ে না গেলেও একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

বক্তৃতা শেষ হলে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হল, কেউ কেউ নানা রকম মন্তব্যও করলেন। বক্তার সহপাঠী ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, ওহে হরিশ, তুমি বড্ড হাতে রেখে বলেছ। আসল কথা হচ্ছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শিবপুরের দশরথ কুণ্ডুর কথা শোন নি বুঝি? বুড়ো হাড়-কঞ্জুস, অগাধ টাকা, মরবার নামটি নেই। ছেলে রামচাঁদ হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নিঃশ্বাস বন্ধ হল, নাড়ী থামল, শরীর হিম হয়ে সিটকে গেল। ডাক্তার বললে, আর ভাবনা নেই রামচাঁদ, তোমার বাবা নিতান্তই মরেছেন। রামচাঁদ ঘটা করে বাপকে ঘাটে নিয়ে গেল, বিস্তর চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজালে, তার পর যেমন খড়ের নুড়ো জ্বেলে মুখাগ্নি করতে যাবে অমনি বুড়ো উঠে বসল। অ্যাঁ, এসব কি?—বলেই ছেলের গালে এক চড়।

সবাই ভয়ে পালাল। বুড়ো গটগট করে বাড়ি ফিরে এসে ঘটককে ডাকিয়ে এনে বললে, রেমোকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলুম, আমার জন্যে একটা পাত্রী দেখ।

সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ি একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। এঁর বয়স এখন নব্বুই, শরীর ভালই আছে, তবে কানে একটু কম শোনেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল দেখে আবোল-তাবোল বকেন। ইনি কোথায় ডাক্তারি শিখেছিলেন, কলকাতায় কি বোম্বাইএ কি রেঙ্গুনে, তা লোকে জানে না। কেউ বলে, ইনি সেকেলে ভি এল এম এস। কেউ বলে, ওসব কিছু নন, ইনি হচ্ছেন খাঁটী হ্যামার-ব্র্যাণ্ড, অর্থাৎ হাতুড়ে। নিন্দুকরা যাই বলুক, এককালে এঁর অসংখ্য পেশেণ্ট ছিল, সাধারণ লোকে এঁকে খুব বড় সার্জেন মনে করত। প্রায় পঁচিশ বৎসর প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ইনি এখন ধর্মকর্ম সাধুসঙ্গ আর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ক্লাবের বাড়িটি ইনিই করে দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ সদস্যগণ এঁকে আজীবন সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। সকলেই এঁকে শ্রদ্ধা করেন, আবার আড়ালে ঠাট্টাও করেন।

হাসির শব্দে ডাক্তার যদু গড়গড়ির ঘুম ভেঙে গেল। মিটমিট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কি?

হরিশ চাকলাদার বললেন, আজ্ঞে বেণী বলছে, ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা না হলে মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

যদু ডাক্তার বললেন, এই বেণীটা চিরকেলে মুখ্খু। বিলেত থেকে ফিরে এসে মনে করেছে ও সবজান্তা হয়ে গেছে। জীবনমৃত্যুর তুমি কতটুকু জান হে ছোকরা?

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত ছোকরা নন, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। হাত-জোড় করে বললেন, কিছুই জানি না সার, আমি তামাশা করে বলেছিলুম।

—তামাশা! মরণ-বাঁচন নিয়ে তামাশা!

যত্ন ডাক্তার চিরকালই দুর্মুখ, তাঁর অত পসার হওয়ার এও একটা কারণ। লোকে মনে করত, রোগী আর তার আত্মীয়দের যে ডাক্তার বেপরোয়া ধমক দেয় সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। বয়স বৃদ্ধির ফলে তাঁর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে, কিন্তু তাঁর কটুবাক্যে কেউ রাগ করে না। তাঁকে শান্ত করবার জন্য ডাক্তার অশ্বিনীকুমার সেন এম বি বি এস, কবিরত্ন, বৈদ্যশাস্ত্রী বললেন, সার, আজকের সাবজেক্ট সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

যত্ন ডাক্তার বললেন, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করবে কেন, আমার তো এখন ডোটেজ, যাকে বলে ভীমরতি।

অশ্বিনী সেন বললেন, সে তো মহা ভাগ্যের কথা। সাতাত্তর বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রির নাম ভীমরথী। আপনি তা বহুকাল পার হয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই দুস্তরা রাত্রি অতিক্রম করে যিনি বেঁচে থাকেন তাঁর প্রতিদিনই যজ্ঞ, তাঁর চলা-ফরা বিষ্ণুপ্রদক্ষিণের সমান, তাঁর বাক্যেই মন্ত্র, নিদ্রাই ধ্যান, যে অন্ন খান তাই সুধা। আপনার কথা বিশ্বাস করব না—সে কি একটা কথা হল ?

—কিন্তু ওই বেণী কাপ্তেন ? ও বিশ্বাস করবে ?

বেণী দত্ত আবার হাতজোড় করে বললেন, নিশ্চয় করব সার, যা বলবেন তা বেদবাক্য বলে মেনে নেবে।

যত্ন ডাক্তার প্রসন্ন হয়ে বললেন, নেহাত যদি শুনতে চাও তো শোন। কিন্তু তোমরা হয়তো ভয় পাবে।

বেণী দত্ত বললেন, যদি ভুতুড়ে কাণ্ড না হয় তবে ভয় পাব কেন সার ?

—না না, ভুতুড়ে নয়। কিন্তু যে কেস-হিস্টরি বলছি তা অতি ভীষণ ; অথচ এতে শুধু সার্জারির ক্লাইম্যাক্স নয়, প্রেমেরও পরাকাষ্ঠা পাবে।

—বাঃ, বিভীষিকা সার্জারি আর প্রেম, এর চাইতে ভাল কম্‌বিনেশন হতেই পারে না। আপনি আরম্ভ করুন সার, আমরা শোনবার জন্য ছটফট করছি।

ডাক্তার যত্নন্দন গড়গড়ি বলতে লাগলেন।—প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তোমাদের সাল্‌ফা পেনিসিলিন আর স্ট্রেপ্টো ক্লোরো না টেরা কি বলে গিয়ে—এ সব রেওয়াজ হয় নি। কারও বাড়িতে অপারেশন হলে আয়োডোফর্মের খোশবায়ে পাড়া শুদ্ধ মাত হয়ে যেত, লোকে বুঝত, হাঁ, চিকিৎসা হচ্ছে বটে। আমি তখন কালীঘাটে বাস করতুম। আমার বাড়ীর কাছে এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ থাকতেন, নাম বিঘোরানন্দ, তিনি কামরূপ-কামাখ্যায় আর তিব্বতে বহু বৎসর সাধনা করেছিলেন। ভক্তরা তাঁকে বিঘোর বাবা বা শুধু বাবাঠাকুর বলত। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, লম্বা চওড়া চেহারা, ঘোর কাল রং, একমুখ দাড়ি-গোঁফ দেখলেই ভক্তিতে মাথা নীচু হয়ে আসে। আমি তাঁর কার্বংকল অপারেশন করেছিলুম। একটু চাঙ্গা হবার পর তিনি একগোছা নোট আমার হাতে দেবার চেষ্টা করলেন। হাত টেনে নিয়ে আমি বললুম, করেন কি, আপনার কাছে কি আমি ফী নিতে পারি। বিঘোর বাবা একটু হেসে বললেন, তুমি না নিলেও ও টাকা তোমার হয়ে গেছে। কথাটার মানে তখন বুঝতে পারি নি, তাঁকে নমস্কার করে বিদায় নিলুম।

বাড়ী ফিরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা ভুর্জপত্রের মোড়কে দশটা গিনি রয়েছে। বুঝলুম বিঘোর বাবার দান তাঁর অলৌকিক শক্তিতে আমার পকেটে চলে এসেছে। তার পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতুম, নানা রকম আশ্চর্য তত্ত্বকথা শুনতুম। বছর খানিক পরে তিনি কালীঘাট থেকে চলে গেলেন, তাঁর একজন বড়লোক ভক্ত ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে একটি আশ্রম বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানেই গিয়ে রইলেন। একাই থাকতেন, তবে ভক্তরা মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেত।

তার পর দু বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, খবরও কিছু পাই নি। একদিন বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে এসেছি, একটা হার্নিয়া, দুটো অ্যাপেনডিক্স, তিনটে টিউমার, চারটে টনসিল, আর

গোটা পাঁচেক হাইড্রোসিল অপারেশন করে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি। নাওয়া খাওয়ার পর স্ত্রীকে বললুম, আমি বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘুমুব, খবরদার কেউ যেন না ডাকে। কিন্তু ঘুমুবার জো কি। ঘণ্টা খানিক পরেই ঠেলা দিয়ে গিন্নি বললেন, ওগো শুনছ, জরুরী তার এসেছে। বললুম, ছিঁড়ে ফেলে দাও। গিন্নী বললেন, এ যে বিঘোর বাবার তার। অগত্যা টেলিগ্রামটা পড়তে হয়, লিখছেন—এখনই চলে এস, মোস্ট আর্জেণ্ট কেস।

তখনই মোটরে রওনা হলুম। ব্যাগটা সঙ্গে নিলুম, তাতে শুধু মামুলী সরঞ্জাম ছিল, কি রকম কেস কিছুই জানা নেই সেজন্য বিশেষ কোনও ওষুধপত্র নিতে পারলুম না। শীতকাল, পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিঘোর বাবার আশ্রমটি ত্রিবেণীর কাছে কাগমারি গ্রামে গঙ্গার ধারে। খুব নির্জন স্থান, কাছাকাছি লোকালয় নেই। গাড়ি থেকে নেমে আশ্রমের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিঘোর বাবার সঙ্গে দেখা। পরনে লাল চেলির জোড়, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পায়ে খড়ম, হুকো হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, এস ডাক্তার। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এঁর কোনও ফ্যাসাদ হয় নি। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম, পেশেণ্ট কে? কি হয়েছে? বললেন, ঘরের ভেতর এস, স্বচক্ষে দেখলেই বুঝবে।

ঘরটি বেশ বড়, কিন্তু আলো অতি কম, এক কোণে পিলসুজের মাথায় পিদিম জ্বলছে, তাতে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে দৃষ্টি খুললে নজরে পড়ল—ঘরের এক পাশে একটা তক্তাপোশ, বোধ হয় বিঘোর বাবা তাতেই শোন। আর এ পাশে মেঝেতে একটা মাদুরের ওপর দুজন পাশাপাশি চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে, একখানা কম্বল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা, শুধু মুখ দুটো বেরিয়ে আছে। একজন পুরুষ, জোয়ান বয়স, বোধ হয় পঁচিশ, মুখে দাড়ি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আর একজন মেয়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি, কালো

কিন্তু সুশ্রী, ঝুঁটি-বাঁধা খোঁপা, সিঁথিতে সিঁদুর। জিজ্ঞাসা করলুম, স্বামী-স্ত্রী ?

বিঘোর বাবা উত্তর দিলেন, উঁহু প্রেমিক-প্রেমিকা।

—কি হয়েছে ?

—নিজেই দেখ না।

স্টেথোস্কোপটি গলায় ঝুলিয়ে হেঁট হয়ে কম্বলখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেললুম। তার পরেই এক লাফে পিছনে ছিটকে এলুম। কম্বলের নীচে কিচ্ছু নেই শুধু দুটো মুণ্ডু পাশাপাশি পড়ে আছে।

ভয়ও হল রাগও হল। বিঘোর বাবাকে বললুম, আমাকে এরকম বিভীষিকা দেখাবার মানে কি ? এ তো ক্রিমিন্যাল কেস, যা করতে হয় পুলিস করবে, আমার কিছু করবার নেই। কিন্তু আপনি যে মহাবিপদে পড়বেন। বাবা শুধু একটু হাসলেন। তার পর দেখলুম, পুরুষ-মুণ্ডুটা পিটপিট করে তাকিয়ে চিঁ চিঁ করে বলছে, মরি নি ডাক্তারবাবু। মেয়ে-মুণ্ডু টাও ডাইনে বাঁয়ে একটু নড়ে উঠল।

ডিসেকশন রুমে বিস্তর মড়া ঘেঁটেছি, হরেক রকম বীভৎস লাশ দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়ংকর পিলে-চমকানো ব্যাপার কখনও দৃষ্টি-গোচর হয় নি। আমি আঁতকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলুম, বিঘোর বাবা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, ওহে গড়গড়ি ডাক্তার, ভয় নেই, ভয় নেই, মুণ্ডু কাটা গেছে কিন্তু আমি এদের বাঁচিয়ে রেখেছি। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শুনেছ ? তার প্রভাবে এরা এখনও বেঁচে আছে।

সেই শীতে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এদের ধড় কোথায় গেল ?

—ওই যে, ওই কোণটায় কম্বলের নীচে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বিঘোর বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ধড় দুটোও বাঁচিয়ে রেখেছি, দেখ না তোমার চোঙা লাগিয়ে।

স্টেথোস্কোপের দরকার হল না। বুকে হাত দিয়ে দেখলুম হার্ট

আর লংস ঠিক চলছে, তবে একটু ঢিমে। বিঘোর বাবাকে বললুম, ধন্য আপনার সাধনা, বিলিতী বিজ্ঞানের মুখে আপনি জুতো মেরেছেন। কিন্তু এতই যদি পারেন তবে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা রেখেছেন কেন? জুড়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়।

বিঘোর বাবা বললেন, তা আমার কাজ নয়। আমি মৃতসঞ্জীবনী জানি, কিন্তু খণ্ডযোজনী বিদ্যা আমার আয়ত্ত নয়। ও হল মুচী বা ডাক্তারের কাজ। মুচী আবার লাশ ছোঁবে না, তার মোটরও নেই যে এই অবেলায় এত দূরে আসবে, তাই তোমাকে ডেকেছি। তুমি ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু সেলাই করে দাও।

আমি নিবেদন করলুম, বাইরের চামড়া সেলাই করলেই তো গলার হাড় আর নলী জুড়বে না। সার্কুলেশন রেস্পিরেশন এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সঙ্গে ব্রেনের যোগ কি করে হবে? সেরিব্রেশন অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলবে কি করে?

—কেন চলবে না? দুই ভুরুর মধ্যে আজ্ঞাচক্র ঘুরছে, তাতেই পঞ্চেন্দ্রিয় আর মনের ক্রিয়া চলছে। কাটা মুণ্ডু কথা কয়েছে তা তো তুমি স্বকর্ণে শুনেছ। কোনও চিন্তা নেই, তুমি সেলাই করে ফেল।

আমি বললুম, সেলাইএর উপযুক্ত বাঁকা ছুঁচ আর ক্যাটগট তো আমার সঙ্গে নেই, আর সেপসিস অর্থাৎ পচ বন্ধ করব কি করে?

—তোমাকে একটা গুনছুঁচ আর সুতলি দড়ি দিচ্ছি। পচবার ভয় নেই, দেখছ না, কাটা জায়গায় গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করে দিয়েছি। ওই কাদা সুদ্ধ সেলাই করে দাও।

বড়ই মুশকিলে পড়া গেল। আয়োজন কিছুই নেই, অ্যাসিস্টাণ্ট নেই, নার্স নেই, অপারেশন টেব্‌ল নেই, আলো পর্যন্ত নেই, অথচ বিঘোরানন্দ আমাকে এমন সার্জারি করতে বলেছেন, যা কস্মিন্ কালে কোথাও হয় নি—

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, হয়েছিল সার—গজানন গণেশ আর অজানন দক্ষ।

—আরে তারা হলেন দেবতা। আচ্ছা বেণী, আজকাল বড় অপারেশনের আগে তোমরা নাকি হরেক রকম টেস্ট করাও ?

—আজ্ঞে হাঁ। ব্লাড-প্রেশার, ব্লাড-কাউণ্ট, ব্লাড-শুগার, এক্স-রে ফোটো, কার্ডিওগ্রাম প্রভৃতি মামুলী রুটিন টেস্ট তো আছেই, তা ছাড়া নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন, টোটাল হেভি হাইড্রোজেন, বডিফ্যাটের আয়োডিন-ভ্যালু, হাড়ের ইলাস্টিসিটি, দাঁতের রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি, চামড়ার স্পেক্‌ট্রোগ্রাম—এসবও দেখা দরকার! অধিকন্তু রোগী আর তার আত্মীয়দের ইন্‌টেলিজেন্স কোশণ্ট টেস্ট করালে খুব ভাল হয়। শাঁসালো পেশেণ্ট হলে অন্তত বিশজন স্পেশ্যালিস্টের রিপোর্ট নেওয়া চাই। আর গরিব পেশেণ্টকে বলে দিই, উঁচু দরের চিকিৎসা তোমার সাধ্য নয় বাপু, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক খাও গিয়ে, না হয় পাঁচ সিকের মাহুলি ধারণ কর।

যদু ডাক্তার বললেন, আমাদের আমলে অত সব ছিল না, জিব আর নাড়ী, থার্মমিটার আর স্টেথোস্কোপ, এতেই যা করে। আর এই দুই পেশেণ্টের তো চূড়ান্ত অপারেশন মুণ্ডচ্ছেদ আগেই হয়ে গেছে, এখন টেস্ট করা বৃথা। যাক, তার পর যা হয়েছিল শোন। আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বিঘোরানন্দ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, অত মাথা ঘামিও না ডাক্তার, শুধু সেলাই করে দাও, বাকীটুকু কুলকুণ্ডলিনী নিজেই করে নেবেন।

আমি বললুম, বাবাঠাকুর, ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু সেলাই করা সার্জনের কাজ নয়, থিয়েটারের বাবা মুস্তাফার কাজ। বেশ, আপনার আজ্ঞা পালন করব, কিন্তু এই দু জনেরই হিস্টরি তো বললেন না, এদের এমন দশা হল কি করে ?

বিঘোরানন্দ এই ইতিহাস বললেন।—মেয়েটার নাম পঞ্চী, ওর বাপ হরি কামার বাঁশবেড়েতে থাকে। পঞ্চীর বিয়ে হয়েছে এই কাগমারি গ্রামের রমাকান্ত কামারের সঙ্গে। রমাকান্ত লোকটা অতি

দুর্দান্ত, দেখতে যমদূতের মতন, বদরাগী আর মাতাল। সে জমিদার-বাড়িতে প্রতি বৎসর নবমী পূজোয় এক শ আটটা পাঁঠা, দশটা ভেড়া, আর গোটা দুই মোষ এক এক চোপে কাটে। পঞ্চী তাকে বিয়ে করতে চায় নি, তার বাপ টাকার লোভে জোর করে বিয়ে দিয়েছে। রমাকান্ত বজ্জাত হলেও আমাকে খুব ভক্তি করে, আমার অনেক ফরমাশও খাটে। সে পঞ্চীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত, আমি ধমক দিয়েও কিছু করতে পারি নি। এ রকম ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাই হল। ওই যে পুরুষটার মুণ্ডু দেখছ, ওর নাম জটিরাম বৈরাগী—তোর দেশের লোক, নয় রে পঞ্চী?

পঞ্চীর মাথা ওপর নীচে একটু নড়ে উঠে সায় দিলে।

—এই জটি ছোকরা কীর্তন গায় ভাল, তার জন্য নানা জায়গা থেকে ওর ডাক আসত। জটিরাম মাঝে মাঝে এই গাঁয়ে এলে পঞ্চীর সঙ্গে দেখা করত, শেষটায় দু জনের প্রেম হল।

পঞ্চীর ভুরু আর ঠোঁট একটু কুঁচকে উঠল।

বিঘোরানন্দ বলতে লাগলেন—রমাকান্ত টের পেয়ে একদিন পঞ্চীকে বেদম মারলে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। তার পর গত কাল রাত একটার সময় আমি ঘুমিয়ে আছি এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। উঠে দরজা খুলে দেখি, রাম-দা হাতে রমাকান্ত। আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, সর্বনাশ করেছি বাবাঠাকুর, এক কোপে দুটোকে সাবাড় করেছি, বাঁচান আমাকে।

ব্যাপারটা এই।—আগের দিন রমাকান্ত পঞ্চীকে বলেছিল, আমি ভদ্রেশ্বর যাচ্ছি, চৌধুরী বাবুদের লোহার গেট তৈরি করতে হবে, চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব, তুই সাবধানে থাকিস। সব মিথ্যে কথা। রাত দুপুরে রমাকান্ত চুপি চুপি তার বাড়িতে এল এবং আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখলে পঞ্চী আর জটিরাম পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখেই রাম-দায়ের এক কোপে দুজনের মুণ্ডু কেটে ফেললে। তার পর ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে।

আমি তখনই রমাকান্তর সঙ্গে তার বাড়ি গেলুম। প্রথমেই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে পঞ্চী আর জটিরামের সূক্ষ্মশরীর আটকে ফেললুম। তার পর রমাকান্তকে বললুম, তুই ধড় দুটো কাঁধে করে আশ্রমে নিয়ে চল, মুণ্ডু দুটো আমি নিয়ে যাচ্ছি। আশ্রমে এসে রমাকান্ত আমার উপদেশ মত ধড় এক জায়গায় আর মুণ্ডু আর এক জায়গায় শুইয়ে দিলে। খণ্ডযোজনের আগে পর্যন্ত এই রকম তফাত রাখাই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি।

হরিশ চাকলাদার প্রশ্ন করলেন, সূক্ষ্মশরীরেও কি দু ভাগ হয়েছিল? মুণ্ডু আর ধড় দুটোই আলাদা হয়ে বেঁচে রইল কি করে?

যদু গড়গড়ি বললেন, তোমরা দেখছি কিছুই জান না। সূক্ষ্মশরীর ভাগ হয় না, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। তার অ্যানাটমি অন্য রকম। কতকটা অ্যামিবার মতন, কিন্তু ঢের বেশী ইলাস্টিক। ধড় আর মুণ্ডু তফাতে থাকলেও সূক্ষ্মশরীর চিটে গুড়ের মতন বেড়ে গিয়ে দুটোতেই ভর করতে পারে। তার পর বিঘোর বাবা যা বলছিলেন শোন।—

রমাকান্ত আবার আমার পায়ে পড়ে বললে, দোহাই বাবাঠাকুর, ফাঁসি যেতে পারব না, আমাকে বাঁচান। আমি বললুম, তুই এক্ষুনি তোর বাড়ি গিয়ে সব রক্ত ধুয়ে সাফ করে ফেলবি, তোর রাম-দা গঙ্গায় ফেলে দিবি, তার পর ত্রিবেণীতে গিয়ে এই টেলিগ্রামটা পাঠাবি, তার পর গায়েব হয়ে থাকবি। এক বৎসর পরে গাঁয়ে ফিরতে পারিস। রমাকান্ত বললে, কিন্তু লাশের গতি কি করবেন? পুলিস টের পেলেই তদারক করতে আসবে, আপনাকেই আসামী বলে চালান দেবে। আমি বললুম, তোকে তা ভাবতে হবে না, যা বলেছি তাই করবি। রমাকান্ত যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আমার সেই টেলিগ্রাম পেয়ে তুমি এসেছ। এখন আর দেরি নয়, রাত আটটায় অশ্লেষা পড়বে, তার আগেই সেলাই করে ফেল, নইলে জোড় লাগবে না।

গুন-ছুঁচ আর সুতলি নিয়ে আমি সেলাই করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলুম মুণ্ডু দুটো ফিসফিস করে আপসের মধ্যে কথা বলছে। ক্রমশ পঞ্চীর কণ্ঠস্বর চড়া হয়ে উঠল। বিঘোর বাবা ধমক দিয়ে বললেন, এই পঞ্চী, চেঁচাস নি। আরে গেল যা, এখনও ঘাড়ের ওপর মুণ্ডু বসে নি, এর মধ্যেই গলাবাজি শুরু করেছে!

পঞ্চী ডাকল, অ বাবাঠাকুর, একবারটি শুনুন তো।

বিঘোর বাবা উবু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে পঞ্চী আর জটিরামের কথা শুনলেন। তার পর আমাকে বললেন, ওহে ডাক্তার, এরা বলছে যে জটির ধড়ে পঞ্চীর মুণ্ডু আর পঞ্চীর ধড়ে জটির মুণ্ডু লাগাতে হবে। আমিও ভেবে দেখলুম এই ব্যবস্থাই ভাল।

স্তম্ভিত হয়ে আমি বললুম, এ কি রকম কথা বাবাঠাকুর! মুণ্ডু বদল হতেই পারে না, ভিয়েনা কনভেনশনে তার কোনও স্যাংশন নেই। এ রকম অপারেশন মোটেই এথিক্যাল নয়, আমাদের প্রোফেশনাল কোডের একদম বাইরে।

বিঘোর বাবা বললেন, আরে রেখে দাও তোমার কোড। পঞ্চী যদি নিজের ধড় আর মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে ওঠে তবে যে আবার রমাকান্তর কবলে পড়বে। মুণ্ডু বদল করলে এদের নব কলেবর হবে, কোনও গোলযোগের ভয় থাকবে না। আর একটা মস্ত লাভ এই হবে যে কখনও এদের ছাড়াছাড়ি হবে না। জটিরাম যদি আগে মরে তবে তার ধড় নিয়ে পঞ্চীর মুণ্ডু বেঁচে থাকবে। পঞ্চী যদি আগে মরে তবে তার ধড়টা জটির মুণ্ডু নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই পঞ্চীটা অত্যন্ত চালাক, এর মাথা থেকেই এই বুদ্ধি বেরিয়েছে। জটিরাম হচ্ছে হাঁদারাম। কালই আমি ভৈরব মতে এদের বিয়ে দেব, আমার আশ্রমেই এরা বাস করবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, ধড় আর মুণ্ডু বদল হলে কে পঞ্চী কে জটিরাম তা স্থির হবে কি করে?

বিঘোর বাবা বললেন, মাথা হল উত্তমাঙ্গ। মাথা অনুসারেই লোকের নাম হয়, ধড় যারই হক।

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত জনান্তিকে বললেন, কিন্তু গণেশ আর দক্ষের বেলায় তা হয় নি।

যত্ন ডাক্তার বলতে লাগলেন, এর পর আর আপত্তি করা চলে না, অগত্যা খণ্ডযোজনের জন্য প্রস্তুত হলুম। অ্যানাস্থেটিক দরকার হল না, বিঘোর বাবা মাথায় আর গলায় হাত বুলিয়ে অসাড় করে দিলেন। কিন্তু ভোঁতা গুন-ছুঁচ আর খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে চামড়া ফোঁড়া গেল না। বিঘোর বাবা বললেন, এই পিদিম থেকে রেড়ির তেল নিয়ে ছুঁচ আর সুতোয় বেশ করে মাখিয়ে নাও। তাই নিলুম। লুব্রিকেট করার পর কাজ সহজ হল, আধ ঘণ্টার মধ্যে মুণ্ডুর সঙ্গে ধড় সেলাই করে ফেললুম।

তার পর বিঘোর বাবাকে বললুম, এখন এদের শরীরে কিছু তাজা রক্ত পুরে দেওয়া দরকার, অভাবে পাঁচ শ সিসি গ্লুকোজ-স্যালাইন। কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে যোগাড় হবে কি করে? যদি নেহাতই বেঁচে থাকে তবে এর পর কিছুদিন লিভার এক্সট্রাক্ট, ব্লড্স পিল আর ভিগারোজেন খাওয়াতে হবে, নইলে গায়ে জোর পাবে না।

বিঘোর বাবা বললেন, ওসব ছাই ভস্ম চলবে না বাপু। এখন এরা সমস্ত রাত ঘুমুবে। কাল সকালে জেগে উঠলে ঝোলা গুড় দিয়ে খানকতক রুটি পথ্য করবে। তার পর বেলা হলে পক্ষী ভাত চড়িয়ে দেবে আর লঙ্কা-বাটা দিয়ে কাঁকড়া চচ্চড়ি রাঁধবে। তাতেই বলাধান হবে। জটিরাম আবার গাঁজা খায়। নয় রে জটে?

জটিরাম দাঁত বার করে বললে, হিঁ।

বিঘোর বাবা বললেন, বেশ তো, কাল সকালে আমার প্রসাদী ছিলিমে দু-এক টান দিস। এখন খাওয়া চলবে না, গলার জোড় পোক্ত হতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। এখন খেলে সেলাইএর

ফাঁক দিয়ে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। দেখ ডাক্তার, তোমাকে ফী কিছু দেব না, আজ তুমি যা দেখলে তারই দাম লাখ টাকা।

আমি উত্তর দিলুম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই বাবা। আমার চক্ষু কর্ণ সার্থক হয়েছে, অহংকার চূর্ণ হয়েছে, গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, আগাপাস্তলা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আমি ধন্য হয়ে গেছি। এখন অনুমতি দিন, আমি বাড়ি ফিরে যাই, দু ডোজ ব্রোমাইড খেয়ে নার্ভ ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়ি। এই বলে প্রণাম করে সেই রাত্রেই কলকাতায় ফিরে এলুম।

ডাক্তার অশ্বিনী সেন বললেন, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

ডাক্তর হরিশ চাকলাদার বললেন, ফ্ল্যাবারগাস্টিং মিরাক্‌ল!

ক্যাপ্টেন বেণী দত্ত বললেন, অতি খাসা। পরকীয়াপ্রেমের এমন পারফেক্ট পরিণাম বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই, আর সিম্‌বায়োসিসের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বায়োলজির কেতাবেও পাওয়া যায় না। আচ্ছা সার, নায়ক-নায়িকার তো একটা হিল্লে লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু রমাকান্তর কি হল?

ডাক্তার যদু গড়গড়ি বললেন, শুনেছি এক বছর পরে সে চুপি চুপি বিঘোর বাবার আশ্রমে এসেছিল, কিন্তু জটি আর পঞ্চীকে দেখে ভূত-পেত্নী মনে করে তখনই ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ।

—আহা, তার জন্য দুঃখ হয়, বেচারা খুন করেও বউকে শায়েস্তা করতে পারল না। নামটাই যে অপয়া, ডাইনে বাঁয়ে যে দিক থেকে পড়ুন পাবেন রমাকান্ত কামার। আমাদের সুবল বসুও তার দুমুখো নামের জন্য উন্নতি করতে পারছে না। আচ্ছা, তার পর আর কখনও আপনি পঞ্চী আর জটিরামকে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম। দু বছর পরে বিঘোর বাবা চিঠি লিখলেন, মাঘ

সংক্রান্তির দিন জটি-পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশন, তুমি অবশ্যই আসবে। বাবার যখন আদেশ তখন যেতেই হল।

—কি দেখলেন গিয়ে ?

—দেখলুম, বিঘোর বাবা ঠিক আগের মতন লাল চেলির জোড় পরে দাঁড়িয়ে হুকো টানছেন, পঞ্চী তার মস্কিউলার মদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।

১৩৫৯

রটন্তীকুমার

স্কুলের ছুটির পর মানিক বললে, এই রটাই, আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ি আসবি চায়ের নেমন্তন্ন।

রটাই বললে, আজ তোর জন্মদিন বুঝি ?

—দূর বোকা, জন্মদিন বছরে ক বার হয় ? এই তো সেদিন হয়ে গেল, ভোজ খেয়ে তোর পেটের অসুখ হল, মনে নেই ?

—তবে কিসের নেমন্তন্ন ভাই ?

—আজ বিকেলে দিদিমণির বর আসবে।

—তোর রুবি-দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে নাকি ?

—দূর বোকা, বিয়ের এখন কিছুই ঠিক হয় নি। আজ খগেনবাবু দিদিমণির সঙ্গে ভাব করতে আসবে। যদি খুব ভাব হয়ে যায় তবেই বিয়ে হবে।

রটাই সমঝদারের মতন বললে, অ। সে নিমন্ত্রণে যেতে সর্বদাই প্রস্তুত, উপলক্ষ্য যাই হক, ভাব বা আড়ি, বিয়ে বা বউভাত, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধ। মুড়ি-ছোলাভাজা, কেক-বিস্কুট, কচুরি-সন্দেশ, পোলাও-কালিয়া, কিছুতেই তার আপত্তি নেই।

বিকালে পৌনে পাঁচটার সময় রটাই যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন হয়ে মানিকদের বাড়ি যাচ্ছে এমন সময় তার বড়দিদি বললে, এই রটাই, এই টিফিন ক্যারিয়ারটা নে, মানিকের মাকে দিবি। সাবধানে নিয়ে যাবি, ফেলে দিস নি যেন। খালি হলে আসবার সময় ফেরত আনবি।

টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে রটাই বললে, উঃ কি ভারী। কি কি আছে বড়দি ? বাদামের নিমকি আর মাছের কচুরি আর মাংসের প্যাটি আর পেস্তার বরফি আর ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা ?

—হ্যাঁ হাঁ সব আছে। মানিকদের বাড়ি গিয়ে তো দেখতেই পাবি, খেতেও পাবি।

—ওদের বাড়িতে খাওয়ানো হবে তো তুমি খাবার করে দিলে কেন? বল না দিদিমণি!

—আঃ, তোর অত খোঁজে দরকার কি। মানিকের মা তৈরী করে দিতে বলেছেন তাই দিয়েছি।

মানিকদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। সেখানে গিয়ে মানিকের মাকে টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে রটাই বললে, কই মাসীমা, রুবি-দির জামাইবাবু আসে নি?

মানিকের মা বললেন, ছেলের কথার ছিরি দেখ! দশ বছরের ঢেঁকি, এখনও বুদ্ধি হল না। ও তো পানুর বন্ধু খগেন, চা খাবার জন্যে আসতে বলেছি। খবরদার রটাই, তার সামনে অসভ্যতা করিস নি যেন।

সজোরে ঘাড় নেড়ে রটাই জানালে যে অসভ্যতা করার ছেলে সে নয়। মানিক তাকে বললে, দাদার সঙ্গে খগেনবাবু সাড়ে পাঁচটায় আসবে, ততক্ষণ ও ঘরে ক্যারম খেলবি আয়।

যথাকালে মানিকদের দাদা পানু বা পান্নালালের সঙ্গে শ্রীমান খগেনের আগমন হল। সুশ্রী চেহারা, শৌখিন পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় যে বড়লোক, নিজের মোটরে এসেছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, তার বাপের অভ্র আর কয়লার ব্যবসায়ে কাজ করছে। রূপে গুণে বিদ্যায় টাকায় এমন পাত্র দুর্লভ, মানিকের মা তাকে জামাই করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলে পানুর সঙ্গে খগেনের আলাপ হয়েছে, মায়ের অনুরোধে পানু তার বড়লোক বন্ধুকে ধরে এনেছে।

চায়ের টেবিলে ছ জন বসেছেন—প্রধান অতিথি খগেন, প্রধান

আকর্ষণ রুবি, প্রধান বক্ত্রী তার মা, দুই ভাই পানু আর মানিক, এবং মানিকের বন্ধু রটাই। বাড়ির কর্তা অনেক দেরিতে অফিস থেকে ফিরবেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করেছেন।

যথারীতি হালকা আলাপ আর অকারণ হাসি চলতে লাগল। রুবি গোটাকতক গান গাইলে। তার মা বললেন, জান বাবা খগেন, ইনফ্লুএঞ্জা হবার পর থেকে রুবির গলাটা একটু ধরে গেছে, নইলে বুঝতে কি চমৎকার গায়। রীতিমত ওস্তাদের কাছে শেখা কিনা। এই ছবিটি দেখ, রুবি এঁকেছে। নাম দিয়েছে—মত্ত দাদুরী। আকাশে ঘনঘটা, সরোবর জলে টুইটুম্বুর, তাতে রক্ত করবী ফুটেছে—

রুবি বললে, রক্ত কুমুদ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রক্ত কুমুদ ফুটেছে। সরোবরের তীরে সারি সারি দাদুরীরা সব বসে আছে, গলা ফুলিয়ে প্রাণপণে ডাকছে, তাদের ছাতি যাওত ফাটিয়া। অবনী ঠাকুরকে দেখাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি রইলেন না তো। আর এই দেখ, কি সব সুন্দর সুন্দর বুনেছে। এই টেবিল ক্লথটি হচ্ছে অজন্টা প্যাটানের, চারিদিকে পদ্মফুল আর মধ্যিখানে একটি মুরগি। খুব এক্সেলেন্ট করেছে না? ওরে পানু, খগেনের ছাতির মাপটা নে তো, রুবি ওর জন্যে একটা ভেস্ট বুনে দেবে। জান খগেন, সবাই বলছে, মেয়ের যখন অত রূপ তখন মিস ইণ্ডিয়া কম্‌পিটিশনে দাঁড়াচ্ছে না কেন। আমার খুব মত ছিল, কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। মস্ত বড় অফিসার হলে কি হবে, জন্ম যে অজ পাড়া গাঁয়ে।

মানিক তার ভাবী ভগিনীপতিকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করতে লাগল।—আপনার এই ঘড়িটায় দম দিতে হয় না বুঝি? এই ফাউণ্টেন পেনটার দাম কত? মোটর গাড়িতে রেডিও বসান নি, কেন? আপনার সিগারেট কেসটা দেখান না, বিলাতে কিনেছেন বুঝি? আপনার ক্যামেরা আছে? আমাদের ছবি তুলে দেবেন? ইত্যাদি।

খগেনকে রটাইএর খুব পছন্দ হল। সে তিন-চার বার আলাপের চেষ্টা করলে, কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে রুবি আর তার মা কটমট করে তার দিকে তাকালেন, অগত্যা সে চুপ করে খাবারের অপেক্ষায় বসে রইল। আজ রটাইকে নিমন্ত্রণ করতে রুবির মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে খাবার বয়ে আনবে, তাদের বাড়িতে চাকরের অভাব, সেজন্য নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে খেতে বলা হয়েছে।

অবশেষে খাবার এল। বাড়ির চাকর একটা ময়লা হাফপ্যান্টের ওপর ফরসা হাত-কাটা শার্ট পরে খাবার আর চায়ের ট্রে একে একে নিয়ে এল। সে মেদিনীপুরের লোক, কিন্তু রুবির মা তাকে 'বোই' সম্বোধন করে হিন্দীতে ফরমাশ করতে লাগলেন। রুবি পরিবেশন করলে। রটাই সব অনাদর ভুলে গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে খেতে লাগল।

রুবির মা বললেন, কই, কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা খগেন, আরও দুটো কচুরি আর প্যাটি দিই। বল্ না রে রুবি ভাল করে খেতে, এত খেটে সব তৈরী করলি, না খেলে মেহতন সার্থক হবে কেন। সব জিনিস কেমন হয়েছে বাবা?

খগেন বললে, অতি চমৎকার হয়েছে, এমন খাবার কোথাও খাই নি।

উৎফুল্ল হয়ে রুবির মা বললেন, সত্যি? তোমার জন্যে রুবি সমস্ত নিজের হাতে তৈরি করেছে, ওর রান্নার হাত অতি চমৎকার।

রটাইএর মুখ কচুরিতে বোঝাই, তবু সে চুপ করে থাকতে পারল না, মুখের ডেলাটা এক পাশে ঠেলে রেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, বা রে, ওসব তো আমার বড়দি করেছে।

রুবির মা গর্জন করে বললেন, চুপ কর্ অসভ্য ছেলে! যা জানিস না তা বলতে আসিস কেন?

কচুরি-পিণ্ড কোঁত করে গিলে ফেলে রটাই বললে, বাঃ, আমিই তো বাড়ি থেকে সব নিয়ে এলুম।

রুবির মুখের তিন স্তর গোলাপী প্রলেপ ভেদ করে বেগনী আভা ফুটে উঠল। তার মা রেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পানু, এই হতভাগা হিংসুটে ছোঁড়াটাকে মানিকের পড়বার ঘরে রেখে আয় তো। মিথ্যে কথার ঢেঁকি, ভদ্রসমাজে কখনও মেশে নি, কেবল বড়াই করতে জানে। তখনই বারণ করেছিলুম ওটাকে আনিস নি, তা মানুকে তো শুনবে না, ভারী গুণের বন্ধু যে।

পান্নালাল রটাইএর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, তোর তো খাওয়া হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যা রটাই।

রটাই বললে, খাওয়া তো কিছুই হয় নি, এখনও প্যাটি নিমকি বরফি ল্যাংচা আর চা বাকী রয়েছে। খালি হলে টিফিন ক্যারিয়ারটাও তো নিয়ে যেতে হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি সব এনে দিচ্ছি। তুই এখানে একলাটি বসে চুপচাপ খেয়ে নিবি, তার পর সোজা বাড়ি চলে যাবি, কেমন ?

রটাই ঘাড় নেড়ে জানালে যে তাতেই সে রাজী। অত ধমক খাওয়ার পরেও তার খিদে ঠিক আছে, কিন্তু পান্নালাল তাকে যা এনে দিলে তা যথেষ্ট নয়, যেটা আসল জিনিস, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, তাই তাকে দেওয়া হয় নি। যা জুটল তাই সে অনেকক্ষণ ধরে খেলে, তার পর কাকেও কিছু না বলে বাড়ি রওনা হল।

রটাইএর বেফাঁস কথার ফলে ও ঘরের চায়ের আসরটি একেবারে মাটি হয়ে গেল, আলাপ মোটেই জমল না, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন তাও কিছুমাত্র অগ্রসর হল না। রুবি গোঁজ হয়ে বসে রইল, তার মুখ থেকে হাঁ-না ছাড়া কোনও কথা বেরুল না। ওই বজ্জাত রটাইটাকে সে যদি হাতে পায় তো কুচি কুচি করে কেটে ফেলে। আর মায়ের বা কি আক্কেল, তাঁর মেয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছে এ কথা ইশারায় বললেই তো চলত, ঢাক পিটিয়ে জানাবার কি দরকার ছিল ? কেবল বকবক করে এলোমেলো কথা বলতে

পারেন, ওই শয়তান ছোঁড়াটা যে জলজ্যান্ত সামনে বসে রয়েছে সে হুঁশই হল না।

অপ্রিয় ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য রুবির মা অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন, পান্নালালও তারও বন্ধুকে খুশী করবার জন্য নানা রকম রসিকতা করতে লাগল। খগেন হাসিমুখে অল্পস্বল্প কথা বলে কোনও রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখলে। খানিক পরে সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আজ উঠি মাসীমা, আর এক জায়গায় দরকার আছে। ওঃ, যা খাইয়েছেন তা হজম হতে তিন দিন লাগবে।

রুবির মা বললেন, কি আর খেয়েছ বাবা, ও তো কিছুই নয়। আবার এসো, সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয় যখন তোমার সুবিধে। তুমি তো ঘরের ছেলে, যা ঘরে থাকবে তাই খাবে।

আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ঝুঁকে নমস্কার করে খগেন বিদায় নিলে।

কিছু দূর গিয়েই সে দেখতে পেলে, একটি ছেলে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে চলেছে। গাড়ি থামিয়ে খগেন ডাকল, ও খোকা! রটাই থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার নাম কি ভাই?

—রটাই।

—এস, গাড়িতে ওঠ, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

রটাই উঠে বসল। খগেন বললে, তুমি বুঝি খুব রটিয়ে বেড়াও তাই রটাই নাম?

রটাই উত্তর দিলে, দূর তা কেন। আমার ভাল নাম শ্রীরটন্তী-কুমার রায়চৌধুরী, আমি রটন্তীপূজার দিন জন্মেছিলুম কিনা তাই আমার দাদামশাই ওই নাম রেখেছেন। আর বড়দির নাম জয়ন্তীমঙ্গলা, ছোড়দির নাম প্রত্যঙ্গিরা।

—উঃ, তোমাদের খুব জাঁকালো নাম দেখছি? বাড়ি কত দূরে? কোন্ ক্লাসে পড়? বাড়িতে কে কে আছেন?

রটাই জানালে, তার বাড়ি বেশী দূরে নয়। সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাবা রেলে কাজ করেন, বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়, মাঝে মাঝে আসেন। বাড়িতে আছেন তার মা, দুই দিদি আর সে নিজে। দিদিদের এখনও বিয়ে হয় নি। তা ছাড়া ভুঁদো কুকুর আর রুপুসী বেরাল আছে। ভুঁদোটা ভীষণ লোভী, সেদিন মালপো চুরি করে খেয়েছিল। কিন্তু রুপুসী হচ্ছে ভদ্র মহিলা, খেতে না বললে খায় না। শীঘ্রই তার বাচ্চা হবে, খগেনের যদি দরকার থাকে তবে যত-গুলো ইচ্ছে নিতে পারে।

রটাই মোটেই লাজুক নয়, অপরিচয়ের জন্য যেটুকু সংকোচ ছিল তা অল্পক্ষণ আলাপে সহজেই কেটে গেল। সে প্রশ্ন করলে, রুবিদির সঙ্গে আপনার ভাব হল?

খগেন হেসে বললে, কই আর হল। চায়ের টেবিলে তুমি যে বোমা ছুড়েছ তাতে তো সবাইকার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন? আমার কিন্তু কিচ্ছু দোষ নেই।

—না না, তুমি খুব ভাল ছেলে, শুধু একটু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, যা বলতে নেই তাই বলে ফেলেছ।

আমি তো সত্যি কথাই বলেছি। আমার বড়দির কাছেই শুনেছি যে মানিকের মা বলেছিলেন তাই খাবার তৈরি করে দিয়েছে।

—না হে না। তুমি কিচ্ছু জান না, রুবি-দিই সব নিজের হাতে তৈরি করেছে।

—কখ্‌খনো নয়, আপনিই কিচ্ছু জানেন না। রুবি-দি শুধু আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারে। ব্যাঙের ছবিটা তার আঁকা বটে, কিন্তু সেই যে পদ্মফুল আর মুরগির ছবিওয়ালা টেবিল ক্লথটা আপনাকে দেখিয়েছে সেটা রুবি-দি তৈরি করে নি। মানিকদের

বাড়ির পাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাসের কেল্টে থাকে, তারই পিসীমা ওটা বানিয়েছে। আমি ওদের বাড়ি যাই কিনা, তাই সব জানি।

—উঃ, তুমি অতি সাংঘাতিক ছেলে, আঁফাঁ তেরিবল! কিন্তু তোমার সেই জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিই যে খাবার তৈরি করেছেন তার প্রমাণ কি? তোমাদের বাড়ি গেলে আমাকে ওই রকম খাওয়াতে পারবে?

—খুব পারব, না পারলে আমার দু কান মলে দেবেন।

—আর যদি পার তবে তুমি আমার দু কান মলে দেবে নাকি?

—দূর আপনি যে বড়। যদি হেরে যান তো আমাকে ফাইন দেবেন।

—কত ফাইন দিতে হবে?

একটু ভেবে রটাই বললে, একটা টাকা দেবেন।

—মোটে একটা টাকা দিলেই হবে?

—দু টাকা যদি দেন তো আরও ভাল, আমার দু কানের বদলে আপনার দু টাকা। এখুনি চলুন না আমাদের বাড়ি।

—পাগল নাকি! এই মাত্র এত খেয়ে আবার তোমাদের বাড়িতে খাব কি করে?

—আচ্ছা, পরশু রবিবার, সেদিন বিকেলে ঠিক আসবেন বলুন।

—তুমিই বাড়ির কত্তামশাই নাকি? ওখানে কেউ তো আমাকে চেনেন না, যদি গায়ে পড়ে খেতে যাই তবে যে আমাকে অসভ্য হ্যাংলা মনে করবেন।

—ইশ, মনে করলেই হল! আমি তো আপনাকে চিনি, আমার কথায় যদি আপনি আসেন তবে কেউ কিচ্ছু মনে করবে না। কিন্তু দেখুন, আমরা হচ্ছি গরিব, অত রকম খাবার হবে না। মানিকের মা মাছ মাংস পেস্তা বাদাম এই সব পাঠিয়ে দিয়েছিল তাই বড়দি করে দিয়েছে। রবিবার বিকেলে ঠিক আসবেন কিন্তু।

—বেশ, তুমি যখন নিমন্ত্রণ করছ তখন যাব। কিন্তু খাবার মোটেই তৈরি করবে না, শুধু চা।

বাঃ, তা হলে আপনার বিশ্বাস হবে কি করে?

—কেউ খাবার করতে জানে কি জানে না তা আমি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি। আর একটা কথা।—ওখানে যে কাণ্ডটি বাধিয়েছিলে তা যেন তোমাদের বাড়িতে ব'লো না, তা হলে আমি ভারী লজ্জায় পড়ব। আর দেখ, মানিককে সেদিন ডেকো না যেন।

—নাঃ, মানিকের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি। আজ অতক্ষণ তার পড়বার ঘরে একলাটি রইলুম একবারও এল না।

—আড়ি করবে কেন, শুধু পরশু দিন তাকে তোমাদের বাড়িতে এনো না। আচ্ছা রটন্তীকুমার, তোমার বড়দির তো খুব জমকালো নাম, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী, খাবার তৈরিতেও ওস্তাদ, তিনি দেখতে কেমন?

—খুব সুন্দর। রুবি-দি এক ঘণ্টা ধরে রং মেখে তবে ফরসা হয়, কিন্তু বড়দিকে কিছুই করতে হয় না। আর তার গানের কাছে রুবিদির গান যেন কাগ ডাকছে। কিন্তু বললেই বড়দি গায় না, আপনি যদি খুব অনেক বার অনেক করে বলেন তবেই গাইবে। আর জানেন, বড়দি এম এ পাস, ছোড়দি আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে, আর রুবি-দি তিন বার ফেল করেছে। বড়দির শীগ্‌গির একটা চাকরি হবে। দাদামশাই কি বলেন জানেন? লক্ষ্মী আর সরস্বতী আর অন্নপূর্ণা একসঙ্গে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হয় বড়দি হচ্ছে তাই।

—আর তোমাকে কি বলেন?

—হিহি করে হেসে রটাই বললে, সে ভারী বিশ্রী। আমাকে বলেন, ন্যাজ-কাটা বীর হনুমান।

—বিশ্রী কেন, হনুমানের মতন সচ্চরিত্র দেবতা কটা আছে? আমার কি মনে হয় জান? তুমি হচ্ছ নারদ মুনি, পাকা দালাল,

মানিকের মা তোমার কাছে একবারে খুকী, কম্‌পিটিশনে দাঁড়াতেই পারেন না। এইটে তোমাদের বাড়ি তো? আচ্ছা, এস ভাই, পরশু আবার দেখা হবে।

বাড়িতে এসে রটাই বললে, দিদিমণি, মস্ত খবর, খগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছি, পরশু বিকেলে চা খেতে আসবেন।

জয়ন্তী বললে, খগেনবাবু আবার কে?

—ওই যে, আজ যিনি মানিকদের বাড়ি চা খেলেন। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। উঃ, মস্ত বড় মোটরকার। তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না, শুধু মাছের কচুরি, মটন প্যাটি, ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা আর চা।

জয়ন্তী তার মাকে ডেকে বললে, তোমার খোকার আক্কেল দেখ মা। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে কোথাকার কে খগেনবাবু না বগেনবাবুকে নেমন্তন্ন করেছে। আবার আমাকে খাবারের ফরমাশ করছে। খাবার খুব সস্তা, না? তার খরচ তুই দিবি?

রটাই হাত নেড়ে বললে, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না দিদিমণি, আমি তোমাকে হুটো টাকা দেব। কিন্তু আজ নয়, সেই পরশুর পরে তরশু দিন দেব।

—তুই টাকা পাবি কোথা থেকে? মানিকের মায়ের কাছ থেকে মুটেভাড়া আদায় করবি নাকি?

—ধেৎ। তোমাকে সে পরে বলব, এখন বলতে মানা।

—অচেনা উটকো লোকের জন্য আমি খাবার করতে পারব না।

—অচেনা কেন হবে, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে যে। তাঁর নিজের মোটরে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন।

—তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছিস বুঝি?

রটাইএর মা বললেন, তা খোকা যখন নেমন্তন্ন করে ফেলেছে

তখন আসুক না খগেনবাবু। কিছু খাবার তৈরি করিস, বাজারের জিনিস দেওয়া তো ভাল দেখাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেল বেলায় খগেন রটাইদের বাড়ি উপস্থিত হল। বসবার ঘরের সজ্জা অতি সমান্য, শুধু তক্তাপোশের ওপর ফরাশ পাতা। কিন্তু আদরের ত্রুটি হল না, রটাইএর মা খগেনের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন আলাপ করলেন। আজকের আসরে প্রধান বক্তা রটাই, সে তার নতুন বন্ধুকে নিজের সম্পত্তির মত দখল করে রইল এবং একটানা কথা বলে যেতে লাগল।

একটু পরে জয়ন্তী আর তার ছোট বোন খাবার নিয়ে এল। খগেন বললে, রটন্তীকুমার, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়, আমি বারণ করেছিলুম তবু তুমি এতসব খাবার করিয়েছ।

রটাই বললে, বাঃ, শুধু বুঝি আপনার জন্যে বড়দি খাবার করেছে, আমিও খাব যে। সেদিন মানিকদের বাড়ি আমার তো ভাল করে খাওয়াই হয় নি।

জয়ন্তী বললে, পেটুক কোথাকার!

কচুরি চিবুতে চিবুতে খগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রটাই চুপি চুপি বললে, এখন আপনার বিশ্বাস হল তো? হুও, হু টাকা হেরে গেলেন! আজই দেবেন কিন্তু। দেখুন, এইবারে দিদিমণিকে গান গাইতে বলুন না।

খগেন চুপি চুপি উত্তর দিলে, উঁহু, আজ নয় আর এক দিন হবে এখন।

রটাইএর মা বললেন, এই খোকা ওঁকে বিরক্ত করছিস কেন, খেতে দিবি না?

জয়ন্তী বললে, দেখ না, জোকের মতন ধরে আছে।

খগেন সহাস্যে বললে, না না, বিরক্ত করে নি। ও আমাকে খুব

স্নেহ করে, যদিও মোটে দশ মিনিটের পরিচয়। রটাই হচ্ছে অত্যন্ত দিদিভক্ত, আমার কানে কানে আপনার একটু গুণগান করছিল।

জয়ন্তী বললে, ভারী অসভ্য হয়েছিস তুই।

রটাই বললে, কই আবার অসভ্য হলুম! শুধু বলছিলুম, তুমি খুব ভাল খাবার করতে পার। তা বুঝি অসভ্যতা হল? আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খাবার পার না, গান পার না, সেতার পার না, মোটেই কিচ্ছু পার না। জান বড়দি, খগেনবাবুর মোটরে কিছু শব্দ হয় না, ঝাঁকুনিও লাগে না।

খগেন বললে, চল না, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। তার পর তোমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব এখন।

মহা উল্লাসে রটাই হনুমানের মতন হুপ শব্দ করে গাড়িতে চড়ে বসল। তার মা আর দিদিদের কাছে বিদায় নিয়ে এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খগেন চলে গেল।

যেতে যেতে রটাই খগেনকে বললে, দেখুন, রুবি-দি হচ্ছে একদম বাজে, তার মা আরও বাজে। আপনি আমার বড়দির সঙ্গেই ভাব করুন।

খগেন বললে, নেহাৎ বাজে কথা বলনি রটাই। কেমন করে ভাব করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দিতে পার? ওঃ হো, তোমার বাজি জেতার কথা ভুলে গিয়েছিলুম, এই নাও।

টাকা দুটো পকেটে পুরে রটাই বললে, আমরা ইস্কুলে কি করে ভাব করি জানেন? মনে করুন একটা নতুন ছেলে এসেছে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই তোর নাম কিরে? সে বললে, হাবলু। আমি তার পিঠ চাপড়ে বললুম, হাবলু, তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল, এই নে দুটো লাল কাঁচের গুলি। আবার আড়ি

করা আরও সহজ, দাড়িতে তিন বার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলতে হয়—আড়ি আড়ি আড়ি।

-- খাসা নিয়ম। তোমার রুবি-দির সঙ্গে ওই রকমে ভাব হতে পারে, তিনি মুখিয়ে আছেন কিনা। কিন্তু তোমার জয়ন্তীমঙ্গলা দিদিমণিটি অন্য রকমের, পিঠ চাপড়ে ভাব করা যাবে না। তাঁর মতন রমণীর মন সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। যা হক, আমি চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু হাজার বছর সাধনা করে তা চলবে না, আমার বাবা মা বিয়ের জন্য তাড়া লাগিয়েছেন যে। বলেছেন, যাকে খুশি বিয়ে কর, কিন্তু বোকার মতন পছন্দ ক'রো না, আর বেশী দেরি না হয়; মাঘ মাসে আমরা তীর্থভ্রমণে বেরুব, তার আগেই বিয়ে দিতে চাই। দেখি তার মধ্যে কিছু করতে পারি কিনা। শোন রটাই, তুমি বড় ব্যস্তবাগীশ, তোমার দিদিমণিকে ভাব করবার জন্য খুঁচিও না যেন।

—উ রে বাবা! তা হলে আমার পিঠে দমাদম কিল মারবে।

—আমাকেও মারবে না তো?

—নাঃ, আপনাকে কিচ্ছু বলবে না।

বেড়ানো শেষ হলে রটাইকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে খগেন চলে গেল। তার পর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এক মাসের মধ্যে একবার মানিকদের বাড়ি এবং তিনবার রটাইদের বাড়ি গেল। খগেন বড় মুশকিলে পড়ল, রুবির মা বার বার তাকে আসবার জন্য বলে পাঠাচ্ছেন, এদিকে রটাইএর আবদার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেমানুষের কথা ঠেলা যায় না, অগত্যা রটাইদের বাড়িতে খগেন ঘন ঘন যেতে লাগল।

দিন কতক পরে রটাই জিজ্ঞাসা করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, ধীরে রটন্তীকুমার, ধীরে। পণ্ডিতরা বলেন, পথ হাঁটা, কাঁথা সেলাই, আর পাহাড় টপকানো শনৈঃ শনৈঃ মানে আস্তে আস্তে করতে হয়। ভাব করাও সেই রকম, তাড়া হুড়ো চলে না। বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করতেন তবে এত দিন কোন্ কালে ভাব হয়ে যেত। তা তো তিনি করবেন না, আবার তাঁর টাকাও বিস্তর আছে, সব আমিই পাব। এই হয়েছে বিপদ।

—বিপদ কেন? টাকা থাকা তো ভালই, কত রকম মজা করা যায়, আইসক্রীম, চকোলেট, মোটর গাড়ি, দম দেওয়া ইঞ্জিন, ব্যাডমিন্টন, পিংপং, লুডো, আরও কত কি।

—তোমার দিদি যে তা বোঝেন না। তাঁর বিশ্বাস, সমান সমান না হলে ভাব করা ঠিক নয়। আমি তাঁকে বলি, তুমিই বা কিসে কম? দেখতে আমার চাইতে ঢের ভাল, বিদ্যেতেও বেশী। তোমার দাদামশাই তো বলেই দিয়েছেন তুমি হচ্ছ লক্ষ্মী সরস্বতী আর অন্নপূর্ণার অ্যাভারেজ। তুমি চমৎকার গাইতে পার, আমার গলা টিপলেও সারেগামা বেরুবে না। তুমি হরেক রকম খাবার করতে জান, মায় ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা, আর আমি পাঁউরুটি কাটতেও জানি না। তবু তোমার দিদিমণি খুঁতখুঁত করছেন। যা হক, তুমি ভেবো না রটাই, সব ঠিক হয়ে যাবে, দিন কতক সবুর কর।

পাঁচ দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, ভাব হল?

খগেন বললে, আর একটু দেরি আছে।

রটাই বিরক্ত হয়ে বললে, এত দিনেও ভাব হল না? আমার সঙ্গে তো আপনার এক মিনিটে ভাব হয়েছিল। বড়দির ভারী অন্যায়, আপনি তাকে বলুন, তিন দিনের মধ্যে যদি ভাব না করে তবে আড়ি হয়ে যাবে।

—ওহে রটন্তীকুমার, ধৈর্যং রহু ধৈর্যং। আমি যদি লঙ্কেশ্বর

রাবণ হতুম তো আল্টিমেটম দিতুম যে তিন দিনের মধ্যে ভাব না করলে তাঁকে কাটলেট বানিয়ে খেয়ে ফেলব। কিন্তু তা তো পারব না। হুড়ো লাগালে তোমার দিদিমণি ভড়কে যাবেন, হয়তো রেগে গিয়ে তাঁর কোনও ক্লাসফ্রেণ্ড তরুণকুমার কি করুণকুমারের সঙ্গেই ভাব করে ফেলবেন। আমিও তখন মরিয়া হয়ে রুবি-দির কাছেই যাব—

তিড়বিড় করে হাত পা ছুড়ে রটাই বললে, খবরদার যাবেন না বলছি! বেশ, আরও কিছু দিন দেখুন।

তিন দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করলে, হল?

খগেন বললে, এইবারে হব হব। তোমার দিদিমণিকে বলেছি, টাকার জন্য ভাবছ কেন, ও তো বাবার টাকা। আমার হাতে এলে তিন দিনে ফুঁকে দেব। যদি মামুলী উপায় পছন্দ না কর তবে হাসপাতাল আছে, ইস্কুল কলেজ আছে, রামকৃষ্ণ মিশন গৌড়ীয় মঠ আছে, হরেক রকম গুরু মহারাজের আখড়া আছে, যেখানে বলবে দিয়ে দেব। তার পর হাত খালি করে কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে, সেই রকম ফুর্তিতে থাকা যাবে।

—কিন্তু মোটর কার তো চাই?

—চাই বইকি। তাতে চড়েই তো মুষ্টিভিক্ষা করতে বেরুব, খুদ-কুঁড়ো যা আনব তাই দিয়ে তোমার দিদি পোলাও রাঁধবেন। আর দেখ, আমাদের কুটীরের সঙ্গে লাগাও একটা মস্ত তিন-তলা ধর্মশালা থাকবে, তুমি আর মানিক কেল্টে ভুল্টু বাবলু প্রভৃতি তোমার বন্ধুবর্গ মাঝে মাঝে এসে সেখানে বাস করবে। তার সামনেই একটি চমৎকার খেলার মাঠ—

—উঃ কি মজা! আর দেরি করবেন না, চটপট ভাব করে ফেলুন।

দেরি হল না। তিন দিন পরে ইস্কুলে মানিক বললে, হ্যাঁরে রটাই, খগেনবাবু নাকি খালি খালি তোদের বাড়ি যায়? রটাই সগর্বে উত্তর দিলে, যাবই তো, বড়দির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে যে।

কিন্তু এই ভাব হওয়ার ফলে রটাইদের বাড়ির লোকের সঙ্গে মানিকদের বাড়ির লোকের ভীষণ আড়ি হয়ে গেল। রুবির মা কেল্টের পিসীকে বললেন, উঃ, কি বেহায়া গায়ে পড়া মেয়ে ওই জয়ন্তীটা,—জানা নেই শোনা নেই একটা বজ্জাত বিশ্ববকাট ছোকরা খগেন, তাকেই ভেড়া বানালে গা!

কেল্টের পিসী বললেন, মুখে আগুন, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

জয়ন্তীর বিয়েতে মানিকদের বাড়ির কেউ এল না, কিন্তু কেল্টেদের সবাই এল, মায় তার পিসী। তিনি ঝাঁটা নিয়ে যান নি, আঁচলের ভেতর একটা থলি নিয়ে গিয়েছিলেন। পিসী অল্পে তুষ্ট, শুধু ভাঁড়ার থেকে গণ্ডা পাঁচেক কড়া-পাক সন্দেশ আর জয়ন্তীর উপহার-সামগ্রী থেকে খান দুই রসাল গল্পের বই সরিয়েছিলেন।

১৩৫৯

অগস্ত্যদ্বার

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পাটনায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি ছিল। পুরানো শহরের গুলজারবাগ মহল্লা থেকে বাঁকিপুরের জজ-আদালত পর্যন্ত সিংগল্ লাইনে গাড়ি চলত। দু দিক থেকে যাতায়াতের বাধা যাতে না হয় তার জন্য এক মাইল অন্তর লুপ ছিল, অর্থাৎ লাইন থেকে একটা শাখা বেরিয়ে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে আবার লাইনের সঙ্গে মিশত। প্রত্যেক গাড়ি লুপের কাছে এসে থামত এবং উলটো দিকের গাড়ি এলে লুপে গিয়ে পথ ছেড়ে দিত। কিন্তু সব সময় এই ব্যবস্থায় কাজ হত না। একটা গাড়ি লুপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, আধ ঘণ্টা হয়ে গেল তবু ও দিকের গাড়ির দেখা নেই। যাত্রীরা অধীর হয়ে বললে, চালাও গাড়ি, আর আমরা সবুর করতে পারি না। গাড়ি অগ্রসর হল, কিন্তু আধ মাইল যেতে না যেতে ও দিকের গাড়ি এসে পথরোধ করলে। তখন দুই তরফের গালাগালি শুরু হল। আরে গাধা তুই লুপে সবুর করিস নি কেন? আরে উল্লু তুই এত দেরি করলি কেন? যাত্রীরাও ঝগড়ায় যোগ দিলে, দুই গাড়ির চারটে ঘোড়াও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা তুলে চিঁহিহি করতে লাগল। তামাশা দেখবার জন্য রাস্তায় লোক জমে গেল, ছোকরার দল হাততালি দিয়ে চেঁচাতে লাগল—হী লব লব লব। অবশেষে একজন যাত্রী বললে, ঝগড়া এখন থাক, গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা কর। তখন দুই গাড়ির ঘোড়া খুলে পিছনে জোতা হল, এ গাড়ির যাত্রীরা ও গাড়িতে উঠল, দুই গাড়িই যেখান থেকে এসেছিল সেখানে

ফিরে চলল। গাড়ি বদলের ফলে যাত্রীরাও তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল।

এই ধরনের কিন্তু অতি গুরুতর একটা বিভ্রাট পুরাকালে ঘটেছিল। তারই ইতিহাস এখন বলছি।

একদা সত্যযুগে বিন্ধ্য গিরির অত্যন্ত অহংকার হয়েছিল, চন্দ্র সূর্যের পথরোধ করবার জন্য সে ক্রমশ উঁচু হতে লাগল। তখন অগস্ত্য মুনি এসে তাকে বললেন, আমি দক্ষিণে যাত্রা করব, আমাকে পথ দাও। বিন্ধ্য বিদীর্ণ হয়ে একটি সংকীর্ণ পথ করে দিলে, যার নাম অগস্ত্যদ্বার। সেই গিরিসংকটের ওপারে গিয়ে বিন্ধ্যের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে অগস্ত বললেন, বৎস বিন্ধ্য এ হচ্ছে কি, তুমি যে বাঁকা হয়ে বাড়ছ, ওলন ঠিক নেই, কোন্ দিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। আমি ফিরে এসে শিখিয়ে দেব কি করে খাড়া হয়ে বাড়তে হয়, তত দিন তুমি উঁচু হয়ো না। বিন্ধ্য বললে, যে আজ্ঞে। তার পর অনেক কাল কেটে গেল কিন্তু অগস্ত্য ফিরলেন না। তখন বিন্ধ্য রেগে গিয়ে শাপ দিলে, এই অগস্ত্যদ্বারে যারা দু দিক থেকে মুখোমুখি প্রবেশ করবে তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হবে। শাপের কথা একজন শিষ্যের মুখে শুনে অগস্ত্য বললেন, ভয় নেই, কিছু দিন পরেই বুদ্ধি ফিরে আসবে।

উক্ত পৌরাণিক ঘটনার বহু কাল পরের কথা বলছি। তখনও বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন, সেখানে লোকালয় ছিল না, কোনও রাজার শাসনও ছিল না। এই বিশাল নো ম্যান্স ল্যাণ্ডের উত্তরে কলিঞ্জর রাজ্য। কলিঞ্জরের দক্ষিণে অরণ্য, তারপর দুর্লঙ্ঘ বিন্ধ্য গিরি, তার পর আবার অরণ্য, তার পর বিধর্ভ রাজ্য। কলিঞ্জরের রাজা কনকবর্মা আর বিধর্ভের

রাজা বিশাখসেন দুজনেই তেজস্বী যুবক। তাঁদের মহিষীরা মামাতো-পিসতুতো ভগ্নী।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা তাঁর রাজ্যের দক্ষিণস্থ বনে মাঝে মাঝে মৃগয়া করতে যেতেন। একদিন তাঁর ইচ্ছা হল বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে গিয়ে শম্বর হরিণ শিকার করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য কহোড়ভট্টের সঙ্গে রথে চড়ে যাত্রা করলেন, পিছনে রথী পদাতি গজারোহ অশ্বারোহী সৈন্যদল চলল।

দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে বিদর্ভরাজ বিশাখসেনেরও ইচ্ছা হল বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরবর্তী অরণ্যে গিয়ে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি বধ করবেন। তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্য বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে রথারূঢ় হয়ে যাত্রা করলেন, চতুরঙ্গসেনা পিছনে পিছনে গেল।

বিন্ধ্যপর্বতমালা ভেদ করে একটি পথ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গেছে। এই পথটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু মাঝামাঝি এক স্থানে পূর্বোক্ত অগস্ত্যদ্বার নামক গিরিসংকট আছে, তা এত সংকীর্ণ যে দুটি রথ পাশাপাশি যেতে পারে না।

কলিঞ্জরপতি কনকবর্মা অগস্ত্যদ্বারের উত্তর প্রান্তে এসে দেখলেন রাজা বিশাখসেন সদলবলে দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন। দুই রাজপথ নিকটবর্তী হলে কনকবর্মা বললেন, নমস্কার সখা বিশাখসেন, স্বাগতম্। বিদর্ভ রাজ্যের সর্বত্র কুশল তো? চতুর্বর্ণের প্রজা ও গবাদি পশু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো? ধনধান্যের ভাণ্ডার পূর্ণ আছে তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা বিংশতিকলা ভাল আছেন তো?

প্রতিনমস্কার করে বিশাখসেন বললেন, অহো কি সৌভাগ্য যে এই দুর্গম পথে প্রিয়সখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! মহারাজ, তোমার শুভেচ্ছার প্রভাবে আমার রাজ্যের সর্বত্র কুশল। কলিঞ্জর রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল তো? তোমার মহিষী আমার শ্যালিকা কম্বুকঙ্কণা ভাল আছেন? সখা, এখন দয়া করে পথ ছেড়ে দাও, তোমার রথটি এই গিরিসংকটের একটু উত্তরে সরিয়ে রাখ। আমি সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত

হয়ে যাই, তার পর তুমি তোমার সেনা নিয়ে অভীষ্ট স্থানে যাত্রা ক'রো।

কনকবর্মা মাথা নেড়ে বললেন, তা হতেই পারে না, আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়, আমার অশ্ব-রথ-গজাদিও বেশী, অতএব পথের অগ্রাধিকার আমারই। তুমিই একটু দক্ষিণে হটে গিয়ে আমাকে পথ ছেড়ে দাও।

বিশাখসেন বললেন, অন্যায় বলছ সখা। তুমি বয়সে একটু বড় হতে পার, তোমার অশ্ব-গজাদিও প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিদর্ভ রাজ্য অতি সমৃদ্ধ ও বিশাল, তার মধ্যে চারটে কলিঙ্গরের স্থান হয়। অতএব তুমিই আমাকে পথ দাও।

অনেকক্ষণ এই রকম তর্কবিতর্ক চলল। তার পর কনকবর্মা বললেন, ওহে বিশাখসেন, তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। এই শরাসন স্পর্শ করে শপথ করছি, কিছুতেই তোমাকে আগে যেতে দেব না, তোমার পূর্বেই আমি দক্ষিণে অগ্রসর হব। যখন মিষ্টবাক্যে বিবাদের মীমাংসা হল না তখন যুদ্ধই করা যাক। এই বলে তিনি তাঁর ধনুতে শরসন্ধান করলেন।

বিশাখসেন বললেন, ওহে কনকবর্মা, আমিও শপথ করছি, বাহু-বলে আমার পথ করে নেব, তোমার পূর্বেই আমি উত্তর দিকে যাত্রা করব। এই বলে তিনি ধনুতে শরযোজনা করে জ্যাকর্ষণ করলেন।

তখন দুই রাজবয়স্য কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব একজোগে হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভো নৃপতিযুগল, থামুন থামুন। মনে নেই, গত বৎসর মকরসংক্রান্তির দিনে আপনারা নর্মদায় স্নানের পর অগ্নি-সাক্ষী করে মৈত্রীবন্ধন করেছিলেন? অপি চ, তখন উষ্ণীষ বিনিময় করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কিছুতেই আপনাদের সৌহার্দ ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না।

কনকবর্মা গালে হাত দিয়ে বললেন, হুঁ ওই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করা গিয়েছিল বটে।



স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাসহ রাজশেখর বসু

(সম্মুখে বাঁ দিক থেকে দৌহিত্রী আশা বসু, মধ্যে রাজশেখর বসু এবং ডান দিকে স্ত্রী মৃণালিনী বসু।
পশ্চাতে কন্যা প্রতিমা পালিত ও জামাতা অমর পালিত।)

বিশাখসেন বললেন, হুঁ, আমারও সে কথা মনে পড়ছে। তাই তো, এখন কি করা যায়? এক দিকে সৌহার্দরক্ষার প্রতিজ্ঞা, আর এক দিকে অগ্রযাত্রার শপথ। দুটোই বজায় থাকে কি করে? মহারাজ কনকবর্মা, তোমার মুখ্যমন্ত্রীকে সংবাদ পাঠাও, তিনি এখনই এখানে চলে আসুন। আমিও আমার মহামন্ত্রীকে আনাচ্ছি। দুই মন্ত্রী যুক্তি করে এমন একটা উপায় স্থির করুন যাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হয়, মর্যাদারও হানি না হয়।

কনকবর্মা তাঁর এক অশ্বারোহী অনুচরকে বললেন, খেটকসিংহ, তুমি এখনই দ্রুতবেগে গিয়ে আমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এস। বিশাখসেন, তুমিও লোক পাঠাও।

কহোড়ভট্ট বললেন, তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, অনর্থক বিলম্ব হবে। আমার পরম বন্ধু মহাপণ্ডিত বিড়ঙ্গদেব এখানে রয়েছেন, আমারও বিদ্যাবুদ্ধির প্রচুর খ্যাতি আছে। আমরা দুজনেই রাজ-বয়স্য। ঠিক মন্ত্রী না হই, উপমন্ত্রী তো বটেই। পত্নীর স্থান অন্তঃপুরে, পথে তিনি বিবর্জিতা, উপপত্নীই প্রবাসসঙ্গিনী হয়ে থাকে। তদ্রূপ মন্ত্রীর স্থান রাজধানীতে, কিন্তু পর্যটনে ও ব্যসনে উপমন্ত্রীই সহায়। আমরাই মন্ত্রণা করে কিংকর্তব্য স্থির করতে পারব।

দুই রাজা বললেন, উত্তম কথা, তাই কর। কিন্তু বিলম্ব না হয়, বেলা পড়ে আসছে।

কহোড় আর বিড়ঙ্গ রথ থেকে নেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, তার পর একটি শিলাপট্টে বসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে কহোড় বললেন, হে নরপতিদ্বয়, শুনতে আজ্ঞা হক। আমরা দুই বন্ধুতে মিলে আপনাদের সমস্যার একটি উত্তম সমাধান স্থির করেছি, তাতে সৌহার্দের প্রতিজ্ঞা, অগ্রযাত্রার শপথ, এবং উভয়ের মর্যাদা সমস্তই রক্ষা পাবে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে দুই রাজা বললেন, কি প্রকার সমাধান?

কহোড় বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আপনি রাজধানী থেকে এক

দল নিপুণ খনক আনান, তারা এই অগস্তদ্বারের তলা দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খনন করুক। সেই সুড়ঙ্গপথে আপনি দক্ষিণ দিকে এবং উপরের পথে বিদর্ভরাজ বিশাখসেন উত্তরদিকে একই মুহূর্তে যাত্রা করবেন।

বিশাখসেন বললেন, যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু পর্বতের নীচে সুড়ঙ্গ করতে অন্তত এক বৎসর লাগবে। তত দিন আমরা কি করব? রথ থেকে আমি কিছুতেই নামব না তা বলে দিচ্ছি।

কহোড় বললেন, নামবেন কেন। রথে আরূঢ় থেকেই একটু কষ্ট করে এক বৎসর কাটিয়ে দেবেন, ওখানেই শৌচ-স্নানাদি পান-ভোজনাদি অক্ষক্রীড়াদি করবেন, ওখানেই নিদ্রা যাবেন। রাজধানী থেকে নর্তকীদের আনিয়ে নিন, তারা নৃত্যগীত করে আপনাদের চিত্ত-বিনোদন করবে।

কনকবর্মা বললেন, সুড়ঙ্গ টুড়ঙ্গ চলবে না। বিশাখসেন উপর দিয়ে যাবেন আর আমি মূষিকের ন্যায় তাঁর নীচে দিয়ে যাব এ হতেই পারে না।

বিড়ঙ্গ বললেন, মহারাজ কনকবর্মা, আর এক উপায় আছে। আপনি কুবেরের আরাধনা করুন যাতে তিনি তুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পুষ্পক বিমানটি পাঠিয়ে দেন। সেই বিমানে আপনি আকাশ-মার্গে দক্ষিণ দিকে যাবেন এবং বিদর্ভরাজ গিরিসংকট দিয়ে উত্তর দিকে যাবেন।

বিশাখসেন বললেন, উনি আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবেন তা হতেই পারে না। তোমরা দুজনেই অত্যন্ত মূর্খ, সমস্যার সমাধান তোমাদের কর্ম নয়।

বিড়ঙ্গ বললেন, মহারাজ, ধৈর্য ধরুন, আমরা আর এক বার মন্ত্রণা করছি।

দুই রাজবয়স্য আবার মন্ত্রণায় নিবিষ্ট হলেন, দুই রাজা অধীর হয়ে রথের উপর তাঁদের ধনুক ঠুকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কহোড়

বললেন, হে নৃপতিযুগল, এবারে আমরা একটি অতি সাধু বিচিত্র ও যশস্কর সমাধান আবিষ্কার করেছি।

কনকবর্মা বললেন, বলে ফেল।

কহোড় বললেন, প্রথমে আপনাদের দুই রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হবে, তা হলে এই সংকীর্ণ স্থানেও অনায়াসে রথ ঘোরানো যাবে। ঘোরাবার পর আবার ঘোড়া জোতা হবে,তখন দুই রথের মুখ বিপরীত দিকে থাকবে।

বিশাখসেন সক্রোধে বললেন, আমরা পরাঙ্‌মুখ হয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাব এই তুমি বলতে চাও?

—না না মহারাজ, ফিরবেন কেন। ঘোরাবার পর দুই রথ একটু পশ্চাতে সরে আসবে যাতে ঠেকাঠেকি হয়। তার পর মহারাজ কনকবর্মা পিছন দিক থেকে পা বাড়িয়ে টুপ করে বিদর্ভরাজের রথে উঠবেন এবং বিদর্ভরাজ কলিঞ্জরপতির রথে উঠবেন।

দুই রাজা সমস্বরে বললেন, তার পর, তার পর?

—রথ বদলের পর আর কোনও ভাবনা নেই। আপনারা যুগপৎ বিপরীত দিকে অর্থাৎ আপনাদের অভীষ্ট মার্গে যাত্রা করবেন।

কনকবর্মা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্যদলের কি হবে?

—তাদেরও বদল হবে। আপনার আগে আগে বিদর্ভসেনা এবং মহারাজ বিশাখসেনের আগে আগে কলিঞ্জরসেনা যাবে। তারা মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

কনকবর্মা বললেন, সখা, সম্মত আছে?

বিশাখসেন বললেন, আমার সেনা তোমার হবে এবং তোমার সেনা আমার হবে এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু বেলা যে শেষ হয়ে এল, মৃগয়া কখন করব?

কহোড় বললেন, আজ মৃগয়া নাই করলেন মহারাজ। আজ আপনাদের প্রতিজ্ঞা আর শপথ রক্ষিত হক, মৃগয়া এর পরে এক দিন করবেন।

বিশাখসেন বললেন, কিন্তু আজ যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আমাদের অভিযানের শেষ হবে কোথায়? ফিরব কখন?

কহোড় বললেন, ফিরবেন কেন। কিচ্ছু ভাববেন না, সবই আমরা স্থির করে ফেলেছি। আপনাদের রাজ্যেরও বিনিময় হবে। মহারাজ কনকবর্মা বিদর্ভসেনার সঙ্গে যাত্রা করে বিদর্ভরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবেন, এবং মহারাজ বিশাখসেন কলিঞ্জরসেনার সঙ্গে গিয়ে কলিঞ্জর সিংহাসন অধিকার করবেন।

কিছু কাল স্তব্ধ হয়ে থাকার পর কনকবর্মা বললেন, অতি জটিল ব্যবস্থা। আমাদের পিতৃপিতামহের রাজ্য হস্তান্তরিত হবে এ যে বড় বিশ্রী কথা।

কহোড় বললেন, মহারাজ, ক্ষত্রিয় নৃপতির প্রধান কর্তব্য প্রতিজ্ঞা, শপথ আর আত্মমর্যাদা রক্ষা, তার জন্য যদি রাজ্য বা প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাও শ্রেয়। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় আপনাদের রাজ্য-নাশ বা প্রাণনাশ কিছুই হচ্ছে না, এক রাজ্যের পরিবর্তে আর এক রাজ্য পাচ্ছেন।

কনকবর্মা বললেন, এই বারে বুঝেছি। সখা, তুমি সম্মত আছ?

বিশাখসেন বললেন, অন্য উপায় তো দেখছি না। বেশ, তাই হক।

সেকালের রথ কতকটা একালের এক্কার মতন। দুটি মাত্র চাকা, হালকা গড়ন, বেশী জায়গা নিত না। সারথি সামনে বসত, তার পাশে বা পিছনে রথী বসতেন। দুই রাজার আদেশে রথের ঘোড়া খুলে ফেলা হল। বোম খাড়া করে তুলে সেই সংকীর্ণ স্থানে সহজেই রথ ঘোরানো গেল। তার পর আবার ঘোড়া জোতা হল। একটু পিছনে হটাতেই দুই রথের পিছন দিক ঠেকে গেল, তখন রাজারা না থেমেই এক রথ থেকে অন্য রথে উঠলেন। দুই রাজ-বয়স্যও নিজ প্রভুর পশ্চাতে বসলেন।

অনন্তর কনকবর্মা পিছনে ফিরে বললেন, হে কালঞ্জর সৈন্যগণ, ব্যাবর্তধ্বন্ (অর্থাৎ right about turn)। এখন থেকে তোমরা

মহারাজ বিশাখসেনের অধীন, উনি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে কলিঞ্জর রাজ্য অধিকার করবেন। আমিও বিদর্ভসেনার সঙ্গে গিয়ে বিদর্ভ রাজ্য অধিকার করব।

বিশাখসেনও অনুরূপ ঘোষণা করলেন।

সৈন্যরা অতি সুবোধ, সমস্বরে বললে, রাজাদেশ শিরোধার্য। তারপর কনকবর্মা আর বিশাখসেন একযোগে আজ্ঞা দিলেন, গম্যতাম (অর্থাৎ march)। বিদর্ভসেনা বিদর্ভের দিকে চলল, কনকবর্মার রথ তাদের পিছনে গেল। কলিঞ্জরসেনা কলিঞ্জরে ফিরে চলল, বিশাখসেনের রথ তাদের পিছনে গেল।

যেতে যেতে কনকবর্মা তাঁর বয়স্যকে বললেন, কাজটা কি ভাল হল? রাজ্য বদলের ফলে বিশাখসেনের লাভ আর আমার ক্ষতি হবে। আমার মহিষী তার মহিষীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দরী।

কহোড় বললেন, মহারাজ, আপনি যে লোকবাহ্য কথা বলছেন, পরস্ত্রীকেই লোকে বেশী সুন্দরী মনে করে। সর্ব বিষয়ে আপনারই লাভ অধিক হবে। বিদর্ভমহিষী পুত্রবতী, কিন্তু আপনার মহিষী এখনও অনপত্যা। বিদর্ভরাজ্যের ধনভাণ্ডারও অতি বিশাল। ওখানকার অধিপতি হয়ে আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করবেন।

কনকবর্মা যখন বিদর্ভরাজ্যে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাঁর আদেশে কয়েক জন অশ্বারোহী আগেই রাজধানীতে গিয়ে সংবাদ দিয়েছিল যে রাজ্য বদল হয়ে গেছে, নূতন রাজা আসছেন। কনকবর্মা দেখলেন, তাঁর সংবর্ধনার কোনও আয়োজন হয় নি, পথে আলোকসজ্জা নেই, শাঁখ বাজছে না, হুলুধ্বনি হচ্ছে না কেউ লাজবর্ষণও করছে না। তিনি অপ্রসন্ন মনে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রথ থেকে নামলেন। কয়েকজন রাজপুরুষ নীরবে নমস্কার করে তাঁকে সভাগৃহে নিয়ে গেল, কহোড়ভট্টও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলা গম্ভীরমুখে সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে অভিবাদন করে কনকবর্মা বলিলেন, পট্টমহিষী, ভাল আছেন তো? পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনার বিবাহসভায় আপনাকে তন্বী দেখেছিলাম। এখন আপনি একটু স্থূলাঙ্গী হয়ে পড়েছেন, তাতে আপনার রূপ ষোল কলা পেরিয়ে কুড়ি কলায় পৌঁছে গেছে। সকল সমাচার শুনেছেন বোধ হয়। এখন আমিই এই বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি, অভিষেকের ব্যবস্থা কাল হবে। আমি আর আমার বয়স্য এই কহোড়ভট্ট অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছি, আজ ক্ষমা করুন, কাল আপনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করব। এখন আমাদের বিশ্রামাগার দেখিয়ে দিন এবং সত্বর আহারের ব্যবস্থা করুন।

একজন সশস্ত্র রাজপুরুষকে সম্বোধন করে মহিষী বিংশতিকলা বললেন, ওহে কোষ্ঠপাল, এই ধৃষ্ট নির্বোধ রাজা আর তার সহচরকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। এদের শয়নের জন্য কিছু খড় আর ভোজনের জন্য প্রত্যেককে এক সরা ছাতু আর এক ভাঁড় জল দিও।

কহোড়ভট্ট করজোড়ে বললেন, সে কি রানী-মা, আমাদের এই পরমভট্টারক শ্রীশ্রীমহারাজ আপনার ভগ্নীপতি তো বটেনই, এখন বিদর্ভপতি হয়ে অধিকন্তু আপনার পতিও হয়েছেন। এঁকে ছাতু খাওয়াবেন কি করে? ইনি নিত্য নানা প্রকার চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আহার করে থাকেন।

বিংশতিকলা বললেন, তাই হবে। ওহে কোষ্ঠপাল, এই রাজ-মূর্খকে দু মুঠো ছোলা, এক ছড়া তেঁতুল, একটু গুড়, আর এক ভাঁড় ঘোল দিও। ছোলা চিবুবে, তেঁতুল চুষবে, গুড় চাটবে, আর ঘোলের ভাঁড়ে চুমুক দেবে।

কোষ্ঠপাল বললেন, যথা আজ্ঞা মহাদেবী। আরক্ষিগণ, এঁদের কারাগারে নিয়ে চল।

কনকবর্মা হতভম্ব হয়ে নীরবে কারাগৃহে গেলেন এবং ক্লান্তদেহে

বিষণ্নমনে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বললেন, ওহে পণ্ডিতমূর্খ কহোড়, তোমাদের মন্ত্রণা শুনেই আমার এই দুর্দশা হল। এই শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার পাব কি করে?

কহোড় বললেন, মহারাজ, ভাববেন না। আমি সারা রাত চিন্তা করে উপায় নির্ধারণ করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কনকবর্মা বললেন, তোমার উপর আর ভরসা নেই। বিশাখসেন কেমন আছেন কে জানে, তিনি হয়তো কলিঞ্জর রাজ্যে খুব সুখে আছেন।

কহোড় বললেন, মনেও ভাববেন না তা। আমাদের মহাদেবী কম্বুকঙ্কণাও বড় কম যান না।

এই সময়ে একজন প্রহরী কারাকক্ষে এসে বললেন, আপনারা শৌচস্নানাদির জন্য ওই প্রাচীরবেষ্টিত উপবনে যেতে পারেন।

কহোড় বললেন, বৎস প্রহরী, শৌচাদি এখন মাথায় থাকুক, একবার রানী-মার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও, মহারাজ তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

প্রহরী বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

রাজমহিষী বিংশতিকলার কাছে এসে কহোড় কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহাদেবী, ঢের হয়েছে, আমাদের মুক্তি দিন, ফিরে গিয়েই বিদর্ভরাজ বিশাখসেনকে পাঠিয়ে দেব।

মহিষী বললেন, আগে তিনি আসুন, তার পর তোমাদের মুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

—তবে কেবল আমাকে মুক্তি দিন, আমি কলিঞ্জরে গিয়ে বদলা-বদলির ব্যবস্থা করব।

—বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, যাতায়াতের জন্য একটা রথও দিচ্ছি। কিন্তু যদি সাত দিনের মধ্যে ফিরে না এস তবে তোমার প্রভুকে শূলে দেব।

কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন। এই সময়ে বিড়ঙ্গদেবও

বিশাখসেনের দূত হয়ে বিদর্ভরাজ্যে আসিয়াছিলেন। মধ্যপথে দুই বন্ধুতে দেখা হয়ে গেল। কুশলপ্রশ্নের পর দুজনে অনেক ক্ষণ মন্ত্রণা করলেন, তার পর যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে গেলেন।

বিদর্ভরাজমহিষী বিংশতিকলাকে কহোড় বললেন, মহাদেবী, আমার প্রিয়বন্ধু বিড়ঙ্গদেবের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই ব্যবস্থা করেছি যে কাল প্রাতঃকালে মহারাজ বিশাখসেন কলিঙ্গর থেকে বিদর্ভ রাজ্যে যাত্রা করবেন, এবং এখান থেকে মহারাজ কনকবর্মাও কলিঙ্গরে যাত্রা করবেন। যত ইচ্ছা রক্ষী সৈন্য আমাদের সঙ্গে দেবেন। অগস্ত্য-দ্বারে উপস্থিত হয়ে যদি তারা দেখে যে মহারাজ আসেন নি, তবে আমাদের ফিরিয়ে আনবে।

মহিষী বললেন, ফিরিয়ে এনেই তোমাদের শূলে চড়াবে। বেশ, তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি, কাল প্রভাতে যাত্রা ক'রো।

পরদিন প্রাতঃকালে কনকবর্মা ও কহোড়ভট্ট রথে চড়ে যাত্রা করলেন, এক দল অশ্বারোহী সৈন্য তাঁদের সঙ্গে গেল। অগস্ত-দ্বারের দক্ষিণ মুখে এসে কনকবর্মা দেখলেন, বিশাখসেন ও বিড়ঙ্গদেবও উত্তর মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

উল্লসিত হয়ে বিশাখসেন বললেন, সখা কনকবর্মা, আমার বিদর্ভ রাজ্যে সুখে ছিলে তো? এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তোমার সেবার ত্রুটি হয় নি তো?

কনকবর্মা বললেন, কোনও ত্রুটি হয় নি, তোমার মহিষী বিংশতি-কলা যেমন রসিকা তেমন গুণবতী। উঃ, কি যত্নই করেছেন! কিন্তু তোমাকেও তো বায়ুভুক্ তপস্বীর মতন দেখাচ্ছে। আমার কলিঙ্গর রাজ্যে তোমার যথোচিত সৎকার হয়েছিল তো?

অট্টহাস্য করে বিশাখসেন বললেন, সখা, আশ্বস্ত হও, সৎকারের কোন ত্রুটি হয় নি। তোমার মহিষী কম্বুকঙ্কণাও কম রসিকা আর

গুণবতী নন, তিনি আমাকে বিচিত্র চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় খাইয়েছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না, তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তবে চলে আসতে পেরেছি। যাক সে কথা। আমরা এই অগস্ত্যদ্বারে আবার মুখোমুখি হয়েছি। কে আগে যাত্রা করবে?

কহোড়ভট্ট আর বিড়ঙ্গদেব বললেন, দোহাই মহারাজ, আর বিবাদ করবেন না, আপনাদের যাত্রার ব্যবস্থা আমরাই করে দিচ্ছি। ওহে সারথিদ্বয়, তোমরা ঠিক গত বারের মতন রথ ঘুরিয়ে ফেল।... হয়েছে তো? ...মহারাজ কনকবর্মা, এখন আপনি এ রথ থেকে ও রথে উঠুন। মহারাজ বিশাখসেন, আপনিও ও রথ থেকে এ রথে আসুন। মহামুনি অগস্ত্যের প্রসাদে এবং এই কহোড়-বিড়ঙ্গের বুদ্ধিবলে আপনারা সংকটমুক্ত হয়েছেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা শপথ মর্যাদা রাজ্য প্রাণ আর ভার্যা সবই রক্ষা পেয়েছে। এখন আর বিলম্ব নয়, দুই রথ যুগপৎ দুই দিকে শুভযাত্রা করুক।

১৩৫৯

ষষ্ঠীর কৃপা

ষষ্ঠীপূজোর পর সুকুমারী তার ছেলেকে পিঁড়ির ওপর শুইয়ে রেখে স্বামীকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। সুকুমারীর বয়স চব্বিশ, তার স্বামী গোকুল গোস্বামীর চুয়ান্ন।

গোকুলবাবু বললেন, ইঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে সুকু, যেন উর্বশী স্নান করে সমুদ্র থেকে উঠে এলেন!

সুকুমারী হাত জোড় করে বললে, তোমার পায়ে পড়ি এইবার আমাকে রেহাই দাও। সাত বৎসর তোমার কাছে এসেছি, তার মধ্যে ছটি সন্তান প্রসব করেছি। পাঁচটি গেছে, একটি এখনও বেঁচে আছে। আমি আর পারি না, শরীর ভেঙে গেছে। আবার যদি পোয়াতী হই তো মরব, এই খোকাও মরবে।

গোকুলবাবু সহাস্যে বললেন, বালাই, মরবে কেন। সন্তান জন্মায়, বাঁচে, মরে, সবই ভগবানের ইচ্ছা, অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার ফলভোগ শেষ হয়েছে, ফাঁড়া কেটে গেছে, এখন আর কোনও ভয় নেই।

গোকুলচন্দ্র গোস্বামী শেওড়াগাছির সবরেজিস্ট্রার। খুব আরামের চাকরি, কাজ কম, তাঁর বসতবাড়ির কাছেই কাছারি। গোকুলবাবু পণ্ডিত লোক, অনেক শাস্ত্র জানেন, বাংলা ইংরেজী নভেলও বিস্তর পড়েছেন। অবস্থা ভাল, দেবত্র সম্পত্তি আছে, বেনামে তেজারতিও করেন। সাত বৎসর পূর্বে ইনি হিমালয়ের সমস্ত তীর্থ পর্যটনের পর মানস সরোবর আর কৈলাস দর্শন করেছিলেন। ফিরে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁর জন্মান্তর হয়েছে, আগেকার স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা চলবে না, নতুন সংসার

পাতবেন। তার কোনও বাধা হল না, অত্যন্ত গরিবের মেয়ে অনাথা সুকুমারী তাঁর ঘরে এল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাত্যায়নী তিন ছেলে নিয়ে কলকাতায় তাঁর ভাইএর বাড়িতে গিয়ে রইলেন। স্বামীর কাছ থেকে কিছু মাসহারা পান, তা ছাড়া কোনও সম্বন্ধ নেই। দুই মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল, তারা শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

স্বামীর প্রবোধবাক্য শুনে সুকুমারী বললে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আমাকে ভুলিও না। কাগজে পড়েছি জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় বেরিয়েছে, দিল্লীর মন্ত্রীরাও তা ভাল মনে করেন। তুমি এত খবর রাখ, এটা জান না? কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রীদের কাছ থেকে শিখে এস।

গোকুলবাবু বললেন, তারা ছাই জানে।

—তবে বড় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি তো শুনেছি ডাক্তার।

—পাগল হয়েছ নাকি সুকু? ছি ছি ছি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের কুলবধূর মুখে এই কথা! অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, একটুখানি লেখাপড়া শিখে খবরের কাগজ পড়ে এইসব পাপচিন্তা তোমার মাথায় ঢুকেছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মরোধ করা একটা মহাপাপ তা জান? প্রজাবৃদ্ধির জন্যই ভগবান স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। গর্ভধারণ হচ্ছে স্ত্রীজাতির বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য। ভগবানের এই বিধানের ওপর হাত চালাতে চাও?

—শুনেছি আজকাল ঘরে ঘরে চলছে, তাই প্রাণের দায়ে বলছি। আমি মুখ্খু মানুষ, কিছুই জানি না, ন্যায়-অন্যায়ও বুঝি না, কিন্তু ভগবানের ওপর হাত না চালায় কে? ভগবান লেংটা করে পাঠিয়েছিলেন, কাপড় পরছ কেন? দাড়ি কামাও কেন? দাঁত বাঁধিয়েছ কেন?

—রাধামাধব! এসব কথা মুখে এনো না সুকু, জিব খসে যাবে।

—দিল্লীর মন্ত্রীদের তো খসে না।

—খসবে, খসবে, পাপের মাত্রা পূর্ণ হলেই খসবে। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তা পালন করলে ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করা হয় না, তার বাইরে গেলেই মহাপাপ। এইটে জেনে রেখো যে ভাগ্যের

হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। তোমার সন্তানভাগ্য মন্দ ছিল তাই এত দিন দুঃখ পেয়েছ, ভাগ্য পালটালেই তুমি সুখী হবে। যা বিধিলিপি তা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। এসব বড় গূঢ় কথা, একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

সুকুমারী হতাশ হয়ে চুপ করে রইল।

ছমাস যেতে না যেতে সুকুমারী আবার অন্তঃসত্ত্বা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগে পড়ল। ডাক্তার জানালেন, অতি বিশ্রী অ্যানিমিয়া, তার ওপর নানা উপসর্গ ; কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি ভাল চিকিৎসা করানো হয় তবে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। ডাক্তারের কথা উড়িয়ে দিয়ে গোকুলবাবু বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না সুকু, জ্যোতিঃশাস্ত্রী মশায়ের মাদুলিটি ধারণ করে থাক আর বিধু ডাক্তারের গ্লোবিউল খেয়ে যাও, দু দিনে সেরে উঠবে।

পূজোর আগে গোকুলবাবু সুকুমারীকে বললেন, অনেক কাল বাইরে যাই নি, শরীরটা বড় বেজুত হয়ে পড়েছে। পূজোর বন্ধের সঙ্গে আরও সাত দিন ছুটি নিয়েছি, মোক্তার নরেশবাবুরা দল বেঁধে রামেশ্বর পর্যন্ত যাচ্ছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে ঘুরে আসব। তুমি ভেবো না, ঠিকে ঝি রইল, ছোঁড়া চাকর গুপে রইল, গয়লাবউও রোজ দু বেলা তোমাকে দেখে যাবে। আমি কালীপূজোর কাছাকাছি ফিরে আসব।

গোকুলবাবু চলে যাবার কিছু দিন পরেই সুকুমারী একবারে শয্যা নিলে। কোনও রকমে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় তার বোধ হল, দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে অথচ সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। খোকা পাশেই শুয়ে আছে। তার মাথায় হাত দিয়ে সুকুমারী মনে মনে বললে, মা জগদম্বা, আমি, তো চলে যাচ্ছি, আমার ছেলেকে কে দেখবে? হে মা ষষ্ঠী, দয়া কর, দয়া কর, আমার খোকাকে রক্ষা কর।

সহসা ঘর আলো করে ষষ্ঠীদেবী সুকুমারীর সামনে আবির্ভূত হলেন। মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন, কি চাও বাছা?

সুকুমারী বললে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মা। শুনেছি তোমার ইচ্ছায় সন্তান জন্মায়, তোমার দয়াতেই বাঁচে, যিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে থাকেন তুমিই সেই দেবী। মা গো, আমি যাচ্ছি, আমার ছেলেটাকে দেখো।

সুকুমারীর কপালে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দেবী বললেন, তোমার ছেলের ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমও। সুকুমারী ঘুমিয়ে পড়ল।

ষষ্ঠীদেবী ডাকলেন, মেনী!

একটি প্রকাণ্ড বেরাল সামনে এল। ধপধপে সাদা গা, মাথার লোম কাল, মাঝে সরু সিঁথি, ল্যাজে সারি সারি চুড়ির মতন দাগ। পিছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু পা জোড় করে মেনী বললে, কি আজ্ঞা করছেন মা?

—তুই এই খোকার ভার নে।

—আমি যে বেরাল মা!

—তুই মানুষ হয়ে যা।

নিমেষের মধ্যে মেনীর রূপান্তর হল। একটি সুশ্রী যুবতী আবির্ভূত হয়ে বললে, মা আমি খোকার ভার নিচ্ছি। কিন্তু আমারও তো বাচ্চা আছে, তাদের দশা কি হবে? আগেকার গুলোর জন্যে ভাবি না, তারা বড় হয়েছে, গেরস্ত বাড়িতে এঁটো খেয়ে, চুরি করে, ছুঁচো ইঁদুর উচ্চিংড়ে ধরে যেমন করে হক পেট ভরাতে পারবে। কিন্তু চারটে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা আছে যে, এখনও চোখ ফোটে নি, তাদের উপায় কি হবে?

—তুই মাঝে মাঝে বেরাল হয়ে তাদের খাওয়াবি।

—কিন্তু বাড়ির কর্তা কি ভাববে? গোসাঁই যদি দেখে ফেলে তবে মহা গণ্ডগোল হবে যে!

—তোর কোনও ভয় নেই। যদি দেখেই ফেলে তবে গোসাঁইও বেরাল হয়ে যাবে।

—আবার তো মানুষ হবে?

—না না, চিরকালের মতন বেরাল হয়ে যাবে, কোনও ফেসাদ বাধাতে পারবে না। তোকেও বেশী দিন আটকে থাকতে হবে না, এই ছেলের একটা সুরাহা হয়ে গেলেই তুই ছাড়া পাবি।

দেবী অন্তর্হিত হলেন। সুকুমারীর খোকা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল, মেনী তাকে বুকে তুলে নিলে। বুভুক্ষু খোকা প্রচুর স্তন্য পেয়ে আনন্দে কাকলি করে উঠল।

একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গোকুলবাবু ফিরে এসেছেন, পরশু তাঁকে কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি হাঁকডাক আরম্ভ করলেন—গুপে কোথায় গেলি রে, জিনিসগুলো নামিয়ে নে না—ঝি এর মধ্যেই চলে গেছে নাকি? কই, কারও তো সাড়া শব্দ নেই। সুকু কোথায় গো, একবার বেরিয়ে এস না।

কেউ এল না, অগত্যা গাড়োয়ানের সাহায্যে গোকুলবাবু নিজেই তাঁর বিছানা তোরঙ্গ ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। তার পর—সুকু ভাল আছ তো? খোকা ভাল আছে? চিঠি লেখ নি কেন—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন।

মিটমিটে হারিকেনের আলোয় গোকুলবাবু দেখলেন, একটি সুন্দরী মেয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা?

মেনী বললে, আমার নাম মেনকা, ওঁর দূর সম্পর্কের বোন হই। খবর পেলুম সুকু-দিদির ভারী অসুখ, একলা আছেন, খোকাকে দেখবার কেউ নেই, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম।

গোকুলবাবু কৃতার্থ হয়ে বললেন, আসবে বইকি মেনকা। তা এসেছ যখন, তখন থেকেই যাও। কেমন আছে তোমার দিদি? আহা, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, জ্বরটা বেশী নাকি?

—দিদি এইমাত্র মারা গেছেন।

গোকুলবাবু মাথা চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন—আমাকে একলাটি ফেলে কোথায় গেলে গো, খোকার কি হবে গো, ইত্যাদি। মেনী বললে, চুপ করুন জামাইবাবু, কান্নাকাটি পরে হবে। দেরি করবেন না, লোক ডাকুন, সংকারের ব্যবস্থা করুন। গোকুলবাবু তাই করলেন।

দু দিন পরে গোকুলবাবু বললেন, ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ মেনকা, তাই দুটো খেতে পাচ্ছি, ছেলেটাও বেঁচে আছে। চমৎকার মেয়ে তুমি। আমি বলি কি, এখানে এসেই যখন আমাদের ভার নিয়েছ তখন পাকা করেই নাও, গিন্নী হয়ে ঘর আলো করে থাক।

মেনী বললে, ইশ, আপনার যে সবুর সইছে না দেখছি। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, লোকে বলবে কি? দিদির জন্যে শোকটা একটু কমুক, অশৌচ শেষ হক, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাক, তার পর ও কথা বলবেন।

শ্রাদ্ধ চুকে গেল, কিন্তু গোকুলবাবুর স্বস্তি নেই, মেনকার রকম সকম বড় সন্দেহজনক ঠেকছে। চুপ করে থাকতে না পেরে তিনি বললেন, হ্যাঁগা মেনকা, তোমার স্বভাব-চরিত্র তো ভাল মনে হচ্ছে না। আইবুড়ো মেয়ে বলি তোমার দুধ আসে কি করে? আমি দেখেছি তুমি খোকাকে খাওয়াও। ছেলেপিলে হয়েছে নাকি? স্পষ্ট করে বল বাপু, যতই সুন্দরী হও, নষ্ট মেয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

মেনী হেসে বললে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হয়েছে বুঝি। ভয় নেই গোসাঁই ঠাকুর, আমার চরিত্রে এতটুকু খুঁত পাবে না, আমি

একবারে খাঁটী, যাকে বলে অপাপবিদ্ধা। অত শাস্ত্র পড়েছ পয়স্বিনী কন্যার কথা জান না? আমি হচ্ছি তাই। মাঝে মাঝে দুধ আসে, তিন-চার মাস থাকে, আবার দিনকতক বন্ধ হয়। তোমার ভাগ্য ভাল যে এ রকম একটা মেয়ে তোমার ঘরে এসেছে, তাই তোমার আধ-মরা ছেলেটা বেঁচে গেল, নিজের মায়ের দুধ তো ভাল করে খেতে পায় নি।

গোকুলবাবুর মনের খুঁতখুঁতনি দূর হল না। কিন্তু মেনকার রূপ তাঁকে যাদু করেছে। ভাবলেন স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, যা থাকে কপালে, মেনকাকে ছাড়তে পারব না। দু মাস যেতে না যেতেই বিয়ে হয়ে গেল।

গোকুলবাবুর অশান্তি বাড়তে লাগল। মেনকা রোজ রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যায়? রবিবারেও দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, হয়তো রোজই বেরিয়ে যায়। গোকুলবাবু স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, তৃতীয় পক্ষের রূপসী স্ত্রীকে চটাতে চান না। তবুও একদিন বলে ফেললেন, হ্যাঁগা, তুমি মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হও?

মেনকা বললে, সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি তো জেলখানার কয়েদী নই। তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় আড্ডা দিতে যাও আমি কি তা জানতে চাই?

গোকুলবাবু স্থির করলেন, চুপ করে থাকা উচিত নয়, জানতে হবে কার কাছে যায়। তিনি একটা টর্চ কিনে শোবার ঘরে এমন জায়গায় রাখলেন যাতে মেনকা টের না পায় অথচ তিনি চট করে সেটা হাতে নিতে পারেন। রাত্রে তিনি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন। মেনকা দুপুর রাতে বিছানা থেকে উঠে নিঃশব্দে বাইরে গেল, গোকুলবাবুও খালি পায়ে তার পিছু নিলেন।

উঠন পার হয়ে খিড়কির দরজা খুলে মেনকা বাড়ির পিছন দিকের একটা ছোট চালা ঘরে ঢুকল। সেখানে কাঠ কয়লা আর ঘুঁটে থাকে। মেনকার পরনে সাদা শাড়ি, সেজন্য অন্ধকারেও তাকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু চালা ঘরের ভেতরে গিয়ে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। টর্চের আলো ফেলে গোকুলবাবু দেখলেন, মেনকা নেই, একটা সাদা বেরাল শুয়ে আছে, চারটে বাচ্চা তার দুধ খাচ্ছে।

চার দিকে আলো ঘুরিয়ে গোকুলবাবু ডাকলেন, মেনকা!

মেনী বললে, কেন? চেঁচিও না, আমার বাচ্চারা ভয় পাবে।

মেনকার রূপান্তর দেখে গোকুলবাবুর মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেল, হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ কমল না, তিনি আশ্চর্যও হলেন না, শুধু মর্মাহত হয়ে বললেন, রাধামাধব, ব্রাহ্মণের বাড়িতে জারজ সন্তান!

মেনী বললে, আহা কি আমার ব্রাহ্মণ রে! নিজের মুখটা না হয় দেখতে পাচ্ছ না, পিছনে হাত দিয়ে দেখ না একবার।

গোকুলবাবু পিছনে হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর একটি প্রমাণ সাইজ ল্যাজ বেরিয়েছে। তাতেও তিনি আশ্চর্য হলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, কুলটা মাগী, কতগুলো নাগর আছে তোর?

—অত আমার হিসেব নেই।

—এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

—তুমি আমাকে তাড়াবার কে হে গোসাঁই? জান না, আমাদের হল মাতৃতন্ত্র সমাজ, যাকে বলে ম্যাট্রিআর্কি। আমাদের সংসারে মদ্দাদের সর্দারি চলে না, তারা একেবারে উটকো, শুধু ক্ষণেকের সাথী।

গোকুলবাবু প্রচণ্ড গর্জন করে মেনীকে কামড়াতে গেলেন। মেনী এক লাফে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—উর্‌র্‌র্যাও। (মার্জার-ভাষাবিৎ শ্রীদীপংকর বসু মহাশয় বলেন, এই রকম শব্দ করে মার্জার-জননী তার দূরস্থ সন্তানদের আহ্বান করে।)

মেনীর রুচির বৈচিত্র্য আছে, সে হরেক রকম পতির ঔরসে হরেক রকম অপত্য লাভ করেছে। তার ডাক শুনে নিমেষের মধ্যে সাদা কালো পাঁশুটে পাটকিলে ডোরা-কাটা প্রভৃতি নানা রঙের বেরাল ছুটে এসে বললে, কি হয়েছে মা? মেনী বললে, এই বজ্জাত হুলোটাকে দূর করে দে।

মেনীর সাতটা জোয়ান বেটা বাঘের মতন লাফিয়ে হুলোদশা-গ্রস্ত গোকুলবাবুকে আক্রমণ করলে। তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে করুণ রব করে লেংচাতে লেংচাতে পালিয়ে গেলেন।

তিন দিন পরে গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর প্রথমা পত্নী কাত্যায়নী দেবী এই চিঠি পেলেন।—পূজনীয়া বড়দিদি, আমি আপনার অভাগিনী ছোট বোন, তৃতীয় পক্ষের সতিন মেনকা। কাল রাত্রে গোঁসাইজী আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। যাবার সময় পইতে ছিঁড়ে দিব্যি গেলে বলে গেছেন, আর কদাপি ফিরে আসবেন না, সংসারে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তাঁর বিষয়সম্পত্তি দেখা আমার সাধ্য নয়, অতএব আপনি পত্রপাঠ আপনার ছেলেদের নিয়ে এখানে চলে আসুন, নিজের বিষয় দখল করুন। সুকু-দিদি একটি ছেলে রেখে গেছেন, এখন তার বয়স ন-দশ মাস হবে। খাসা ছেলে, দেখলেই আপনার মায়া হবে। আমি আর এখানে থাকব না, আপনি এলেই সব ভার আপনাকে দিয়ে আমার মায়ের কাছে চলে যাব। ইতি সেবিকা মেনকা।

কাত্যায়নী দেরি করলেন না, তাঁর ছেলেদের নিয়ে স্বামীর ভিটেয় ফিরে এলেন। সুকুমারীর ছেলেকে আদর করে কোলে নিয়ে বললেন, এ আমারই ছোট খোকা।

মেনকা আশ্চর্য মেয়ে, মোটেই লোভ নেই। কাত্যায়নী তাঁর ছোট সতিনের জন্য একটা মাসহারার ব্যবস্থা করতে চাইলেন, কিন্তু

মেনকা বললে, কিচ্ছু দরকার নেই দিদি, আমার মায়ের ওখানে কোনও অভাব নেই। রাহাখরচ পর্যন্ত সে নিলে না। চলে যাবার সময় বললে, দিদি, আপনি সধবা মানুষ, কর্তার খবর পান আর না পান মাছ অবশ্যই খাবেন, নয়তো তাঁর অমঙ্গল হবে। আর আমার একটি অনুরোধ আছে—একটা বুড়ো হুলো বেরাল রোজ এ বাড়িতে আসে, তাকে একটু দয়া করবেন, ভাতের সঙ্গে কিছু মাছ মেখে খেতে দেবেন, পারেন তো একটু দুধও দেবেন। আহা, বেচারা অথর্ব হয়ে গেছে।

কাত্যায়নী বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেবো না বোন, তোমার হুলোকে আমি ঠিক খেতে দেব।

১৩৫৯

গন্ধমাদন-বৈঠক

পুরাণে সাত জন চিরজীবীর নাম পাওয়া যায়—অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ, কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ। এঁরা একবার একত্র হয়েছিলেন।

বদরিকাশ্রমের উত্তরপূর্বে গন্ধমাদন পর্বত। বনবাসকালে ভীম যখন দ্রৌপদীর উপরোধে সহস্রদল পদ্ম আনতে যান যখন গন্ধমাদনে হনুমানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর থেকে হনুমান সেখানেই বাস করছেন।

একটি প্রকাণ্ড অক্ষোট অর্থাৎ আখরোট গাছের নীচে প্রতিদিন অপরাহ্ণে হনুমান বার দিয়ে বসেন। সেই সময় নিকটবর্তী অরণ্যের অধিবাসী বহুজাতীয় বানর ভল্লুক প্রভৃতি বুদ্ধিমান প্রাণী তাঁকে দর্শন করতে আসে। হনুমান নানাপ্রকার বিচিত্র কথা বলেন, তাঁর ভক্তেরা পরম আগ্রহে তা শোনে।

একদিন হনুমান অক্ষোটতরুতলে সমাসীন হয়ে ভক্তবৃন্দের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এমন সময় জাম্ববানের বংশধর একটি বৃদ্ধ ভল্লুক করজোড়ে বললে, প্রভু, আপনার লঙ্কাদাহনের ইতিহাসটি আর একবার আমরা শুনতে ইচ্ছা করি।

হনুমান বললেন, সাগরলঙ্ঘন করে লঙ্কায় গিয়ে দেবী জানকীর সঙ্গে দেখা করার পর আমি বিস্তর রাক্ষস বধ করেছিলাম। তার পর ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে কাবু করে ফেললেন। তখন রাক্ষসরা শণ আর বল্কলের রজ্জু দিয়ে আমাকে বেঁধে রাবণের কাছে নিয়ে চলল। আমি ভাবলাম, এ তো মজা মন্দ নয়, বিনা চেষ্টায় রাবণের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—

এই পর্যন্ত বলার পর হনুমান দেখলেন, একজন নিবিড়শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে তাঁর কাছে আসছেন। সভায় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই নিমেষের মধ্যে নিকটস্থ অরণ্যে অন্তর্হিত হল। আগন্তুক হনুমানের কাছে এসে নমস্কার করে বললেন, মহাবীর, আমাকে চিনতে পার?

হনুমান উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে, এ যে দেখছি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ! বহু বৎসর পরে দেখা হল। মহারাজ, সমস্ত কুশল তো? লঙ্কা থেকে কবে এসেছ? এখানে আছ কোথায়?

বিভীষণ বললেন, কাল এসেছি। বদরিকাশ্রমে আমার পত্নীকে রেখে তোমাকে দেখতে এলাম। সমস্ত কুশল, তবে আমার লঙ্কারাজ্য আর নেই।

—সেকি? সিংহল তো রয়েছে।

—সিংহল লঙ্কা নয়, লোকে ভুল করে। লঙ্কা সাগরগর্ভে বিলীন হয়েছে। আমি এখন নিষ্কর্মা, রাজ্যহীন হয়ে ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই, কোনও স্থায়ী আবাস নেই, মহেশ্বর আর রামচন্দ্রের কৃপায় কোনও অভাবও নেই। রাজ্য গেছে তাতে ভালই হয়েছে, আজকাল রাজাদের বড় দুর্দিন চলছে।

—বটে! পৃথিবীর আর সব খবর কি বল। লোকে রামচন্দ্রের কীর্তিকথা ভুলে যায় নি তো?

—ভুলে যায় নি, তোমার খ্যাতিও রামচন্দ্রের চাইতে কম নয়, কিন্তু বাংলা দেশে অন্য রকম দেখেছি।

—কি রকম?

—সেখানকার লোকে রামের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখায়, ভূত তাড়াবার জন্য রাম রাম বলে, কিন্তু তাঁর পূজা করে না, কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করে। সব চেয়ে দুঃখের কথা, তোমাকে তারা বিদ্রূপ করে। একনিষ্ঠ প্রভুভক্তি আর অলৌকিক বীরত্বের মহিমা বোঝবার শক্তি বাঙালীর নেই।

—তোমার কথা কি বলে ?

—সে অতি কুৎসিত কথা। আমাকে বলে—ঘরভেদী বিভীষণ। জয়চাঁদ, মীরজাফর, লাভাল আর কুইসলিংএর দলে আমাকে ফেলেছে। ন্যায় আর ধর্মের জন্যই আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তা কেউ বোঝে না।

এই সময় আর একজন সেখানে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ শীর্ণ মলিন দেহ, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে চীরবাস, গায়ে কর্কশ কম্বল। এককালে বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। আগন্তুক বললেন, মহাবীর হনুমান আর রাক্ষসরাজ বিভীষণের জয় হক।

হনুমান বললেন, কে আপনি সৌম্য ? ব্রাহ্মণ মনে হচ্ছে, প্রণাম করি।

—না না প্রণাম করতে হবে না। আমি ভরদ্বাজের বংশধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কিন্তু ভাগ্যদোষে পতিত হয়েছি।

হনুমান বললেন, অশ্বত্থামা নাম শুনেছি বটে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস এখানে। কোন্ পাপে তোমার পতন হল ?

—সে অনেক কথা। পাণ্ডবরা জঘন্য কপট উপায়ে আমার পিতাকে বধ করেছিল, তারই প্রতিশোধে আমি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলাম, পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভে দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম। তাই কৃষ্ণ আমাকে শাপ দিয়েছিলেন—নরাধম, তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত ও পূযশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। সেই শাপের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আমি ব্যাধিমুক্ত, ইচ্ছানুসারে সর্ব জগৎ পরিভ্রমণ করি। কিন্তু আমার শান্তি নেই, মন ব্যাকুল হয়ে আছে। এখন আমার বার্তা শুনুন। ভগবান পরশুরাম আমাকে আজ্ঞা করেছেন, বৎস সপ্ত চিরজীবী যাতে গন্ধমাদন পর্বতে সমবেত হন তার আয়োজন কর। দৈবক্রমে বিভীষণ এখানে এসে পড়েছেন,

আমরা তিন জন একত্র হয়েছি, অবশিষ্ট চার জনকে আমি আহ্বান করেছি। ওই যে, ওঁরাও এসে গেছেন।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বিরোচনপুত্র দৈত্যরাজ বলি, এবং অশ্বত্থামার মাতুল কৃপ উপস্থিত হলেন। হনুমান সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বললেন, আজ আমার জন্ম সফল হল, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরাম আমার আশ্রমে পদার্পণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মহাজ্ঞানী মহর্ষি ব্যাস, দানশৌণ্ড মহাকীর্তিমান বলি, এবং সর্বাস্ত্রবিশারদ কৃপাচার্যও এসেছেন। আরও সৌভাগ্য এই যে বহুকাল পরে আমার মিত্র বিভীষণের দর্শন পেয়েছি এবং দ্রোণপুত্র মহারথ অশ্বত্থামাও উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সপ্ত চিরজীবী সমবেত হয়েছি, এখন শ্রীপরশুরাম আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে।

পরশুরাম বললেন, তোমরা বোধ হয় জান যে বসুন্ধরার অবস্থা বড়ই সংকটময়। ধর্ম লুপ্ত হয়েছে,সমস্ত প্রজা যুদ্ধের ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। শুনেছি দু-চার জন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পেরে উঠছেন না। আমরা এই সপ্ত চিরজীবী অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক কীর্তি করেছি। মহর্ষি ব্যাসের রসনাগ্রে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস অবস্থান করছে। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাস্ত করেছিলেন, অসংখ্য সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা এঁর আছে। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রসমরে অশেষ পরাক্রম দেখিয়েছেন কিন্তু কদাচ ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করেন নি। বিভীষণ আর অশ্বত্থামা দুজনেই মহারথ, অধিকন্তু সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ রাখেন। পবননন্দন হনুমান বাহুবলে চরিত্রগুণে এবং প্রভুভক্তিতে অদ্বিতীয়। আর, আমার কীর্তি তো তোমরা সকলেই জান, নিজের মুখে আর

বলতে চাই না। এখন আমাদের কর্তব্য, সাত জনে মন্ত্রণা করে এই দারুণ কলিযুগের উপযুক্ত ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বেঁধে দেওয়া।

দৈত্যরাজ বলি বললেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য নিবেদন করছি। এক ব্যাসদেব ছাড়া আমরা সকলেই এক কালে অসংখ্য বিপক্ষ বধ করেছি। আমরা কেউ ধর্মযুদ্ধ করি নি, অপরাধীর সঙ্গে বিস্তর নিরপরাধ লোককেও বিনষ্ট করেছি। ধর্মযুদ্ধের আমরা কি জানি? ব্যাসদেবও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিবারণ করতে পারেন নি। আসল কথা, ধর্মযুদ্ধ হতেই পারে না, যুদ্ধ মাত্রেই পাপযুদ্ধ। যে বীর যত শত্রু মারেন তিনি তত পাপী।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বলতে চাও আমরা সকলেই পাপী?

—আজ্ঞে হাঁ, ব্যসদেব ছাড়া। আমাদের মধ্যে শ্রীহনুমান সব চেয়ে কম পাপী, কারণ উনি শুধু হাত পা আর দাঁত দিয়ে লড়েছেন, বড় জোর গাছ আর পাথর ছুড়েছেন। উনি ধনুর্বিদ্যা জানতেন না, দূর থেকে বহু প্রাণী বধ করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হনুমান বুক ফুলিয়ে বললেন, দৈত্যরাজ, তুমি কিছুই জান না। ধনুর্বাণের কোনও প্রয়োজনই আমার হয় নি, শুধু হাত পা দিয়েই আমি সহস্র কোটি রাক্ষস বধ করেছি।

বিভীষণ বললেন, ওহে মহাবীর, পৌরাণিক ভাষা তুমি তো বেশ আয়ত্ত করেছ! পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন মোটে দু শ কোটি, ত্রেতাযুগে ঢের কম ছিল।

পরশুরাম বললেন, বেশ, মেনে নিচ্ছি হনুমান সব চাইতে কম পাপী। সব চাইতে বড় পাপী কে?

বলি বললেন, আজ্ঞে, সে হচ্ছে আপনি। একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, শিশুকেও বাদ দেন নি।

পরশুরাম বললেন, দেখ বলি, পিতামহ প্রহ্লাদের প্রশ্রয় আর বিষ্ণুর অনুগ্রহ পেয়ে তোমার বড়ই স্পর্ধা হয়েছে। আমি বহু দিন

অস্ত্র ত্যাগ করেছি, নতুবা তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতাম। ধর্মাধর্মের তুমি কতটুকু জান হে দৈত্য ? বিষ্ণুক্রান্তা ধরণী থেকে তুমি নির্বাসিত হয়েছ, পাতালে অবরুদ্ধ হয়ে আছ, আজ শুধু আমার অনুরোধে বিষ্ণু তোমাকে দু দণ্ডের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।

বলি বললেন, প্রভু পরশুরাম, আপনি অবতার হতে পারেন, কিন্তু আপনার ধর্মাধর্মের ধারণা অত্যন্ত সেকেলে। ওহে অশ্বত্থামা, তুমি তো সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছ, অনেক খবর রাখ, যুদ্ধ সম্বন্ধে এখনকার মনীষীদের মতামত কি শুনিয়ে দাও না।

অশ্বত্থামা বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রের কর্তারা বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত আছি ; যদি বিপক্ষ রাষ্ট্র আমাদের কোনও ক্ষতি করে তবে অবশ্যই লড়ব। পক্ষান্তরে কয়েক জন ধর্মপ্রাণ মহাত্মা বলেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, যুদ্ধ মাত্রেই অধর্ম। অন্যায় সইবে না, অন্যায়কারীকে প্রাণপণে বাধা দেবে, কিন্তু কদাপি হিংসার আশ্রয় নেবে না। অহিংস প্রতিরোধের ফলেই কালক্রমে বিপক্ষের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

পরশুরাম বললেন, কলিযুগের বুদ্ধি আর কতই হবে! ঘরে মশা ইঁদুর বা সাপের উপদ্রব হলে যে গৃহস্থ অহিংস হয়ে থাকে তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। যারা স্বভাবত দুরাত্মা অহিংস উপায়ে তাদের জয় করা যায় না। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং এই উপদেশ সদাশয় বিপক্ষের বেলাতেই খাটে। দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল কি ? যাঁরা এখন অহিংসার প্রচার করেছেন তাঁরা যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন কি ?

অশ্বত্থামা বললেন, আজ্ঞে না। আমি যে অধর্মযুদ্ধ করেছিলাম তার জন্য কৃষ্ণ আমাকে ত্রিসহস্রবর্ষভোগ্য দারুণ শাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় আমার ব্রহ্মশির অস্ত্র অতি তুচ্ছ। এখন যাঁরা আকাশ থেকে বজ্রময় প্রলয়াগ্নি ক্ষেপণ করে জনপদ ধ্বংস

করেন, নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র নিরপরাধ প্রজা হত্যা করেন, তাঁদের কেউ শাপ দেয় না। আধুনিক বীরগণের তুল্য উৎকট পাপী সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ছিল না।

বলি মৃদুস্বরে বললেন, ছিল। আমাদের এই জামদগ্ন্য পরশুরাম যে একুশ বার ক্ষত্রিয়সংহার করেছিলেন, নৃশংসতায় তার তুলনা হয় না।

পরশুরামের শ্রবণশক্তি একটু ক্ষীণ, বলির কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, বীরের পাপপুণ্য বিচার করা অত সহজ নয়। দুষ্ক্রিয়া যখন দেশব্যাপী হয়, অথবা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যখন উপদেশে বা অনুরোধে কোন ফল হয় না, তখন ঝাড়ে বংশে নির্মূল করাই একমাত্র নীতি, কে দোষী কে নির্দোষ তার বিচারের প্রয়োজন নেই।

বিভীষণ বললেন, একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত (T. H. Huxley) বলেছেন, নীতি হচ্ছে দুরকম; নিসর্গনীতি (cosmic law) আর ধর্মনীতি (moral law)। প্রথমটি বলে, আত্মরক্ষা আর স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরের সর্বনাশ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুসারেই লোকে মশা ইঁদুর সাপ বাঘ ইত্যাদি মারে, খাদ্যের জন্য জীবহত্যা করে, লক্ষ লক্ষ কীট বধ করে কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে, সভ্যসবল জাতি অসভ্য দুর্বল জাতিকে পীড়ন বা সংহার করে, যুদ্ধকালে যে-কোনও উপায়ে বিপক্ষকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ধর্মনীতি বলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদাপি পরের অনিষ্ট করবে না, সকলকেই আত্মীয় মনে করবে। কিন্তু কেবল ধর্মনীতি অবলম্বন করে কি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, স্বার্থ আর পরার্থ বজায় রাখা যায়, তার পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। রাজনীতিক পণ্ডিতগণ অবস্থা বুঝে প্রথম বা দ্বিতীয় নীতির ব্যবস্থা করেন, সাধারণ মানুষও তাই করে। তবে ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মারা আশা করেন যে মানবজাতি ক্রমশ নিসর্গনীতি বর্জন করে ধর্মনীতি আশ্রয় করবে।

আমাদের এই ভগবান ভার্গব নিসর্গনীতি অনুসারেই একুশ বার ক্ষাত্রিয় সংহার করেছিলেন।

পরশুরাম বললেন, ঠিক করেছিলাম। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যই অবতাররা আসেন। তাঁরা চটপট ধর্ম-সংস্থাপন করতে চান, অগণিত দুর্বুদ্ধি পাপীকে উপদেশ দিয়ে সৎপথে আনবার সময় তাঁদের নেই। এখনকার লোকহিতৈষী যোদ্ধারা যদি অনুরূপ উদ্দেশ্যে নির্মম হয়ে যুদ্ধ করেন তাতে আমি দোষ দেখি না।

অশ্বত্থামা বললেন, কিন্তু একাধিক প্রবল পক্ষ থাকলে নিসর্গ-নীতিও জটিল হয়ে পড়ে। সকলেই বলে, অন্যায় উপায়ে যুদ্ধ করা চলবে না, অথচ ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তারা একমত হতে পারে না। প্রত্যেক পক্ষই বলতে চায়, তাদের যে অস্ত্র আছে তার প্রয়োগ ন্যায়সম্মত, কিন্তু আরও নিদারুণ নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ ঘোর অন্যায়।

পরশুরাম বললেন, আমাদের মধ্যে আলোচনা তো অনেক হল, এখন তোমরা নিজের নিজের মত প্রকাশ করে বল—ধর্মযুদ্ধের লক্ষণ কি? কিপ্রকার যুদ্ধ এই কলিযুগের উপযোগী? বলি, তুমিই আগে বল।

বলি বললেন, যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করে নিরন্তর শ্রীহরির নাম কীর্তন করতে হবে, কলিতে অন্য গতি নেই।

পরশুরাম বললেন, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, বামনদেবের তৃতীয় পদের নিপীড়নে তোমার মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে গেছে। বিভীষণ কি বল?

বিভীষণ বললেন, যেমন চলছে চলুক না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম রচনায় প্রয়োজন কি। তাতে কোনও ফল হবে না, আমাদের বিধান মানবে কে? অশ্বত্থামা, তোমার মত কি?

অশ্বত্থামা বললেন, তিন হাজার বৎসর শাপ ভোগ করে আমার বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে, বিচারের শক্তি নেই। আমার পূজ্যপাদ মাতুলকে জিজ্ঞাসা করুন।

কৃপাচার্য বললেন, যুদ্ধের কোনও কথায় আমি থাকতে চাই না। আমি আজকাল সংগীত সাধনা করছি।

হনুমান বললেন, আপনারা ভাববেন না, ধর্মযুদ্ধের নিয়ম বন্ধন অতি সোজা। সেনায় সেনায় যুদ্ধ এবং সর্ববিধ অস্ত্রের প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। দুই পক্ষের যাঁরা প্রধান তাঁরা মল্ল-যুদ্ধ করবেন, যেমন বালী আর সুগ্রীব, ভীম আর কীচক করেছিলেন। কিন্তু চড় লাথি দাঁত নখ প্রভৃতি স্বাভাবিক অস্ত্রের প্রয়োগে আপত্তির কারণ নেই।

বিভীষণ বললেন, মহাবীর তোমার ব্যবস্থায় একটু ত্রুটি আছে। দুই বীর সমান বলবান না হলে ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। মনে কর, চার্চিল আর স্তালিন, কিংবা ট্রুমান আর মাও-সে-তুং, এঁরা মল্লযুদ্ধ করবেন। এঁদের দৈহিক বলের পাল্লা সমান করবে কি করে?

হনুমান বললেন, খুব সোজা। একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ থাকবেন, যে বেশী বলবান তাকে তিনি প্রথমেই যথোচিত প্রহার দেবেন, যাতে তার বল প্রতিপক্ষের সমান হয়ে যায়।

বিভীষণ বললেন, যেমন ঘোড়দৌড়ের হ্যাণ্ডিক্যাপ।

পরশুরাম বললেন, বৎস্ হনুমান, কোনও মানুষ তোমার এই বানরিক বিধান মেনে নেবে না। ব্যাসদেব নীরব রয়েছেন কেন, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ওহে ব্যাস, ওঠ ওঠ।

পরশুরামের ঠেলায় মহর্ষি ব্যাসের ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি। এখন একটু সৃষ্টিতত্ত্ব বলছি শুনুন। ভগবান স্বয়ম্ভু কারণবারি সৃষ্টি করে সপ্ত সমুদ্র পূর্ণ করলেন। কালক্রমে সেই বারিতে সর্বজীবের মূলীভূত প্রাণপঙ্ক উৎপন্ন হল, যার পাশ্চাত্ত্য নাম প্রোটোপ্লাজ্ম। কোটি বৎসর পরে তা সংহত হয়ে প্রাণকণায় পরিণত হল, এখন যাকে বলা হয় কোষ বা সেল। এই প্রাণকণাই সকল উদ্ভিদ আর প্রাণীর

আদিরূপ। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই কিন্তু চেষ্টা আছে, অন্তর্লীন আত্মাও আছে। আরও কোটি বৎসর পরে বহু কণার সংযোগের ফলে বিভিন্ন জীবের উদ্‌ভব হল, যেমন ইষ্টকের সমবায়ে অট্টালিকা। প্রাণকণার যে পৃথক প্রাণ আর আত্মা ছিল, জীবশরীরে তা সংযুক্ত হয়ে গেল। ক্রমশ জীবের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি উদ্‌ভূত হল কিন্তু বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না কারণ সর্বশরীরব্যাপী একই প্রাণ আর আত্মা তাদের নিয়ন্তা।

পরশুরাম বললেন, হে ব্যাস, তোমার ব্যাখ্যান থামাও বাপু, আমি তোমার শিষ্য নই।

ব্যাস বললেন, দয়া করে আর একটু শুনুন। কালক্রমে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের উৎপত্তি হল, তারা সমাজ গঠন করলে। ইতর প্রাণীরও সমাজ আছে, কিন্তু মানবসমাজ এক অত্যাশ্চর্য ক্রমবর্ধমান পদার্থ। বিভিন্ন মানুষ কামনা করছে—আমরা সকলে যেন এক হই। এই কামনার ফলে সামাজিক প্রাণ আর সামাজিক আত্মা ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হচ্ছে, ব্যষ্টিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থানে সমষ্টিগত বৃহৎ স্বার্থের উপলব্ধি আসছে। কিন্তু সৃষ্টির ক্রিয়া অতি মন্থর, একত্ববোধ সম্পূর্ণ হতে বহু কাল লাগবে। তার পর আরও বহু কাল অতীত হলে বিভিন্ন মানব সমাজও একপ্রাণ একাত্মা হবে। তখন বিশ্বমানবাত্মক বিরাট পুরুষই সমস্ত সমাজ আর মানুষকে চালিত করবেন, অঙ্গে অঙ্গে যেমন যুদ্ধ হয় না সেইরূপ মানুষে মানুষেও যুদ্ধ হবে না।

পরশুরাম প্রশ্ন করলেন, তোমার এই সত্যযুগ কত কাল পরে আসবে?

—বহু বহু কাল পরে। তত দিন মানবজাতির বিরোধ নিবৃত্ত হবে না, কিন্তু লোকহিতৈষী মহাত্মারা যদি অহিংসা আর মৈত্রী প্রচার করতে থাকেন তবে তাঁদের চেষ্টার ফলে ভাবী সত্যযুগ তিল তিল করে এগিয়ে আসবে। এখন আপনারা নিজ নিজ স্থানে ফিরে

যান, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধৈর্য ধরে থাকুন, তার পর আবার এখানে সমবেত হয়ে তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

পরশুরাম বললেন, হুঁ, খুব ধূমপান করছ দেখছি, দশ-বিশ হাজার বৎসর বলতে মুখে বাধে না। ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।

১৩৫৯

গল্পকল্প

গামানুষ জাতির কথা

যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। তর্ক উঠতে পারে, আমরা সকলেই যখন পঞ্চত্ব পেয়েছি তখন এই গল্প লিখছে কে পড়ছেই বা কে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। লেখক আর পাঠকরা দেশকালের অতীত, তাঁরা ত্রিলোকদর্শী ত্রিকালজ্ঞ। এখন যা হয়েছিল শুনুন।

বড় বড় রাষ্ট্রের যাঁরা প্রভু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিন থেকেই চলছিল। ক্রমশঃ তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মিটমাটের আর আশা রইল না। সকলেই নিজের নিজের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি ন্যাশনাল অ্যানথেম রূপে গাইতে লাগলেন —'আমরা ইরান দেশের কাজী, যে বেটা বলিবে তা না না না সে বেটা বড়ই পাজী।' অবশেষে যখন কর্তারা স্বপক্ষের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে বজ্জাত বিপক্ষ গোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে বেঁচে সুখ নেই তখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছাড়লেন। বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ন বোমা তুলো-ভরা বালিশ মাত্র।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বোমা-বিশারদগণ আশা করেছিলেন যে অপরাপর পক্ষের যোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ সাবাড় করবেন। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সকলেরই আয়োজন শেষ হয়েছিল এবং তাঁরা গুপ্তচরের মারফত পরস্পরের মতলব টের পেয়ে একই দিনে একই শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করলেন।

সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য কোনও দেশ নিস্তার পেলে না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা,

মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল। কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না। সাগরগর্ভে পর্বতকন্দরে জনহীন দ্বীপে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য স্থানে কিছু উদ্ভিদ আর ইতর প্রাণী বেঁচে রইল। তাদের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের দরকার নেই, যাদের নিয়ে এই ইতিহাস তাদের কথাই বলছি।

লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। তাদের বেশীর ভাগই বোমার তেজে বিলীন হল কিন্তু কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর দৈবক্রমে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীববিজ্ঞাণীরা যাকে বলে মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতন হল, পিছনের পা এত মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল, মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল, এক কথায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেলে। কর্ণ যেমন সূর্যের বরে সহজাত কুণ্ডল আর কবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, এরা তেমনি গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরও বেড়ে গেল।

এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না, তা ছাড়া বার বার চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার উপর জুলুম হবে। এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব।

এখন কিঞ্চিৎ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতে হচ্ছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা মোটামুটি পঁচিশ বৎসর মানুষের এক পুরুষ এই হিসাবে বংশপর্যায় গণনা করেন। অতএব ১৮০০০ বৎসরে ৭২০ পুরুষ। আমাদের উর্দ্ধতম ৭২০ নম্বর পুরুষ কেমন ছিলেন? নৃবিদ্যাবিশারদগণ বলেন, এঁরা পুরোপলীয় অর্থাৎ প্রাচীন উপল যুগের লোক, চাষ করতে শেখেন নি, কাপড় পরতেন না, রাঁধতেন না, কাঁচা মাংস খেতেন, গুহায় বাস করতেন। ভেবে দেখুন, মোটে ৭২০ পুরুষে আমাদের কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের যেমন পঁচিশ বৎসরে, ইন্দুরোদ্‌ভব গামানুষদের তেমনি পনের দিনে এক পুরুষ, কারণ তারা জন্মাবার পনর দিন পরেই বংশরক্ষা করতে পারে। মানবজাতি ধ্বংস হবার পর যে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে গামানুষ জাতির ৭২০ পুরুষ জন্মেছে। অর্থাৎ গামানুষের ত্রিশ বৎসর আমাদের ১৮০০০ বৎসরের সমান। যদি সন্দেহ থাকে তবে অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে গামানুষ অতি দ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বমানব যে বিদ্যা কলা আর ঐশ্চর্যের অহংকার করত গামানুষ তার সমস্তই পেয়েছে। অবশ্য তাদের সকল শাখাই সমান সভ্য আর পরাক্রান্ত হয় নি, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, সাদা-কালার ভেদ, রাজনীতির ভেদ, ছোট বড় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, পরাধীন প্রজা, দ্বেষ-হিংসা এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগ আছে, যুদ্ধবিগ্রহও বিস্তর ঘটেছে। বার বার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী গামানুষদের মাথায় এই সুবুদ্ধি এল—ঝগড়ার দরকার কি, আমরা সকলে একমত হয়ে কি শান্তিতে থাকতে পারি না? আমাদের বর্তমান সভ্যতার তুলনা নেই, আমরা বিশ্বের বহু রহস্য ভেদ করছি, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছি, শারীরিক ও সামাজিক বহু ব্যাধির উচ্ছেদ করেছি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও মহা মহা জ্ঞানীরা যদি

একযোগে চেষ্টা করেন তবে বিভিন্ন জাতির স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় অবশ্যই হবে।

জনহিতৈষী পণ্ডিতগণের নির্বন্ধে রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতী বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজনীতিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় উপস্থিত হলেন, অনেক রবাহূত ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

আমাদের দেশে হরেক রকম সভায় কার্যারম্ভের আগে সংগীতের এবং কার্যাবলীর মধ্যে মধ্যে কুমারী অমুক অমুকের নৃত্যের দস্তুর আছে। পরাক্রান্ত গামানুষ জাতির রসবোধ কম, তারা বলে, আগে ষোল আনা কাজ তার পর ফুর্তি। তাদের জীবনকালও কম সেজন্য বক্তৃতাদি অতি সংক্ষেপে চটপট শেষ করে। প্রথমেই সভাপতি মনস্বী চং লিং সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সভায় যেকোনও উপায়ে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা গামানুষ জাতির নিস্তার নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর একটি অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউন্ট নটেনফ বললেন, জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সম্মত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় নি সেই কারণেই বিশ্বশান্তি হচ্ছে না। দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচা মাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ বললেন, জগতের

শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে তেমন আর কারও নেই। আমরা শক্তিমান হলে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকবে। কাঁচা মাল চাও তো উপযুক্ত শর্তে কিছু দিতে পারি। আমাদের হেফাজতে যেসব অসভ্য আর অর্ধসভ্য দেশ আছে তার উপর লোভ করো না, আমরা তো সেসব দেশবাসীর অছি মাত্র, তারা লায়েক হলেই ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হব। আমরা কারও অনিষ্ট করি না, বিপদ যদি ঘটে আমার বন্ধু কীপফ-এর প্রকাণ্ড দেশই তার জন্য দায়ী হবে। এঁর দেশে স্বাধীন শিল্প আর কারবার নেই, সবই রাষ্ট্রের অঙ্গ। যাঁরা সমাজের মস্তকস্বরূপ সেই অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীই ওখানে নেই। এঁদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরেই দেখতে পাবেন এঁদের কদর্য নীতি আর সস্তা মালে জগৎ ছেয়ে যাবে, আমাদের সকলেরই সমাজ ধর্ম আর ব্যবসার সর্বনাশ হবে। যদি শান্তি চান তো আগে এঁদের শায়েস্তা করুন।

জেনারেল কীপফ তাঁর মোটা গোঁফ পাক দিয়ে বললেন, বন্ধুবর লর্ড গ্র্যাবার্থ প্রচণ্ড মিছে কথা বলেছেন তা আপনারা সকলেই বোঝেন। ওঁর রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে রেখেছে, ওঁরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে বার বার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন। এর শোধ একদিন তুলব, এখন বেশী কিছু বলতে চাই না।

পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী বললেন, লর্ড গ্র্যাবার্থ যে অছিগিরির দোহাই দিলেন তা নিছক ভণ্ডামি। আমরা লায়েক কি নালায়েক তার বিচারের ভার যদি ওঁরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনও কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য—সমস্ত সাম্রাজ্যের লোপ সাধন এবং সর্ব জাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।

মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ চোখ বুজে বসে ছিলেন। এখন মৌন ভঙ্গ করে অবলদাসের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন,

কোনও চিন্তা নেই বৎস, আমি আছি। আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে। গৌরীশংকর-শিখরবাসী মহর্ষিদের সঙ্গে আমার হরদম চিন্তাবিনিময় হয়, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

কর্মযোগী ধর্মদাসজী বললেন, এসব বাজে কথায় কিছুই হবে না। আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবে রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধি আসবে। আমার ব্যবস্থা অতি সোজা—সকলে নিরামিষ খাও, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন কর, এক মাস [মানুষের হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর] নিরবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন কর, এই সময়ের মধ্যে বুড়োরা আপনিই মরে যাবে, নূতন প্রজাও জন্মাবে না, তার ফলে জগতের জনসংখ্যা অর্ধেক হয় যাবে, খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থাকবে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই দরকার হবে না, বিশুদ্ধ ধর্মসংগত উপায়ে সকলেরই প্রয়োজন মিটবে।

পণ্ডিত সত্যকামজী বললেন, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক উপায়ে কিছুই হবে না। নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন আর ব্রহ্মচর্যও বৃথা, এসব উৎকট ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা জোর করে চালানো যাবে না। আমাদের দরকার সত্যভাষণ। এই সভার সদস্যগণ যদি মনের কপাট খুলে অকপটচিত্তে নিজেদের মতলব প্রকাশ করেন তবে বিশ্বশান্তির উপায় সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমরা বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছি কিন্তু গামানুষ চরিত্রে কিছুই করতে পারি নি। তার কারণ, বিজ্ঞানী যে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করেন তাতে প্রতারণা নেই, জড়প্রকৃতি ঠকায় না, সেজন্য তথ্যনির্ণয় সুসাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুরা মিথ্যা ভিন্ন এক পা চলতে পারেন না। এঁদের গূঢ় অভিপ্রায় কি তা প্রকাশ করে না বললে শান্তির উপায় বেরুবে না। রোগের সব লক্ষণ না জানালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কি করে?

লর্ড গ্র্যাবার্থ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, কেউ যদি মনের কথা বলতে না চায় তবে কার সাধ্য তা টেনে বার করে। সত্য কথা বলাবেন কোন উপায়ে?

জেনারেল কীপফ বললেন, ওষুধ খাইয়ে। সোডিয়ম পেণ্টোথাল শুনেছেন? এর প্রভাবে সকলেই অবশ হয়ে সত্য কথা বলে ফেলে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই জিনিসটি খাইয়ে দোষ কবুল করানো হয়, তার পর পটাপট গুলি। আমরা মকদ্দমায় সময় নষ্ট করি না, উকিলকেও অনর্থক টাকা দিই না।

বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, বোকা, বোকা, সব বোকা। পেণ্টোথালে লোকে জড়বুদ্ধি হয়। সত্য কথা বলে বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা এখানে নেশা করে আড্ডা দিতে আসি নি, জটিল বিশ্বরাজনীতিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছি। পেণ্টোথালের কাজ নয়, আমার সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন দিতে হবে। গাঁজা থেকে উৎপন্ন, অতি নিরীহ বস্তু, কিন্তু অব্যর্থ। যতই ঝানু কূটবুদ্ধি হন না কেন, ঘাড় ধরে আপনাকে সত্য বলাবে, অথচ বুদ্ধির কিছুমাত্র হানি করবে না। স্থায়ী অনিষ্টেরও ভয় নেই, এক ঘণ্টা পরে প্রভাব কেটে যাবে, তার পর যত খুশি মিথ্যা বলতে পারবেন। ওষুধটি আমার সঙ্গেই আছে, সভাপতি মশায় যদি আদেশ দেন তবে সকলকেই এক মুহূর্তে সত্য-বাদী করে দিতে পারি।

কাউণ্ট নটেনফ প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষা হয়েছে?

ভৃঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, হয়েছে বইকি। বিস্তর ইঁদুর আর গিনি-পিগের উপর পরীক্ষা করেছি।

জেনারেল কীপফ অট্টহাস্য করে বললেন, ইঁদুরের আবার সত্য মিথ্যা আছে নাকি? আপনি তাদের ভাষা জানেন?

নন্দী বললেন, নিশ্চয় জানি, তাদের ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারি। যদি বাঁয়ে ল্যাজ নাড়ে তবে জানবেন মতলব ভাল নয়, উদ্দেশ্য গোপন

করছে। যদি ডাইনে নাড়ে তবে বুঝবেন তার মনে কোন ছল নেই। তা ছাড়া আমার এক শিষ্যের উপর পরীক্ষা করেছি, তার ফলে বেচারার পত্নী বিবাহভঙ্গের মামলা এনেছে।

সভাপতি চং লিং বললেন, সন্দেহ রাখবার দরকার কি, এইখানেই পরীক্ষা হক না। কে ভলন্টিয়ার হতে চান—বিজ্ঞানপ্রেমী কে আছেন—এগিয়ে আসুন।

ধর্মদাসজী ডাক্তার নন্দীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি রাজী আছি, দিন ইনজেকশন।

নন্দী তখনই পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটি ম্যাগাজিন-সিরিঞ্জ বার করে ধর্মদাসের হাতে ফুঁড়ে পনর ফোঁট আন্দাজ চালিয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ার জন্য দু মিনিট সময় দিয়ে সভাপতি বললেন, ধর্মদাসজী, এইবারে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

ধর্মদাস বললেন, নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে মসলা বর্জন, সর্ব বিষয়ে অবিলাসিতা আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। তবে আমিও মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুত হয়েছি।

জেনারেল কীপফ সহাস্যে বললেন, এসব পাগলদের উপর পরীক্ষা করা বৃথা, এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও বেশী মিথ্যা বলে না, যা বিশ্বাস করে তাই প্রচার করে। আসুন, আমাকেই ইনজেকশন দিন, সত্য মিথ্যা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লর্ড গ্র্যাবার্থ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে কীপফের হাত ধরে বললেন, করেন কি, ক্ষান্ত হন, এসব বিশ্রী ব্যাপারে থাকবেন না। যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনও এতে রাজী হতে পারে? অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, একটা হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তা ছেড়ে দিতে পারি না। স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিস তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র, ত্যাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর

আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার লজ্জা নেই? এই সভার মধ্যে উলঙ্গ হওয়া যা মনের কথা প্রকাশ করাও তা।

জেনারেল কীপফ নিরস্ত হলেন না, গ্র্যাবার্থের মুঠো থেকে নিজের হাত সজোরে টেনে বাড়িয়ে দিলেন, ডাক্তার নন্দীও তৎক্ষণাৎ সূচী-প্রয়োগ করলেন। তার পর কীপফ দুই হাতে গ্র্যাবার্থকে জাপটে ধরে বললেন, শীগগির, এঁকেও ফুঁড়ে দিন, একটু বেশী করে দেবেন। ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী ডবল মাত্রা ভেরাসিটিন চালিয়ে দিলেন। কীপফের স্থূল লোমশ বাহুর বন্ধনে ছটফট করতে করতে গ্র্যাবার্থ বললেন, একি অত্যাচার! আপনারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন। সভাপতি মশায়, আপনি একেবারে অকর্মণ্য। উঠুন, এখনই আমার রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করুন।

কীপফ বললেন, বড় বেয়াড়া পেশেন্ট, হাড়ে হাড়ে রোগ ঢুকেছে, লাগান আরও দুই ডোজ। ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আর একবার ফুঁড়ে দিলেন। তারপর গ্র্যাবার্থ ক্রমশ শান্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, শুধু আমাদের দুজনকে কেন? ওই বজ্জাত গুণ্ডা নটেন-ফটাকেও দিন।

নটেনফ ঘুঁষি তুলে গ্র্যাবার্থকে আক্রমণ করতে এলেন। কীপফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, থামুন থামুন, সত্য বলতে এত ভয় কিসের? আমরা সকলেই তো পরস্পরের অভিসন্ধি বুঝি, খোলসা করে বললে কি এমন ক্ষতি হবে?

নটেনফ চুপি চুপি বললেন, আরে তোমাদের আমি গ্রাহ্য করি নাকি? আমার আপত্তির কারণ আলাদা। আন্তর্জাতিক অশান্তির চেয়ে পারিবারিক অশান্তি আরও ভয়ানক।

এমন সময় দর্শকদের গ্যালারি থেকে কাউন্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন, দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউন্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।

এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফপত্নী চিৎকার করে বললেন, এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।

সভাপতি চং লিং বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, প্রণয়িনীরা পালিয়ে যাবে না, এখন আমাদের কাজ করতে দিন। লর্ড গ্র্যাবার্থ, কাউন্ট নটেনফ, জেনারেল কীপফ, এখন একে একে খুলে বলুন আপনাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য কি।

গ্র্যাবার্থ বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতি সোজা, জোর যার মুলুক তার এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই। আমরা সভ্য অসভ্য শক্তিমান দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকেই যথাসাধ্য আদায় করতে চাই, এতে ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসে না। দুধ খাবার সময় বাছুরের দুঃখ কে ভাবে? যখন মাংসের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে গরু ভেড়া বাঘ সাপ ইঁদুর মশা মারেন তখন জীবের স্বার্থ গ্রাহ্য করেন কি? উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, অহিংস হ'য়ে পাথর খেয়ে বাঁচতে পারেন কি? আমরা সর্বপ্রকার সুখভোগ করতে চাই, তার জন্য সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের নিরঙ্কুশ হবার উপায় নেই, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, নিজের স্বভাবগত কোমলতা আছে—যাকে মূর্খরা বলে বিবেক বা ধর্মজ্ঞান। তা ছাড়া স্বজাতি আর মিত্রস্থানীয় বিজাতির মধ্যে জনকতক দুর্বলচিত্ত ধর্মিষ্ঠ আছে, তাদের সব সময় ধাপ্পা দেওয়া চলে না, ঠাণ্ডা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই সভার যা উদ্দেশ্য তা কোনও কালে সিদ্ধ হবে না। প্রতিপক্ষের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পাকা ব্যবস্থায় রাজী নই, আজ যা ছাড়ব সুবিধা পেলেই কাল আবার দখল করব। অভিব্যক্তিবাদ তো আপনারা জানেন, বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।

নটেনফ বললেন, আমাদের নীতিও ঠিক ওই রকম।

কর্মপদ্ধতির অল্প অল্প ভেদ আছে, কিন্তু মতলব একই। আমরা জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের একাধিপত্য একদিন আমাদের হাতে আসবেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হক আমরা মনস্কামনা সিদ্ধ করব।

কীপফ বলেন, আমরাও তাই বলি, তবে আপনাদের আর আমাদের পদ্ধতিতে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটি প্রকাণ্ড, এখনও অন্য দেশকে শোষণ করবার বিশেষ দরকার হয় নি, তবে ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা এখন থেকে হাত পাকাচ্ছি।

অবলদাসজী মাথা চাপড়ে বললেন, হায় হায়, এর চেয়ে মিথ্যা কথাই যে ভাল ছিল! তবু একটা আশা ছিল যে এরা এখন ক্ষমতার দম্ভে বুঝতে পারছে না, পরে হয়তো এদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে। আচ্ছা লর্ড গ্র্যাবার্থ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমরা অধীন জাতিরা একটু একটু করে শক্তিমান হচ্ছি। আপনারা যাই বলুন, জগতে সকল দেশে এখনও সাধু লোক আছেন, তাঁরা আমাদের সহায়। আমরা একদিন বন্ধনমুক্ত হবই। আমাদের মনে যে বিদ্বেষ জমছে তার ফলে ভবিষ্যতে আপনাদের কি সর্বনাশ হবে তা বুঝছেন? আমাদের সঙ্গে যদি এখনই একটা ন্যায়সংগত চুক্তি করেন এবং তার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের একেবারে বঞ্চিত করব না। এই সহজ সত্য আপনাদের মাথায় ঢোকে না কেন?

গ্র্যাবার্থ বললেন, অবশ্যই ঢোকে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে এক আনা পাব সেই আশায় উপস্থিত ষোল আনা কেন ছাড়ব? আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের জন্য মাথাব্যথা নেই।

অবলদাস দীর্ঘনিঃশাস ফেলে বসে পড়লেন। নিশ্চিন্ত মহারাজ আর একবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কি, আমি আছি।

ধর্মদাস বললেন, ইনজেকশন দিয়ে কি ভাল হল? সবই তো

আমাদের জানা কথা। আমাদের শাস্ত্রে অসুরপ্রকৃতির লক্ষণ দেওয়া আছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।

—আজ আমার এই লাভ হল, এই অভীষ্ট বিষয় পাব, এই আমার আছে, আবার এই ধনও আমার হবে। ওই শত্রু আমি হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরও হত্যা করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি যা করি তাই সফল হয়, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি অভিজাত, আমার সদৃশ আর কে আছে।

সভাপতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব তো জানা গেল, এখন শান্তির উপায় আলোচনা করুন।

গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ সমস্বরে বললেন, আমরা বেশ আছি, শান্তি টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবনযাপন করতে চাই।

এই সভার একজন সদস্য এতক্ষণ পিছন দিকে চুপচাপ বসে ছিলেন, ইনি আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলয় না। এখন ইনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বিশ্বশান্তির উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, আপনারও একটা ইনজেকশন আছে নাকি?

ব্যোমবজ্র উত্তর দিলেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ইনজেকশন দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা, তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা কস্মিক রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।

গ্র্যাবার্থ ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এখানে কোনও রহস্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের টাকায় আপনি গবেষণা করেছেন। আপনার যা বলবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে বলবেন।

নটেনফ লাফিয়ে বললেন, বাঃ, আমরাই তো ওঁর সমস্ত খরচ জুগিয়েছি! বোমা আমাদের।

কীপফ বললেন, আপনারা ড্যাম মিথ্যাবাদী। আমাদের রাষ্ট্র বহুদিন থেকে ওঁকে সাহায্য করে আসছে, ওঁর আবিষ্কার একমাত্র আমাদের সম্পত্তি।

ব্যোমবজ্র দুই হাতে বরাভয় দেখিয়ে বললেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার বোমায় আপনাদের সকলেরই স্বত্ব আছে, আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। অবলদাসজী, আপনাদেরও দলাদলি আর সকল দুর্দশা দূর হবে। এই বলে তিনি একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, বোমবজ্রজী, আর দেরী করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

বোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানটানিতে বোমাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মতন ফেটে গেল। কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ

আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর গ্রাবার্থ বললেন, শাস্ত্রীর বোমাটি ভাল, মনে হচ্ছে আমরা সবাই সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। নটেনফ কীপফ, তোমাদের আমি বড্ড ভালবাসি হে। অবলদাস, তোমরাও আমার পরমাত্মীয়। একটা নতুন ইণ্টারন্যাশনাল অ্যানথেম রচনা করেছি শোন—ভাই, ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। এস, এখন একটু কোলাকুলি করা যাক।

নিশ্চিন্ত মহারাজ অবলদাসের পিঠ চাপড়ে সগর্বে বললেন, হুঁ হুঁ, আমি বলছিলাম কিনা?

সভায় বিজয়াদশমী আর ঈদ মুবারকের ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল। খানিক পরে নটেনফ বললেন, আসুন দাদা, এখন বিশ্বের কয়লা তেল গম গরু ভেড়া শুয়োর তুলো চিনি রবার লোহা সোনা ইউরেনিয়ম প্রভৃতির একটা বাটোয়ারী হক। জন-পিছু সমান হিস্সা, কি বলেন?

বোমবজ্র সহাস্যে বললেন, কোনও দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন, বা আবার জন্মাতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কীপফ বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন, নাই বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।

১৩৫২

অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা

শয্যাশায়ী অটল চৌধুরী বললেন, দেখ ডাক্তার, আমি তোমার ঠাকুরদার চেয়েও বয়সে বড়, আমাকে ঠকিও না। মুখ খুলে বল মেজর হালদার কি বলে গেলেন। আর কতক্ষণ বাঁচব?

ডাক্তারবাবু বললেন, কেন সার আপনি ও কথা বলছেন, মরণ-বাঁচন কি মানুষের হাতে? আমরা কতটুকুই বা জানি। ভগবানের যদি দয়া হয় তবে আপনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন।

—বাঁচিয়ে রাখাই কি দয়ার লক্ষণ? তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে আর জ্বালিও না। এখন ডাক্তারী ধাপ্‌পাবাজি ছেড়ে দিয়ে সত্যি কথা বল। মরবার আগে আমি মনে মনে একটা বোঝাপাড়া করতে চাই।

—বেশ তো, এখনই করুন না, দু-দশ বছর আগে করলেই বা দোষ কি।

—তুমি ডাক্তারিই শিখেছ, বিজনেস শেখ নি। আরে, বছর শেষ না হলে কি সাল-তামামী হিসেব-নিকেশ করা যায়? ঠিক মরবার আগেই জীবনের লাভ-লোকশান খতাতে চাই—অবশ্য যদি জ্ঞান থাকে।

এমন সময় পুরুত ঠাকুর হরিপদ ভটচাজ এসে বললেন, কর্তাবাবু, প্রায়শ্চিত্তটা হয়ে যাক, মনে শান্তি পাবেন।

—কেন বাপু, আমি কি মানুষ খুন করেছি, না পরস্ত্রী হরণ

করেছি, না চুরি-ডাকাতি জাল-জুয়াচুরি আর মাদুলির ব্যবসা করেছি?

হরিপদ জিব কেটে বললেন, ছি ছি, আপনার মতন সাধুপুরুষ কজন আছেন? তবে কিনা সকলেরই অজ্ঞানকৃত পাপ কিছু কিছু থাকে, তার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত।

—দেখ ভটচাজ, আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নই, ভদ্রলোকের যতটুকু দুষ্কর্ম না করলে চলে না ততটুকু করেছি। তার জন্য আমার কিছুমাত্র খেদ নেই, নরকের ভয়ও নেই। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমরা যদি মনে শান্তি পাও তো করতে পার। কিন্তু এখানে নয়, নীচে পূজোর দালানে কর গিয়ে। ঘণ্টার আওয়াজ যেন না আসে।

হরিপদ 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ওঃ কি পাষণ্ড! মরতে বসেছে তবু ধর্মে মতি হল না।

অটলবাবুর পৌত্রী রাধারানী এসে বললে, দাদাবাবু, বৃন্দাবন বাবাজী তাঁর কীর্তনের দল নিয়ে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একটু নাম শুনবে কি?

—খবরদার। আমি এখন নিরিবিলিতে থাকতে চাই, চেঁচামেচি ভাল লাগে না। শ্রাদ্ধের দিন যত খুশি কীর্তন শুনিস—শীতল বাতাস ভাল লাগে না সখী, আমার বুকের পাঁজর ঝাঁজর হল—যত সব ন্যাকামি।

রাধারানী ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল। ডাক্তার বললেন, সার, আপনি বড় বেশী কথা বলছেন। রাত হয়েছে, এখন চুপ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—বেশী কথা তোমরাই বলছ। আর দেরি করো না, যা জিজ্ঞাসা করেছি তার স্পষ্ট উত্তর দাও।

ডাক্তার তাঁর স্টেথোস্কোপের নল চটকাতে চটকাতে বললেন, দু-চার ঘণ্টা হতে পারে, দু-চার দিনও হতে পারে, ঠিক বলা অসম্ভব। ইনজেকশনটা দিয়ে দি, আপনি অক্সিজেন শুঁকতে থাকুন, কষ্ট কমবে।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার অটলবাবুর বিধবা পুত্রবধূকে বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে, আজ রাত বোধ হয় কাটবে না। নার্স ওঁর ঘরে থাকুক, আমি এই পাশের ঘরে রইলুম।

অটলবাবু অত্যন্ত হিসাবী লোক, আজীবন নানারকম কারবার করেছেন। তাঁর বয়স আশি পেরিয়েছে, শরীর রোগে অবসন্ন, কিন্তু বুদ্ধি ঠিক আছে। মরণ আসন্ন জেনে তিনি মনে মনে ইহলোকের ব্যালান্স-শীট এবং পরলোকের একটা আন্দাজী প্রসপেকটস খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অটলবাবুর মনে পড়ল, বহুকাল পূর্বে কলেজে পড়বার সময় মৃচ্ছকটিকের একটি শ্লোক তাঁর ভাল লেগেছিল।

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি॥

—দুঃখ অনুভবের পরই সুখ শোভা পায়, যেমন ঘোর অন্ধকারে দীপদর্শন। কিন্তু যে লোক সুখভোগের পর দরিদ্রতা পায় সে শরীর ধারণ করে মৃতের ন্যায় জীবিত থাকে।

অটলবাবু ভাবলেন, ভুল, মস্ত ভুল। তিনি প্রথম ও মধ্য জীবনে বিস্তর সুখভোগ করেছেন, কিন্তু শেষ বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁকে স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়বিয়োগের শোক এবং ব্যবসায়ে বড় রকম লোকসান সইতে হয়েছে, সর্বস্বান্ত না হলেও তিনি আগের তুলনায় দরিদ্র হয়েছেন। বয়স যত বাড়ে সময় ততই ছোট হয়ে যায়; অন্তিম কালে অটলবাবুর মনে হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবন মুহূর্তমাত্র, সমস্ত সুখ দুঃখ তিনি এক সঙ্গেই ভোগ করেছেন এবং সবই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুখভোগের পর দুঃখ পেয়েছেন—শুধু এই

কারণেই সুখের চেয়ে দুঃখকে বড় মনে করবেন কেন ? জীবনের খাতায় লাভ-লোকসান দুইই পাকা কালিতে লেখা রয়েছে, তাতে দেখা যায় তাঁর খরচের তুলনায় জমাই বেশী, মোটের উপর তিনি বঞ্চিত হন নি। অন্য লোকে যাই বলুক, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।

কিন্তু একটা খটকা দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজে ভাগ্যবান হলেও যারা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন ছিল তারা হতভাগ্য, অনেকে বহু দুঃখ পেয়ে অকালে মরেছে। তাদের দুঃখ অটলবাবু নিজের বলেই মনে করেন এবং তা লোকসানের দিকে ফেললে লাভের অঙ্ক খুব কমে যায়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য যে সব লোককে তিনি আজীবন আশেপাশে দেখছেন তাদেরও অনেকে কষ্ট ভোগ করেছে। পূর্বে তাদের কথা তিনি ভাবেন নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারাও নিতান্ত আপন জন। তাদের দুঃখও যদি নিজের বলে ধরেন তবে জমাখরচ কষলে লোকসানই দেখা যায়।

অটলবাবু স্থির করতে পারলেন না তিনি জীবনে মোটের উপর সুখ বেশী পেয়েছেন কি দুঃখ বেশী পেয়েছেন। তিনি যদি ভক্ত হতেন তবে বলতে পারতেন—'ধন্য হরি রাজ্যপাটে, ধন্য হরি শ্মশানঘাটে'। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন—এই খ্রীষ্টানী প্রবোধবাক্যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। অটলবাবু শুনেছেন, যিনি পরমহংস তিনি সমস্ত জীবের সুখদুঃখ নিজের বলেই মনে করেন ; সুখ আর দুঃখে কাটাকাটি হয়ে যায়, তার ফলে তিনি সুখীও হন না দুঃখীও হন না। কিন্তু অটলবাবু পরমহংস নন, তা ছাড়া তিনি জগতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী দেখতে পান। তিনি যদি দুঃখের দিকে পিছন ফিরে জীবন উপভোগ করতে পারতেন তবে রবীন্দ্রনাথের মতন বলতে পারতেন—

এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দে বিরাজে।

আরও বলতে পারতেন—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বের দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহ তারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন....

ভাগ্যদোষে অটলবাবু ভক্ত নন, কবি নন, ভাবুক নন, দার্শনিক নন, সরল বিশ্বাসীও নন। তিনি নানা বিষয়ে ঠোকর মেরেছেন কিন্তু কিছুই আয়ত্ত করতে পারেন নি, আজীবন সংশয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু কোনও বিষয়েই নিষ্ঠা রাখতে পারেন নি। তাঁর মূলধন কি তাই তিনি জানেন না, লাভ-লোকসান খতাবেন কি করে? শুধু এইটুকুই বলতে পারেন—অনেকের তুলনায় তিনি ভাগ্যবান, অনেকের তুলনায় তিনি হতভাগ্য। এ সম্বন্ধে আর তিনি বৃথা মাথা ঘামাবেন না, জ্ঞান থাকতে থাকতে তাঁর ভবিষ্যৎটা একটু আন্দাজ করার চেষ্টা করবেন। তাঁর আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই। তিনি মরলে কারও আর্থিক ক্ষতি বা মানসিক দুঃখ হবে না, যে অল্প আয় আছে তা বন্ধ হবে না, বরং ইনশিওরান্সের একটা মোটা টাকা ঘরে আসবে। তিনি এখন আত্মীয়দের গলগ্রহ মাত্র, তারা বোধ হয় মনে মনে তাঁর মরণ কামনা করে।

অটলবাবু কি আবার জন্মাবেন ? তাঁর গতজন্মের কথা কিছুই মনে নেই। জাতিস্মর লোকের বিবরণ মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পাওয়া যায়, কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। মালবীয়জীর যখন কায়কল্প চিকিৎসা চলছিল তখন এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা খবর পাঠাচ্ছিলেন—পণ্ডিতজীর পাকা চুল সমস্ত কাল হয়ে গেছে, নূতন দাঁতও উঠছে। নির্জলা মিথ্যা কথা লিখতে এঁদের বাধে না। পুনর্জন্মের কথা মনে না থাকে তবে এক জন্মের রামবাবুই যে অন্য জন্মে শ্যামবাবু হয়েছেন তার প্রমাণ কি ? তার পর স্বর্গ মর্ত্য। তিনি এক পাদ্রির কাছে শুনেছিলেন যিশু খ্রীষ্টের শরণ নিলে অনন্ত স্বর্গ, না নিলে অনন্ত নরক। এরকম ছেলেমানুষী কথায় ভুলবেন অটলবাবু এমন বোকা নন। আমাদের পুরাণে আছে, যার পাপ অল্প সে আগে অল্প কাল নরকভোগ করে, তার পর দীর্ঘ কাল স্বর্গ-ভোগ করে, পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মায়। যার পুণ্য অল্প সে অল্প কাল স্বর্গবাসের পর দীর্ঘ কাল নরকবাস করে, তার পর আবার জন্মায়। এই মত খ্রীষ্টানী মতের চেয়ে ভাল, কিন্তু মানুষের পাপ-পুণ্য মাপা হবে কী করে ? পাপ-পুণ্য তো যুগে যুগে বদলাচ্ছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে মুরগি খেলে পাপ হত, এখন আর হয় না। পুরাকালের হিন্দুরা অন্যান্য নিষিদ্ধ মাংসও খেত, ভবিষ্যতে আবার খাবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবাই বলে নরহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এই সেদিন শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরাও বেপরোয়া খুন করেছে, বুড়োরা উৎসাহ দিয়ে বলেছে—এ হল আপদ্‌ধর্ম, সাপ মারলে পাপ হয় না, কে ঢোঁড়া কে কেউটে তা চেনবার দরকার নেই। পাপ-পুণ্যের যখন স্থিরতা নেই তখন স্বর্গনরক অবিশ্বাস্য।

তবে কি অটলবাবু স্পিরিচুয়ালিস্টদের পরলোকে যাবেন—যা স্বর্গও নয় নরকও নয় ? আজকাল ইউরোপ-আমেরিকার বৃত্তান্তের মতন পরলোকের বৃত্তান্তও অনেক ছাপা হচ্ছে। দুর্বলচিত্ত লোকে বিপদে পড়লে যেমন কবচ-মাদুলি ধারণ করে, জ্যোতিষী

বা গুরুর শরণাপন্ন হয়, তেমনি শান্তির প্রত্যাশায় পরলোকের কথা পড়ে। অনেক বৎসর পূর্বে অটলবাবু একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন তা মনে পড়ে গেল।—তিনি বিদেশে এক বন্ধুর বাড়ি অতিথি হয়েছেন। রাত্রিতে আহারের পর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার সময় দেখলেন, পাশে একটি তালা-লাগান ঘর আছে। শোবার কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলেন, পাশের ঘরের তালা খোলা হল, আবার বন্ধ করা হল। তারপর অটলবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল, পাশের ঘরে যেন হাতাহাতি মারামারি চলছে। অনেক রাত পর্যন্ত এই-রকম চলল, অটলবাবু ঘুমুতে পারলেন না। পরদিন বাড়ির কর্তা তাঁকে বললেন, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে তার জন্য আমি বড় দুঃখিত। ব্যাপার কি জানেন—আমার একটি ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়, তার গর্ভধারিণী রোজ রাত্রে থালায় ভরতি করে তার জন্য ওই ঘরে খাবার রাখেন। কিন্তু ছেলে খেতে পায়না, তার পূর্বপুরুষরা দল বেঁধে এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন।

এই স্বপ্নের কথা মনে পড়ার পর অটলবাবু একটি বিভীষিকা দেখলেন। মনে হ'ল তাঁর বাবা বলেছেন, অট্‌লা, প্রণাম কর, এই ইনি তোর পিতামহ, ইনি প্রপিতামহ, ইনি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ইনি অতিবৃদ্ধ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অটলবাবু দেখলেন, তাঁর বংশের অসংখ্য ঊর্ধ্বতন স্ত্রীপুরুষ প্রণাম নেবার জন্য সামনে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তাঁর পাঁচ নম্বর পূর্বপুরুষ—প্রবলপ্রতাপ জমিদার, মাথায় টিকি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষ, কাঁধে পইতের গোছা, পায়ে খড়ম—দেখলেই বোধ হয় ব্যাটা ডাকাতের সর্দার, নরবলি দিত। ওই উনি, যাঁর দাঁতে

মিসি, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, পায়ে বাঁকমল, কোমরে গোট, অটলবাবুর অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহী—ও মাগী নিশ্চয় ডাইনী, সতিনপোকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। দলের মধ্যে সাধুপুরুষ আর সাধ্বী স্ত্রীও অনেক আছেন, কিন্তু অটলবাবু তো ভাল মন্দ বেছে প্রণাম করতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁর বয়স এত হয়েছে যে কোনও গুরুজন আর বেঁচে নেই, তিনি প্রণাম করাই ভুলে গেছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে দেখলে হুঁকো লুকোতন, কিন্তু এই পঙ্গপালের মতন পূর্বপুরুষদের খাতির করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রিয়জন এবং অপ্রিয়জনও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ হাসিমুখে কেউ ছলছল চোখে কেউ ভ্রূকুটি করে তাঁকে দেখছে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের পিছনে অতি দূরে জন্তুর দলও রয়েছে, পশু সরীসৃপ মাছ কৃমি কীট কীটাণু পর্যন্ত। এরাও তাঁর পূর্বপুরুষ, এরাও তাঁর জ্ঞাতি, সকলের সঙ্গেই তাঁর রক্তের যোগ আছে। কি ভয়ানক, ইহলোকের জনকয়েক আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রব ত্যাগ করে তাঁকে কি পরলোকের প্রেতারণ্যে বাস করতে হবে? ওখানে সঙ্গী রূপে কাকে তিনি বরণ করবেন, কাকে বর্জন করবেন? অটলবাবু স্পষ্টস্বরে বললেন, দূর হ, দূর হ।

নার্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ডাকছেন? অটলবাবু আবার বললেন, দূর হ, দূর হ। নার্স বিরক্ত হয়ে তার চেয়ারে গিয়ে বসল এবং আবার ঢুলতে লাগল।

বিকারের ঘোর কাটিয়ে উঠে অটলবাবু ভাবতে লাগলেন— পুনর্জন্ম নয়, স্বর্গ নয়, স্পিরিচুয়াল প্রেতলোকও নয়। কোথায় যাবেন? মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, দেহের উপাদান পৃথিবীর জড় বস্তুতে লয় পায়। মৃত ব্যক্তির চেতনাও কি বিরাট বিশ্বচেতনায় লীন হয়? আমিই অটল চৌধুরী—এই বোধ কি তখনও থাকবে? অটলবাবু আর ভাবতে পারেন না, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বা গুরুর শরণাপন্ন হয়, তেমনি শান্তির প্রত্যাশায় পরলোকের কথা পড়ে। অনেক বৎসর পূর্বে অটলবাবু একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন তা মনে পড়ে গেল।—তিনি বিদেশে এক বন্ধুর বাড়ি অতিথি হয়েছেন। রাত্রিতে আহারের পর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার সময় দেখলেন, পাশে একটি তালা-লাগান ঘর আছে। শোবার কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলেন, পাশের ঘরের তালা খোলা হল, আবার বন্ধ করা হল। তারপর অটলবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল, পাশের ঘরে যেন হাতাহাতি মারামারি চলছে। অনেক রাত পর্যন্ত এই-রকম চলল, অটলবাবু ঘুমুতে পারলেন না। পরদিন বাড়ির কর্তা তাঁকে বললেন, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে তার জন্য আমি বড় দুঃখিত। ব্যাপার কি জানেন—আমার একটি ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়, তার গর্ভধারিণী রোজ রাত্রে থালায় ভরতি করে তার জন্য ওই ঘরে খাবার রাখেন। কিন্তু ছেলে খেতে পায়না, তার পূর্বপুরুষরা দল বেঁধে এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন।

এই স্বপ্নের কথা মনে পড়ার পর অটলবাবু একটি বিভীষিকা দেখলেন। মনে হ'ল তাঁর বাবা বলেছেন, অট্‌লা, প্রণাম কর, এই ইনি তোর পিতামহ, ইনি প্রপিতামহ, ইনি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ইনি অতিবৃদ্ধ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অটলবাবু দেখলেন, তাঁর বংশের অসংখ্য ঊর্ধ্বতন স্ত্রীপুরুষ প্রণাম নেবার জন্য সামনে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তাঁর পাঁচ নম্বর পূর্বপুরুষ—প্রবলপ্রতাপ জমিদার, মাথায় টিকি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষ, কাঁধে পইতের গোছা, পায়ে খড়ম—দেখলেই বোধ হয় ব্যাটা ডাকাতের সর্দার, নরবলি দিত। ওই উনি, যাঁর দাঁতে

মিসি, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, পায়ে বাঁকমল, কোমরে গোট, অটলবাবুর অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহী—ও মাগী নিশ্চয় ডাইনী, সতিনপোকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। দলের মধ্যে সাধুপুরুষ আর সাধ্বী স্ত্রীও অনেক আছেন, কিন্তু অটলবাবু তো ভাল মন্দ বেছে প্রণাম করতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁর বয়স এত হয়েছে যে কোনও গুরুজন আর বেঁচে নেই, তিনি প্রণাম করাই ভুলে গেছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে দেখলে হুঁকো লুকোতন, কিন্তু এই পঙ্গপালের মতন পূর্বপুরুষদের খাতির করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রিয়জন এবং অপ্রিয়জনও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ হাসিমুখে কেউ ছলছল চোখে কেউ ভ্রূকুটি করে তাঁকে দেখছে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের পিছনে অতি দূরে জন্তুর দলও রয়েছে, পশু সরীসৃপ মাছ কৃমি কীট কীটাণু পর্যন্ত। এরাও তাঁর পূর্ব-পুরুষ, এরাও তাঁর জ্ঞাতি, সকলের সঙ্গেই তাঁর রক্তের যোগ আছে। কি ভয়ানক, ইহলোকের জনকয়েক আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রব ত্যাগ করে তাঁকে কি পরলোকের প্রেতারণ্যে বাস করতে হবে? ওখানে সঙ্গী রূপে কাকে তিনি বরণ করবেন, কাকে বর্জন করবেন? অটলবাবু স্পষ্টস্বরে বললেন, দূর হ, দূর হ।

নার্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ডাকছেন? অটলবাবু আবার বললেন, দূর হ, দূর হ। নার্স বিরক্ত হয়ে তার চেয়ারে গিয়ে বসল এবং আবার ঢুলতে লাগল।

বিকারের ঘোর কাটিয়ে উঠে অটলবাবু ভাবতে লাগলেন—পুনর্জন্ম নয়, স্বর্গ নয়, স্পিরিচুয়াল প্রেতলোকও নয়। কোথায় যাবেন? মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, দেহের উপাদান পৃথিবীর জড় বস্তুতে লয় পায়। মৃত ব্যক্তির চেতনাও কি বিরাট বিশ্বচেতনায় লীন হয়? আমিই অটল চৌধুরী—এই বোধ কি তখনও থাকবে? অটলবাবু আর ভাবতে পারেন না, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

শেষ রাত্রে অটলবাবুর নাড়ী নিঃশ্বাস আর বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ঘণ্টাখানেক হল গেছেন। আশ্চর্য মানুষ, হরিনাম নয়, রামধুন নয়, তারকব্রহ্মনাম নয়, কিছুই শুনলেন না, ভদ্রলোক লাভ-লোকসান কষতে কষতেই মরেছেন। বোধ হয় হিসেব মেলাতে পারেন নি দেখুন না, ভ্রু একটু কুঁচকে রয়েছে।

পুত্রবধূ বললেন, তা বেশ গেছেন, নিজেও বেশী দিন ভোগেননি, আমাদেরও ভোগান নি। চিকিৎসার খরচও তো কম নয়।

অটলবাবুর কাগজপত্র হাঁতড়ে দেখে তাঁর পৌত্র বললে, এঃ, বুড়ো ঠকিয়েছে, যা রেখে গেছে তা কিছুই নয়।

অনুরক্ত বন্ধুরা বললেন, একটা ইন্দ্রপাত হল। এমন খাঁটি মানুষ দেখা যায় না। ইনি স্বর্গে যাবেন না তো যাবে কে? কি বলেন দত্ত মশাই?

হারাধন দত্ত মশাই পরলোকতত্ত্বজ্ঞ, যদিও পরলোক দেখবার সুযোগ এখনও পান নি। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, উঁহু স্বর্গে যাওয়া অত সহজ নয়, দরজা খোলা পাবেন না; উনি যে কিছুই মানতেন না। অ্যাস্ট্রাল প্লেনেই আটকে থাকবেন, ত্রিশঙ্কুর মতন।

হরিপদ ভটচাজ মনে মনে বললেন, তোমরা ছাই জান, পাষণ্ড এতক্ষণ নরকে পৌঁছে গেছে।

অটলবাবু কোথায় গেছেন তিনিই জানেন। অথবা তিনিও জানেন না।

১৩৫৫

রাজভোগ

পৌষ মাস, সন্ধ্যাবেলা। একটি প্রকাণ্ড মোটর ধর্মতলায় অ্যাংলোমোগলাই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরটি সেকেলে কিন্তু দামী। চালকের পাশ থেকে একজন চোপদার জাতীর লোক নেমে পড়ল। তার হাতে আসাসোঁটা নেই বটে কিন্তু মাথায় একটি জরি দেওয়া জাঁকালো পাগড়ি আছে, তাতে রূপোর তকমা আঁটা; পরনে ইজের-চাপকান, কোমরে লাল মখমলের পেটি, তাতেও একটি চাপরাস আছে। লোকটি তার প্রকাণ্ড গোঁফে তা দিতে দিতে সগর্বে হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারকে বললে, পাতিপুরকা রাজাবাহাদুর আয়ে হে।

ম্যানেজার রাইচরণ চক্রবর্তী শশব্যস্তে বেরিয়ে এল এবং মোটরের দরজার সামনে হাত জোড় করে নতশিরে বলল, মহারাজ আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! দয়া করে নেমে এই গরিবের কুটীরে পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হক।

পাতিপুরের রাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে মোটর থেকে নামলেন। তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে, দেহ আর পাকা গোঁফ-জোড়াটি খুব শীর্ণ, মাথায় যেটুকু চুল বাকী আছে তাই দিয়ে টাক ঢেকে সিঁথি কাটবার চেষ্টা করেছেন। পরনে জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতি আর রেশমী পাঞ্জাবি, তার উপর দামী শাল, পায়ে শুঁড়ওয়ালা লাল লপেটা। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ভিতরের মহিলাটিকে বললেন, নেমে এস। মহিলা বললেন, আমি আর নেমে কি করব, গাড়িতেই থাকি। তুমি যা খাবে খেয়ে এস, দেরি করো না যেন। রাজা বললেন, তা কি হয়, তুমিও এস। রাইচরণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে,

নামতে আজ্ঞা হক রানী-মা, আপনার শ্রীচরণে ধুলো পড়লে হোটেলের বরাত ফিরে যাবে।

মহিলাটি বোধ হয় সুন্দরী ও যুবতী, কিন্তু ঠিক বলা যায় না; তাঁর সজ্জা আর প্রসাধন এমন পরিপাটি যে রূপযৌবনের কতটা আসল আর কতটা নকল তা বোঝবার উপায় নেই। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। রাইচরণ বিনয়ে কুঁজো হয়ে সামনের দিকে জোড় হাত নাড়তে নাড়তে পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর ও তাঁর সঙ্গিনীকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং হেঁকে বললে, এই শীগগির রয়েল সেলুনের দরজা খুলে দে। হোটেলের সামনে বড় ঘরটিতে বসে যারা খাচ্ছিল তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে মহিলাটিকে দেখে ফিসফিস করে জল্পনা করতে লাগল।

একজন চাকর তাড়াতাড়ি একটা কামরা খুলে দিলে। ছোট খোপ, রং-করা কাঠের দেওয়াল, মাঝে একটি টেবিল এবং দুটি গদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলটি সাদা চাদরে ঢাকা, দিনের বেলায় তাতে হলুদের দাগ দেখা যায়। এই কামরার পাশেই পর্দার আড়ালে আর একটি কামরা, তাতে এক সেট পুরনো কৌচ ও সেটি এবং একটি ছোট টেবিল, তার উপর তিন-চারটি গত সালের মাসিক পত্রিকা। দেওয়ালে কয়েকটি সিনেমা-তারার ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

দুই মহামান্য অতিথিকে বসিয়ে ম্যানেজার রাইচরণ বললে, হুজুর, আজ্ঞা করুন কি এনে দেব। রাজাবাহাদুর সাগ্রহে বললেন, তোমার কি কি তৈরি আছে শুনি? রাইচরণ বললে, আজ্ঞে, তিন রকম পোলাও আছে—ভেটকি মাছের, মটনের আর পাঁঠার। কালিয়া আছে, কোর্মা আছে, কোপ্তা আছে; মটন-চপ, চিংড়ি-কাটলেট, ফাউল-রোস্ট, ছানার পুডিং—হুজুরের আশীর্বাদে আরও কত কি আছে।

রাজাবাহাদুর খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ, অতি উত্তম। আচ্ছা ম্যানেজার, তোমার এখানে বিরিয়ানি পোলাও হয়?

—হয় বই কি হুজুর, ঘণ্টা খানিক আগে অর্ডার পেলেই করে দিতে পারি। আমি তিন বচ্ছর তুম্বাগড়ের নবাব সাহেবের রসুইঘরের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলুম কিনা, সেখানেই সব শিখেছি। খুব খাইয়ে লোক ছিলেন নবাব সায়েব, এ বেলা এক তুম্বা, ও বেলা এক তুম্বা। বাবুর্চীদের রান্না তাঁর পছন্দ হত না, আমি তাদের কায়দার অনেক উন্নতি করেছি, তাই জন্যেই তো নবাব বাহাতুর খুশী হয়ে নিজের হাতে ফারসীতে আমাকে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন। দেখবেন হুজুর?

—থাক থাক। আচ্ছা, তোমার কায়দাটা কি রকম শুনি।

—বিরিয়ানি রান্নার? এক নম্বর বাঁশিমতি চাল—এখন তার দাম পাঁচ টাকা সের, খাঁটি গাওয়া ঘি, ডুমো ডুমো মাংস, বাদাম পেস্তা কিশমিশ এবং হরেক রকম মসলা, গোলাপ জলে গোলা খোয়া ক্ষীর, মৃগনাভি সিকি রতি, দশ ফোঁটা ও-ডি-কলোন, আলু একদম বাদ। চাল আর মাংস প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে তার ওপর তু মুঠো পেঁয়াজ-কুচি মুচমুচে করে ভেজে ছড়িয়ে দিই, তার পর দমে বসাই। খেতে যা হয় সে আর কি বলব!

রাজাবাহাতুরের জিবে জল এসে গেল, স্থুৎ করে টেনে নিয়ে বললেন, চমৎকার। আচ্ছা সামি কাবাব জান?

—হেঁ হেঁ, হুজুরের আশীর্বাদে মোগলাই ইংলিশ ফ্রেঞ্চ হেন রান্না নেই যা এই রাইচরণ চক্কত্তি জানে না। মাংস পিষে তার সঙ্গে ছোলার ডাল বাটা আর পেস্তা বাদাম মেশাতে হয়, তাতে আদা হিং পেঁয়াজ রস্থন গরম মসলা ইত্যাদি পড়ে, তার পর চ্যাপটা লেচি গড়ে চাটুতে ভাজতে হয়। এই হল সামি কাবাব। ওঃ, খেতে যা হয় হুজুর তা বলবার কথা নয়।

রাজাবাহাতুর আবার স্থুৎ করে জিবের জল টেনে নিলেন, তার পর বললেন, আচ্ছা রাইচরণ, রোগন-জুশ জান?

মহিলাটি অধীর হয়ে বললেন, আঃ, ওসব জিজ্ঞেস করে কি হবে, যা খাবে তাই আনতে বল না।

রাজাবাহাদুর বললেন, আ হা হা ব্যস্ত হও কেন, খাওয়া তো আছেই, আগে একবার রাইচরণকে বাজিয়ে নিচ্ছি।

রাইচরণ বললে, বাজাবেন বই কি হুজুর, নিশ্চয় বাজাবেন। রোগন-জুশ হচ্ছে—

মহিলাটি আস্তে আস্তে উঠে পাশের কামরায় গিয়ে মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

—রোগন-জুশ হচ্ছে খাসি বা দুম্বার মাংস, শুধু ঘিএ সিদ্ধ, জল একদম বাদ। ভারী পোষ্টাই হুজুর, সাত দিন খেলে লিকলিকে রোগা লোকেরও গায়ে গত্তি লেগে ভুঁড়ি গজায়।

—তুমি তো অনেক রকম জান দেখছি হে। আচ্ছা মুর্গ্ মুসল্লম তৈরি করতে পার?

—নিশ্চয় পারি হুজুর, ঘণ্টা তিনেক আগে অর্ডার দিতে হয়, অনেক লটখটি কিনা। বাবুর্চীদের চাইতে আমি ঢের ভাল বানাতে পারি, আমি নতুন কায়দা আবিষ্কার করেছি। একটি বড় আস্ত মুরগি, তার পেটের মধ্যে মাছের কোপ্তা, ডিম আর কুচো-চিংড়ি দেওয়া কুচুর শাগের ঘণ্ট, অভাবে লাউ-চিংড়ি, আর দই—

—কচুর শাগ? আরে রাম রাম।

—না হুজুর, মুরগির পেটে সমস্ত জিনিস ভরে দিয়ে সেলাই করে হাঁড়ি-কাবাবের মত পাক করতে হয়, সুসিদ্ধ হয়ে গেলে মুরগি কুচো-চিংড়ি কচুর শাগ দই আর সমস্ত মশলা মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়। খেতে যা হয় সে আর কি বলব হুজুর।

রাজাবাহাদুর এবারে আর সামলাতে পারলেন না, খানিকটা নাল টেবিলে পড়ে গেল। একটু লজ্জিত হয়ে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, ওহে রাইচরণ, উত্তম সর-ভাজা খাওয়াতে পার?

—হুজুরের আশীর্বাদে কি না পারি? সর-ভাজার রাজা হল গোলাপী গাইদুধের সর-ভাজা, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যা খেতেন।

কিন্তু দশ দিন সময় চাই মহারাজ, আর শ-খানিক টাকা খরচা মঞ্জুর করতে হবে।

—গোলাপী রঙের গরু হয় নাকি?

—না হুজুর। একটি ভাল গরুকে সাত দিন ধরে সেরেফ গোলাপ ফুল, গোলাব জল আর মিছরি খাওয়াতে হবে, খড় ভূষি জল একদম বারণ। তারপর সে যা দুধ দেবে তার রং হবে গোলাপী আর খোশবায় ভুর ভুর করবে। সেই দুধ ঘন করে তার সর নিতে হবে, আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি দিয়েই ভাজতে হবে। রসে ফেলবার দরকার নেই আপনিই মিষ্টি হবে—গরু মিছরি খেয়েছে কিনা। সে যা জিনিস, অমৃত কোথায় লাগে। কেষ্টনগরের কারিগররা তা দেখলে হুতোশে গলায় দড়ি দেবে।

—কিন্তু অত গোলাপ ফুল খেলে গরুর পেট ছেড়ে দেবে না?

রাইচরণ গলার স্বর নীচু করে বললে, কথাটা কি জানেন মহারাজ? গোলাপ ফুলের সঙ্গে খানিকটা সিদ্ধি-বাটাও খাওয়াতে হয়, তাতে গরুর পেট ঠিক থাকে আর সর-ভাজাটিও বেশ মজাদার হয়।

—চমৎকার, চমৎকার!

—এইবার হুজুর আজ্ঞা করুন কি কি খাবার আনব। আমি নিবেদন করছি কি—আজ আমার যা তৈরী আছে সবই কিছু কিছু খেয়ে দেখুন, ভাল জিনিস, নিশ্চয় আপনি খুশী হবেন। এর পরে একদিন অর্ডার মতন পছন্দসই জিনিস তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াব।

—আচ্ছা রাইচরণ, তোমার এখানে পাতি নেবু আছে?

—আছে বই কি, নেবু হল পোলাও খাবার অঙ্গ। একটি আরজি আছে মহারাজ—আজ ভোজনের পর হুজুরকে একটি শরবত খাওয়াব, হুজুর তর্ হয়ে যাবেন।

—কিসের শরবত।

—তবে বলি শুনুন মহারাজ। আমার একটি দূর সম্পর্কের ভাগনে আছে, তার নাম কানাই। সে বিস্তর পাস করেছে, নানা-

রকম দ্রব্যগুণ তার জানা আছে। শরবতটি সেই কানা ছোকরারই পেটেণ্ট, সে তার নাম দিয়েছে—চাঙ্গায়নী সুধা। বছর-দুই আগে কানাই হুণ্ডাগড় রাজসরকারে চাকরি করত, কুমার সায়েব তাকে খুব ভালবাসতেন। কুমারের খুব শিকারের শখ, একদিন তাঁর হাতিকে বাঘে ঘায়েল করলে। হাতির ঘা দিন-কুড়ির মধ্যে সেরে গেল, কিন্তু তার ভয় গেল না। হাতি নড়ে না, ডাঙশ মারলেও ওঠে না। কুমার সায়েবের হুকুম নিয়ে কানাই হাতিকে সের-টাক চাঙ্গায়নী খাওয়ালে। পরদিন ভোরবেলা হাতি চাঙ্গা হয়ে পিলখানা থেকে গটগট করে হেঁটে চলল, জঙ্গল থেকে একটা শালগাছের রলা উপড়ে নিলে, পাতাগুলো খেয়ে ফেলে ডাণ্ডা বানালে, তার পর পাহাড়ের ধারে গিয়ে শুঁড় দিয়ে সেই ডাণ্ডা ধরে বাঘটাকে দমাদম পিটিয়ে মেরে ফেললে। কুমার সায়েব খুশী হয়ে কানাইকে পাঁচশ টাকা বকশিশ দিলেন।

—শরবতে হুইস্কি টুইস্কি আছে নাকি? ওসব আমার আর চলে না।

—কি যে বলেন হুজুর! কানাই ওসব ছোয় না, অতি ভাল ছেলে, সিগারেটটি পর্যন্ত খায় না। চাঙ্গায়নী সুধায় কি কি আছে শুনবেন? কুড়িটা কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়িদফা হেকিমী দাবাই, হীরেভস্ম, সোনাভস্ম মুক্তোভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকটিরি—এইসব মিশিয়ে চোলাই করে তৈরী হয়। খুব দামী জিনিস, কানাই আমাকে হাফ প্রাইস পঞ্চাশ টাকায় এক বোতল দিয়েছে, মামা বলে ভক্তি করে কিনা। দোহাই হুজুর, আজ একটু খেয়ে দেখবেন।

—সে হবে এখন। আচ্ছা রাইচরণ, তুমি বার্লি রাখ?

—রাখি হুজুর। ছানার পুডিংএ দিতে হয়, নইলে আঁট হয় না। এইবার তবে হুজুরের জন্য খাবার আনতে বলি? হুকুম করুন কি কি আনব।

—এক কাজ কর—এক কাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ করে নেবু আর একটু নুন দিয়ে নিয়ে এস।

রাইচরণ আকাশ থেকে পড়ে বললে, সেকি মহারাজ! ভেটকি মাছের পোলাও, মটন-কারি, ফাউল-রোস্ট—

রাজাবাহাদুর হঠাৎ অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হ্যা! আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি, অ্যাঁ? আমি বলে গিয়ে তিনটি বচ্ছর ডিসপেপসিয়ায় ভুগছি, কিচ্ছু হজম হয় না, সব বারণ, দিনে শুধু গলা ভাত আর শিঙি মাছের ঝোল, রাত্তিরে বার্লি—আর তুমি আমাকে পোলাও কালিয়ার লোভ দেখাচ্ছ! কি ভয়নাক খুনে লোক!

রাইচরণ মর্মাহত হয়ে চলে গেল এবং একটু পরে এক বাটি বার্লি এনে রাজাবাহাদুরের সামনে ঠক্ করে রেখে বললে, এই নিন।

তার পর রাইচরণ পর্দা ঠেলে পাশের কামরায় গিয়ে মহিলাটিকে বললে, রানী-মা, আপনার জন্য একটু ভেটকি মাছের পোলাও, মটন-কারি আর ফাউল-রোস্ট আনি?

—খেপেছেন? আমি খাব আর ওই হ্যাংলা বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে! গলা দিয়ে নামবে কেন?

—তবে একটু চা আর খানকতক চিংড়ি কাটলেট? এনে দিই রানী-মা?

—রানী-ফানি নই, আমি নক্ষত্র দেবী। আর একদিন আসব এখন, স্টুডিওর ফেরৎ। ডিরেক্টার হাঁদু বাবুকেও নিয়ে আসব।

১৩৫৫

পরশ পাথর

পরেশবাবু একটি পরশ পাথর পেয়েছেন। কবে পেয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন, কেমন করে সেখানে এল, আরও পাওয়া যায় কিনা—এসব খোঁজে আপনাদের দরকার কি। যা বলছি শুনে যান।

পরেশবাবু মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক লোক, পৈতৃক বাড়িতে থাকেন, ওকালতি করেন। রোজগার বেশী নয়, কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। একদিন আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে একটি পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে পেলেন। জিনিসটা কি তা অবশ্য তিনি চিনতে পারেন নি, একটু নূতন রকম পাথর দেখে রাস্তার এক পাশ থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন। বাড়ি এসে তাঁর অফিস-ঘরের তালা খোলবার জন্য পকেট থেকে চাবি বার করে দেখলেন তার রং হলদে। পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, ঘরের চাবি তো লোহার, পিতলের হল কি করে? হয়তো চাবিটা কোনও দিন হারিয়েছিল, গৃহিণী তাঁকে না জানিয়েই চাবিওয়ালা ডেকে এই পিতলের চাবিটা করিয়েছেন, এত দিন পরেশবাবুর নজরে পড়ে নি।

পরেশবাবু ঘরে ঢুকে মনিব্যাগ ছাড়া পকেটের সমস্ত জিনিস টেবিলের উপর ঢাললেন, তার পর দোতলায় উঠলেন। চাবির কথা তাঁর আর মনে রইল না। জলযোগ এবং ঘণ্টা খানিক বিশ্রামের পর তিনি মকদ্দমার কাগজপত্র দেখবার জন্য আবার নীচের ঘরে এলেন এবং আলো জ্বাললেন। প্রথমেই পাথরটি নজরে পড়ল। বেশ গোলগাল চকচকে নুড়ি, কাল সকালে তাঁর ছোট খোকাকে দেবেন, সে গুলি খেলবে। পরেশবাবু তাঁর টেবিলের দেরাজ টেনে পাথরটি রাখলেন। তাতে ছুরি কাঁচি পেনসিল কাগজ খাম প্রভৃতি

নানা জিনিস আছে। কি আশ্চর্য ! ছুরি আর কাঁচি হলদে হয়ে গেল। পরেশবাবু পাথরটি নিয়ে তাঁর কাচের দোয়াতে ঠেকালেন, কিছুই হল না। তার পর একটা সীসের কাগজ-চাপায় ঠেকালেন, হলদে আর প্রায় ডবল ভারী হয়ে গেল। পরেশবাবু কাঁপা গলায় তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, হরিয়া, ওপর থেকে আমার ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে আয়। হরিয়া ঘড়ি এনে দিয়ে চলে গেল। নিকেলের সস্তা হাত-ঘড়ি, তাতে চামড়ার ফিতে লাগানো। পাথর ছোঁয়ানো মাত্র ঘড়ি আর ফিতের বকলস সোনা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা বন্ধ হল, কারণ স্প্রিংও সোনা হয়ে গেছে, তার আর জোর নেই।

পরেশবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞান হল যে তিনি অতি দুর্লভ পরশ পাথর পেয়েছেন যা ছোঁয়ালে সব ধাতুই সোনা হয়ে যায়। তিনি হাত জোড় করে কপালে বার বার ঠেকাতে ঠেকাতে বললেন, জয় মা কালী, এত দয়া কেন মা ? হরি, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, একি লীলা খেলছ বাবা ? স্বপ্ন দেখছি না তো ? পরেশবাবু তাঁর বাঁ হাতে একটি প্রচণ্ড চিমটি কাটলেন, তবু ঘুম ভাঙল না, অতএব স্বপ্ন নয়। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। শকুন্তলার মতন তিনি বুকে হাত দিয়ে বললেন, হৃদয় শান্ত হও ; এখনই যদি ফেল কর তবে এই দেবতার দান কুবেরের ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে ? পরেশবাবু শুনেছিলেন, এক ভদ্রলোক লটারিতে চার লাখ টাকা পেয়েছেন শুনে আহ্লাদে এমন লাফ মেরেছিলেন যে কড়িকাঠে লেগে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। পরেশবাবু নিজের মাথা দু হাত দিয়ে চেপে রাখলেন পাছে লাফ দিয়ে ফেলেন।

অত্যন্ত দুঃখের মতন আনন্দও কালক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরেশবাবু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হলেন এবং অতঃপর কি করবেন তা ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ জানাজানি হওয়া ভাল নয়, কোন শত্রু কি

বাধা দেবে বলা যায় না। এখন শুধু তাঁর গৃহিণী গিরিবালাকে জানাবেন, কিন্তু মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। পরেশবাবু দোতলায় গিয়ে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে পত্নীকে তাঁর মহা সৌভাগ্যের খবর জানালেন এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্য দিয়ে বললেন, খবরদার, যেন জানাজানি না হয়।

গৃহিণীকে সাবধান করলেন বটে, কিন্তু পরেশবাবু নিজেই একটু অসামাল হয়ে পড়লেন। শোবার ঘরের একটা লোহার কড়িতে পরশ পাথর ঠেকালেন, কড়িটা সোনা হওয়ার ফলে নরম হল, ছাত বসে গেল। বাড়িতে ঘটি বাটি থালা বালতি যা ছিল সবই সোনা করে ফেললেন। লোকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এসব জিনিস গিলটি করা হল কেন? ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। পরেশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, যাও, যাও, বিরক্ত করো না, আমি যাই করি না কেন তোমাদের মাথাব্যথা কিসের? প্রশ্নের ঠেলায় অস্থির হয়ে পরেশবাবু লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিলেন, মক্কেলরা স্থির করলে যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এর পর পরেশবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি করলে বিপদ হতে পারে। কিছু সোনা বেচে নোট পেয়ে ব্যাংকে জমা দিলেন, কম্পানির কাগজ আর নানারকম শেয়ারও কিনলেন। বালিগঞ্জে কুড়ি বিঘা জমির উপর প্রকাণ্ড বাড়ি আর কারখানা করলেন, ইট সিমেন্ট লোহা কিছুরই অভাব হল না, কারণ, কর্তাদের বশ করা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। এক জায়গায় রাশি রাশি মরচে পড়া মোটরভাঙা লোহার টুকরো পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কত দর? লোহার মালিক অতি নির্লোভ, বললে, জঞ্জাল তুলে নিয়ে যান বাবু, গাড়ি ভাড়াটা দিতে পারব না। পরেশবাবু রোজ দশ-বিশ মণ উঠিয়ে আনতে লাগলেন। খাস কামরায় লুকিয়ে পরশ পাথর ছোঁয়ান আর তৎক্ষণাৎ সোনা হয়ে যায়। দশ জন গুর্খা দারোয়ান

আর পাঁচটা বুলডগ কারখানার ফটক পাহারা দেয়, বিনা হুকুমে কেউ ঢুকতে পায় না।

সোনা তৈরী আর বিক্রী সব চেয়ে সোজা কারবার, কিন্তু রাশি-পরিমাণে উৎপাদন করতে গেলে একলা পারা যায় না। পরেশবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং অনেক দরখাস্ত বাতিল করে সদ্য এম. এস-সি পাস প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে দেড় শ টাকায় বাহাল করলেন। তার আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, সে পরেশবাবুর কারখানাতেই বাস করতে লাগল। প্রিয়তোষ প্রাতঃকৃত্য স্নান আহার ইত্যাদির জন্য দৈনিক এক ঘণ্টার বেশী সময় নেয় না, সাত ঘণ্টা ঘুময়, আট ঘণ্টা কারখানার কাজ করে, বাকী আট ঘণ্টা সে তার কলেজের সহপাঠিনী হিন্দোলা মজুমদারের উদ্দেশ্যে বড় বড় কবিতা আর প্রেমপত্র লেখে এবং হরদম চা আর সিগারেট খায়। অতি ভাল ছেলে, কারও সঙ্গে মেশে না, রবিবারে গির্জাতেও যায় না, কোনও বিষয়ে কৌতূহল নেই, কখনও জানতে চায় না এত সোনা আসে কোথা থেকে। পরেশবাবু মনে করেন, তিনি পরশ পাথর ছাড়া আর একটি রত্ন পেয়েছেন—এই প্রিয়তোষ ছোকরা। সে বৈদ্যুতিক হাপরে বড় বড় মুচিতে সোনা গলায় আর মোটা মোটা বাট বানায়। পরেশবাবু তা এক মারোয়াড়ী সিণ্ডিকেটকে বেচেন আর ব্যাংকের খাতায় তাঁর জমা অঙ্কের পর অঙ্ক বাড়তে থাকে। পরেশ গৃহিণীর এখন ঐশ্বর্যের সীমা নেই। গহনা পরে পরে তাঁর সর্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে, সোনার উপর ঘেন্না ধরে গেছে, তিনি শুধু দু হাতে শাঁখা এবং গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু পরেশবাবুর কার্যকলাপ বেশী দিন চাপা রইল না। বাংলা সরকারের আদেশে পুলিসের লোক পিছনে লাগল। তারা সহজেই বশে এল, কারণ রামরাজ্যের রীতিনীতি এখনও তাদের

রপ্ত হয়নি, দশ-বিশ ভরি পেয়েই তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিজ্ঞানীর দল আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নানারকম জল্পনা করতে লাগলেন। যদি তাঁরা দু শ বৎসর আগে জন্মাতেন তবে অনায়াসে বুঝে ফেলতেন যে পরেশবাবু পরশ পাথর পেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে পরশ পাথরের স্থান নেই, অগত্যা তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে পরেশবাবু কোনও রকমে একটা পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র খাড়া করেছেন এবং ভাঙা পরমাণুর টুকরো জুড়ে জুড়ে সোনা তৈরী করছেন, যেমন ছেঁড়া কাপড় থেকে কাঁথা তৈরি হয়। মুশকিল এই, যে পরেশবাবুকে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না, আর প্রিয়তোষটা ইডিয়ট বললেই হয়, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করলে বলে, আমি শুধু সোনা গলাই, কোথা থেকে আসে তা জানি না। বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমে পরেশবাবুর ব্যাপার গুজব মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁরাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বিশেষজ্ঞদের উপদেশে ঘাবড়ে গিয়ে ভারত সরকার স্থির করলেন যে পরেশবাবু ডেঞ্জারস পার্সন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না, কারণ পরেশবাবু কোনও বেআইনী কাজ করছেন না। তাকে গ্রেফতার এবং তাঁর কারখানা ক্রোক করবার জন্য একটা অর্ডিনান্স জারির প্রস্তাবও উঠল, কিন্তু ক্ষমতাশালী দেশী বিদেশী লোকের আপত্তির জন্য তা হল না। ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভারতস্থ দূতরা পরেশবাবুর উপর কড়া সুনজর রাখেন, তাঁকে বার বার ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। পরেশবাবু চুপচাপ খেয়ে যান, মাঝে মাঝে ইয়েস-নো বলেন, কিন্তু তাঁর পেটের কথা কেউ বার করতে পারে না, শ্যাম্পেন খাইয়েও নয়। বাংলা দেশের কয়েক জন কংগ্রেসী নেতা তাকে উপদেশ দিয়েছেন—রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আপনার রহস্য শুধু আমাদের কজনকে জানিয়ে দিন। কয়েক জন কমিউনিস্ট তাকে বলেছেন—খবরদার, কারও কথা শুনবেন না মশায়, যা করছেন করে যান, তাতেই জগতের মঙ্গল হবে।

আত্মীয় বন্ধু আর খোশামুদের দল ক্রমেই বাড়ছে, পরেশবাবু তাদের যথাযোগ্য পারিতোষিক দিচ্ছেন, তবু কেউ খুশী হচ্ছে না। শত্রুর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে আছে। ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হলেও পরেশবাবু তাঁর চাল বেশী বাড়ান নি, তার গৃহিণীও সেকেলে নারী, টাকা ওড়াবার কায়দা জানেন না। তথাপি পরেশবাবুর নাম এখন ভুবন-বিখ্যাত, তিনি নাকি চারটে নিজামকে পুষতে পারেন। তিনি কি খান কি পরেন কি বলেন তা ইওরোপ আমেরিকার সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে ছাপা হয়। সম্প্রতি দেশবিদেশ থেকে প্রেমপত্র আসতে আরম্ভ করেছে। সুন্দরীরা নিজের নিজের ছবি পাঠিয়ে আর গুণবর্ণনা করে লিখছেন, ডিয়ারেস্ট সার, আপনার পুরাতন পত্নীটি থাকুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি তো উদারপ্রকৃতি হিন্দু, আমাকে শুদ্ধি করে আপনার হারেমে ভরতি করুন, নয়তো বিষ খাব। এই রকম চিঠি প্রত্যহ রাশি রাশি আসছে আর গিরিবালা ছোঁ মেরে কেড়ে নিচ্ছেন। তিনি একটি মেম সেক্রেটারি রেখেছেন। সে প্রত্যেক চিঠির তরজমা শোনায় এবং গিরিবালার আজ্ঞায় জবাব লেখে। গিরিবালা রাগের বশে অনেক কড়া কথা বলে যান, কিন্তু মেমের বিদ্যা কম, শুধু একটি কথা লেখে—ড্যাম, অর্থাৎ দূর মুখপুড়ী, গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোর? ইওরোপের দশজন নামজাদা বিজ্ঞানী চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে পরেশবাবু যদি সোনার রহস্য প্রকাশ করেন তবে তারা চেষ্টা করবেন যাতে তিনি রসায়ন পদার্থবিদ্যা আর শান্তি এই তিনটি বিষয়ের জন্য নোবেল প্রাইজ এক সঙ্গেই পান। এ চিঠিও পরেশ-গৃহিণী প্রেমপত্র মনে করে মেমের মারফত জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দর ক্রমেই কমাচ্ছেন, বাজারে একশ পনের টাকা ভরি থেকে সাত টাকা দশ আনায় নেমেছে। ব্রিটিশ

সরকার সস্তায় সোনা কিনে আমেরিকার ডলার-লোন শোধ করেছেন। আমেরিকা খুব রেগে গেছে, কিন্তু আপত্তি করবার যুক্তি স্থির করতে পারছে না। ভারতে স্টারলিং ব্যালান্সও ব্রিটেন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু এদেশের প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন—আমরা তোমাদের সোনা ধার দিই নি, ডলারও দিই নি ; যুদ্ধের সময় জিনিস সরবরাহ করেছি, সেই দেনা জিনিস দিয়েই তোমাদের শুধতে হবে।

অর্থনীতি আর রাজনীতির ধুরন্ধরগণ ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। যদি এটা সত্য ত্রেতা বা দ্বাপর যুগ হত তবে তাঁরা তপস্যা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের সাহায্যে পরেশবাবুকে জব্দ করে দিতেন। কিন্তু এখন তা হবার জো নেই। কোনও কোনও পণ্ডিত বলছেন, প্লাটিনম আর রূপো চালাও। অন্য পণ্ডিত বলছেন উহু, তাও হয়তো সস্তায় তৈরি হবে, রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ম স্ট্যানডার্ড করা হক, কিংবা প্রাচীন কালের মতন বিনিময় প্রথায় লেন-দেন চলুক।

চার্চিলকে আর সামলানো যাচ্ছে না, তিনি খেপে গিয়ে বলেছেন, আমরা কমনওয়েল্‌থের সর্বনাশ হতে দেব না, ইউ-এন-ওর কাছে নালিশ করে সময় নষ্টও করব না। ভারতে আবার ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হক, আমাদের ফৌজ গিয়ে ওই পরেশটাকে ধরে আনুক, আইল-অভ-ওআইটে ওকে নজরবন্দী করে রাখা হক। সেখানে সে যত পারে সোনা তৈরী করুক, কিন্তু সে সোনা এম্পায়ার-সোনা, ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘের সম্পত্তি, আমরাই তার বিলি করব।

বার্নার্ড শ বলেছেন, সোনা একটা অকেজো ধাতু, তাতে লাঙল কাস্তে কুড়ুল বয়লার এঞ্জিন কিছুই হয় না। পরেশবাবু সোনার মিথ্যা প্রতিপত্তি নষ্ট করে ভাল করেছেন। এখন তিনি চেষ্টা করুন যাতে সোনাকে ইস্পাতের মতন শক্ত করা যায়। সোনার ক্ষুর পেলেই আমি দাড়ি কামাব।

রাশিয়ার এক মুখপাত্র পরেশবাবুকে লিখছেন, মহাশয়, আপনাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের দেশে এসে বাস করুন, খাসা জায়গা। এখানে সাদায় কালোয় ভেদ নেই, আপনাকে মাথার মণি করে রাখব। দৈবক্রমে আপনি আশ্চর্য শক্তি পেয়েছেন, কিন্তু মাপ করবেন, আপনার বুদ্ধি তেমন নেই। আপনি সোনা করতেই জানেন, কিন্তু তার সদ্‌ব্যবহার জানেন না। আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব। যদি আপনার রাজনীতিক উচ্চাশা থাকে তবে আপনাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি করা হবে। মস্কো শহরে এক শ একার জমির উপর একটি সুন্দর প্রাসাদ আপনার বাসের জন্য দেব। আর যদি নিরিবিলি চান তবে সাইবিরিয়ায় থাকবেন, একটি আস্ত নগর আপনাকে দেব। চমৎকার দেশ, আপনাদের শাস্ত্রে যার নাম উত্তরকুরু। এই চিঠিও গিরিবালা প্রেমপত্র ধ'রে নিয়ে জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দাম ক্রমশ খুব কমিয়েছেন, এখন সাড়ে চার আনা ভারি। সমস্ত পৃথিবীতে খনিজ সোনা প্রতি বৎসরে আন্দাজ বিশ হাজার মণ উৎপন্ন হচ্ছে। এখন পরেশবাবু একাই বৎসরে লাখ মন ছাড়ছেন। গোল্ড স্ট্যানডার্ড অধঃপাতে গেছে। সব দেশেই ভীষণ ইনফ্লেশন, নোট আর ধাতু-মুদ্রা খোলাম কুচির সমান হয়েছে। মজুরি আর মাইনে বহু গুণ বাড়িয়েও লোকের দুর্দশা ঘুচছে না। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।

ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ জন অনশনব্রতী মৃত্যুপণ করে পরেশবাবুর ফটকের সামনে শুয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি বেনামা চিঠি পাচ্ছেন—তুমি জগতের শত্রু, তোমাকে খুন করব। পরেশবাবুরও ঐশ্বর্যে অরুচি ধরে গেছে। গিরিবালা কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন, কেবলই বলছেন, যদি শান্তিতে থাকতে না পারি তবে ধনদৌলত

নিয়ে কি হবে। সর্বনেশে পাথরটাকে বিদায় কর, সব সোনা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কাশীবাস করবে চল।

পরেশবাবু মনস্থির ক'রে ফেললেন। সকালবেলা প্রিয়তোষকে সোনা তৈরির রহস্য জানিয়ে দিলেন।

প্রিয়তোষ নির্বিকার। পরেশবাবু তাকে পরশপাথরটা দিয়ে বললেন, এটাকে আজই ধ্বংস ক'রে ফেল, পুড়িয়ে, অ্যাসিডে গলিয়ে, অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে পার। প্রিয়তোষ বললে, রাইট-ও।

বিকালবেলা একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে পরেশবাবুকে বললে, জলদি আসুন হুজুর, বিসোআস সাহেব পাগলা হয়ে গেছেন, আপনাকে ডাকছেন। পরেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলেন প্রিয়তোষ তার শোবার ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে কাঁদছে। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? প্রিয়তোষ উত্তর দিলে, এই চিঠিটা পড়ে দেখুন সার। পরেশবাবু পড়লেন—

প্রিয় হে প্রিয়, বিদায়। বাবা রাজী নন, তাঁর নানা রকম আপত্তি। তোমার চাল-চুলো নেই, পরের বাড়ীতে থাক, মোটে দেড় শ টাকা মাইনে পাও, তার ওপর আবার জাতে খ্রীষ্টান, আবার আমরা চাইতে বয়সে এক বৎসরের ছোট। বললেন, বিয়ে হতেই পারে না। আর একটি খবর শোন। গুঞ্জন ঘোষের নাম শুনেছ? চমৎকার গায়, সুন্দর চেহারা, কোঁকড়া চুল। সিভিল সাপ্লাইএ ছ শ টাকা মাইনে পায়, বাপের একমাত্র ছেলে, বাপ কনট্রাকটারি করে নাকি কোটি টাকা করেছে। সেই গুঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুঃখ করো না, লক্ষ্মীটি। বকুল মল্লিককে চেন তো? আমার চেয়ে তিন বছরের জুনিয়ার, ডায়োসিসানে এক সঙ্গে পড়েছি। আমার কাছে দাঁড়াতে পারেনা,

তা হক, অমন মেয়ে হাজারে একটি পাবে না। বকুলকে বাগাও, তুমি সুখী হবে। প্রিয় ডারলিং, এই আমার শেষ প্রেমপত্র, কাল থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার স্নেহময়ী দিদি। ইতি। আজ পর্যন্ত তোমারই—হিন্দোলা।

চিঠি পড়ে পরেশবাবু বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা হে! হিন্দোলা নিজেই সরে পড়ছে, এ তো অতি সুখবর, এতে দুঃখ কিসের? তোমার আবার কালীঘাটে পূজো দেওয়া চলবে না, না হয় গির্জেয় দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিও। নাও এখন ওঠ, চোখে মুখে জল দাও, চা আর খানকতক লুচি খাবে এস। হাঁ, ভাল কথা—পাথরটার কোনও গতি করতে পারলে?

প্রিয়তোষ করুণ স্বরে বললে, গিলে ফেলেছি সার। এ প্রাণ আর রাখব না, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই কবরে যাবে। ওঃ, এত দিনের ভালবাসার পর এখন কিনা গুঞ্জন ঘোষ!

পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, পাথরটা গিললে কেন? বিষ নাকি?

প্রিয়তোষ বললে, কম্পোজিশন তো জানা নেই সার, কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা বিষ। যদি নাও হয়, যদি আজ রাত্রির মধ্যে না মরি, তবে কাল সকালে নিশ্চয় দশ গ্রাম পটাশ সায়ানাইড খাব, আমি ওজন করে রেখেছি। আপনি ভাববেন না সার, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই কবরস্থ হয়ে থাকবে, সেই ডে অভ জজমেণ্ট পর্যন্ত।

পরেশবাবু বললেন, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! ওসব বদখেয়াল ছাড়, আমি চেষ্টা করব যাতে হিন্দোলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। ওর বাপ জগাই মজুমদার আমার বাল্যবন্ধু, ঘুঘু লোক। তোমাকে আমি ভাল রকম যৌতুক দেব, তা শুনলে হয়তো সে মেয়ে দিতে রাজী হবে। কিন্তু তুমি যে খ্রীষ্টান—

—হিঁদু হব সার।

—একেই বলে প্রেম। এখন ওঠ, ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছে চল, পাথরটাকে তো পেট থেকে বার করতে হবে।

পরেশবাবু জানালেন যে প্রিয়তোষ অন্যমনস্ক হয়ে একটা পাথরের নুড়ি গিলে ফেলেছে। ডাক্তারের উপদেশে পরদিন এক্স রে ফটো নেওয়া হল। তা দেখে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, এমন কেস দেখা যায় না, কালই আমি লানসেটে রিপোর্ট পাঠাব। এই ছোকরার অ্যাসেণ্ডিং কোলনের পাশ থেকে ছোট্ট একটি সেমিকোলন বেরিয়েছে, তার মধ্যে পাথরটা আটকে আছে। হয়তো আপনিই নেমে যাবে। এখন যেমন আছে থাকুক, বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। যদি মন্দরূপ লক্ষণ দেখা দেয় তবে পেট চিরে বার করে দেব।

পরেশবাবুর চিঠি পেয়ে জগাই মজুমদার তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলেন এবং কথাবার্তার পর ছুটে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বললেন, ওরে দোলা, প্রিয়তোষ হিন্দু হতে রাজী হয়েছে, তাকেই বিয়ে কর্। দেরি নয়, ওর শুদ্ধিটা আজই হয়ে যাক, কাল বিয়ে হবে।

হিন্দোলা আকাশ থেকে পড়ে বললে, কি তুমি বলছ বাবা! এই পরশু বললে গুঞ্জন ঘোষ, আবার আজ বলছ প্রিয়তোষ! এই দেখ, গুঞ্জন আমাকে কেমন হীরের আংটি দিয়েছে। বেচারা মনে করবে কি? তুমি তাকে কথা দিয়েছ, আমিও দিয়েছি, তার খেলাপ হতে পারে না। গুঞ্জনের কাছে কি প্রিয়তোষ? কিসে আর কিসে!

জগাইবাবু বললেন, যা যাঃ, তুই তো সব বুঝিস। প্রিয়তোষ এখন হিরণ্যগর্ভ হয়েছে, তার পেটে সোনার খনি। যবে হক একদিন বেরুবেই, তখন সেই পরশ পাথর তোরই হাতে আসবে। পরেশবাবু সেটা আর নেবেন না, প্রিয়তোষকে যৌতুক দিয়েছেন। ফেরত দে

ওই হীরের আংটি, অমন হাজারটা আংটি প্রিয়তোষ তোকে দিতে পারবে। এমন সুপাত্রের কাছে কোথায় লাগে তোর গুঁজে ঘোষ আর তার কনট্রাকটার বাপ? আর কথাটি নয়, প্রিয়তোষকেই বিয়ে কর্।

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হিন্দোলা বললে, তাকেই তো ভালবাসতুম? কিন্তু বড্ড যে বোকা!

জগাইবাবু বললেন, আরে বোকা না হলে তোকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? যার পেটে পরশ পাথর সে তো ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারে।

প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসের মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। তার শুদ্ধি হল, এক সের ভেজিটেব্‌ল ঘি দিয়ে হোম হল, পাঁচ জন ব্রাহ্মণ লুচি-ছোঁকা-দই-বোঁদে খেলে। তার পর শুভলগ্নে হিন্দোলা-প্রিয়তোষের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু জগাইবাবু আর তাঁর কন্যার-মনস্কামনা পূর্ণ হল না, পাথরটা নামল না। কিছুদিন পরে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল—পরেশবাবুর তৈরী সমস্ত সোনার জেল্লা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল, মাস খানিক পরে যেখানে যত ছিল সবই লোহা হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা খুব সোজা। সকলেই জানে যে ব্যর্থ প্রেমে স্বাস্থ্য যেমন বিগড়ে যায়, তৃপ্ত প্রেমে তেমনি চাঙ্গা হয়, দেহের সমস্ত যন্ত্র চটপট কাজ করে, অর্থাৎ মেটাবলিজম বেড়ে যায়। প্রিয়তোষ এক মাসের মধ্যে পরশ পাথর জীর্ণ করে ফেলেছে, এক্স রে-তে তার কণামাত্র দেখা যায় না। পাথরের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পরেশবাবুর সমস্ত সোনা পূর্বরূপ পেয়েছে।

হিন্দোলা আর তার বাবা ভীষণ চটে গেছেন। বলছেন, প্রিয়তোষটা মিথ্যাবাদী ঠক জোয়াচ্চোর। ধাপ্পায় বিশ্বাস করে তাঁরা

আশায় আশায় এত দিন বৃথাই ওই খ্রীষ্টানটার ময়লা ঘেঁটেছেন। কিন্তু পরশ পাথর হজম করে প্রিয়তোষ মনে বল পেয়েছে, তার বুদ্ধিও বেড়ে গেছে, পত্নী আর শ্বশুরের বাক্যবাণ সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। এমন কি হিন্দোলা যদি বলে, তোমাকে তালাক দেব, তবু সে সায়ানাইড খাবে না। সে বুঝেছে যে সেণ্ট ফ্রানসিস আর পরমহংস দেব খাঁটি কথা বলে গেছেন, কামিনী আর কাঞ্চন দুইই রাবিশ; লোহার তুল্য কিছু নেই। এখন সে পরেশবাবুর নূতন লোহার কারখানা চালাচ্ছে, রোজ পঞ্চাশ টন নানা রকম মাল ঢালাই করছে, এবং বেশ ফূর্তিতে আছে।

১৩৫৫

রামরাজ্য

জেলা জজ সুবোধ রায় সম্প্রতি অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। তিনি এখন গীতা পড়েন, সস্ত্রীক ঘন ঘন সিনেমা দেখেন, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলেন এবং রাজনীতি নিয়ে তর্ক করেন। তাঁর আর একটি শখ আছে—প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি সেয়াঁস বা প্রেতচক্রের অধিবেশন হয়। এই চক্রের সদস্য সাত জন, যথা—

সুবোধ রায় নিজে,
বিপাশা দৈবী—তাঁর পত্নী,
হরিপদ কবিরত্ন—অধ্যাপক,
কানাই গাঙ্গুলী—প্রবীণ দেশপ্রেমী,
ভুজঙ্গ ভঞ্জ—নবীন দেশপ্রেমী,
অবধবিহারী লাল—কারবারী দেশপ্রেমী,
ভূতনাথ নন্দী—বিখ্যাত মিডিয়ম।

ভূতনাথ গুণী লোক। তিন মিনিট আবাহন করতে না করতে তার উপর পরলোকবাসীর ভর হয় এবং তার মুখ দিয়ে অনর্গল অলৌকিক বাণী বেরুতে থাকে। ভূতনাথের বয়স ত্রিশের মধ্যে। শোনা যায় পূর্বে সে স্কুলমাষ্টার ছিল, তার পর গল্প নাটক ও কবিতা লিখত, তারপর থিয়েটার সিনেমায় অভিনয় করত। এক কালে তার একটা কুস্তির আখড়াও ছিল। সম্প্রতি নিজের আশ্চর্য ক্ষমতা আবিষ্কার করে সে পেশাদার মিডিয়ম হয়েছে, সুবোধবাবু তার একজন বড় মক্কেল।

প্রেতচক্রের মামুলি পদ্ধতি হচ্ছে—অন্ধকার ঘরে সদস্যগণ টেবিলের চারিধারে বসেন এবং সকলে হাত ধরাধরি করে কোনও পরলোক-

বাসীকে একমনে ডাকেন। কিন্তু সুবোধবাবু খুঁতখুঁতে লোক। অন্ধকারে অন্য পুরুষ—বিশেষ করে ওই ভুজঙ্গ ছোকরা—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাত ধরে থাকবে, এ তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ভাগ্যক্রমে ভূতনাথকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। লোকটির আশ্চর্য ক্ষমতা, প্রেতাত্মার দল যেন তার পোষ-মানা। সে যেখানে মিডিয়ম হয় সেখানে হাত ধরার দরকার হয় না, অন্ধকার না হলেও চলে। এমন কি, প্রেতাত্মার কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে গল্প করা চলে, চা সিগারেট পান খেতেও বাধা নেই।

আজ শনিবার সন্ধ্যাবেলায় নীচের বড় ঘরে যথারীতি প্রেতচক্রের বৈঠক বসেছে, সকল সদস্যই উপস্থিত আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সব দরজা জানালা বন্ধ, পাছে কোনও উটকো লোক এসে বিঘ্ন ঘটায়।

পূর্বে কয়েকটি অধিবেশনে চন্দ্রগুপ্ত সিরাজুদ্দৌলা নেপোলিয়ন হিটলার প্রভৃতি নামজাদা লোক এবং পরলোকগত অনেক আত্মীয় স্বজন ভূতনাথের মারফত তাঁদের বাণী বলেছেন। সুবোধবাবু প্রশ্ন করলেন, আজ কাকে ডাকা হবে?

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বললে, আমার দাদামশাইকে একবার ডাকুন। তাঁর ভিক্টোরিয়া মার্কা গিনিগুলো কোথায় রেখে গেছেন খুঁজে পাচ্ছি না।

অবধবিহারী লাল বললে, দাদা চাচা মামু মৌসা উ সব ছোড়িয়ে দেন, মহাৎমাজীকো বোলান। দেখছেন তো, দেশ জহান্নমে যাচ্ছে, তিনি একটা সলাহ্ দেন জৈসে তুরন্ত্ রামরাজ্য হইয়ে যায়।

কানাই গাঙ্গুলী বললে, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন, ঢের করে গেছেন, এখন বিশ্রাম করুন।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বললে, মহাত্মাজীকে ডেকে লাভ নেই, তিনি কি বলবেন তা তো জানাই আছে।—চরকা চালাও, মাইনে কম নাও,

হুইস্কি ছাড়, বান্ধবীদের তাড়াও, ব্রহ্মচর্য পালন কর। এসব শুনতে গেলে কি রাজ্য চালানো যায়! কি বলেন কানাই-দা?

বিপাশা দেবী বললেন আচ্ছা, মহাত্মাজীর যিনি ইষ্টদেব সেই রামচন্দ্রকে ডাকলে হয় না?

অবধবিহারী। বহুত আচ্ছি বাত বোলিয়েছেন, রামচন্দ্রজীকোই বোলান।

সুবোধ। সেই ভাল, রামরাজ্যের ফার্স্টহ্যাণ্ড খবর মিলবে।

ভুজঙ্গ। তাঁকে কোথায় পাবেন? তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা তারই ঠিক নেই। ভূতনাথবাবু কি বলেন?

ভূতনাথ। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

বিপাশা দেবীর প্রস্তাব সোৎসাহে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তখন সকলে গুনগুন করে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গাইতে লাগলেন। দু মিনিট পরে ভূতনাথ চোখ কপালে তুলে মুখ উঁচু করে চেয়ারে হেলে পড়ল এবং অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল। সুবোধবাবু সসম্ভ্রমে বললেন, কনট্রোল এসে গেছেন,—অর্থাৎ মিডিয়মের উপর অশরীরী আত্মার আবেশ হয়েছে। অবধবিহারী বলে উঠল, রাজা রামচন্দ্রজীকি জয়!

ভূতনাথের মুখ থেকে শব্দ হল—খ্যাঁক খ্যাঁক। সুবোধবাবু বললেন, কে আপনি প্রভু?

অবধবিহারী। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীমে পুছিয়ে, রামচন্দ্রজী বাংলা সমঝেন না। অপ কৌ হৈঁ মহারাজ?

আবার খ্যাঁক খ্যাঁক। কবিরত্ন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, প্রভু, যদি আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে তো মার্জনা করুন। কৃপা-পূর্বক বলুন কে আপনি।

ভূতনাথের মুখ থেকে উত্তর বেরুল—অহম্মারুতিঃ।

অবধবিহারী। আরে, ই তো চীনা বোলি বোলছে!

কবিরত্ন। চীনা নয়, দেবভাষায় বলছেন—আমি মারুতি। স্বয়ং পবননন্দন শ্রীহনুমানের আবির্ভাব হয়েছে।

অবধবিহারী। জয় বজরঙ্গ্‌বলী মহাবীরজী!—

রাম কাজ লাগি তব অবতারা।
কনক বরন তম পর্বতাকারা॥

প্রভু অপ হিন্দীমে কহিয়ে, রামরাজ্যকি ভাষা।

ভূতনাথের জবানিতে মহাবীর আর একবার সজোরে খ্যাঁক করে উঠলেন, তার পর বললেন, রামরাজ্যের ভাষার তুমি কি জান হে? এখন গন্ধমাদনে থাকি, কিন্তু আমার আদি নিবাস কিষ্কিন্ধ্যা, মাই-সোরের কাছে বেলারি জেলায়। আমার মাতৃভাষাই জগতের আদি ও বুনিয়াদি ভাষা। যদি সে ভাষায় কথা বলি তবে তোমাদের রাজাজী আর পট্টভিজী হয়তো একটু আধটু বুঝবেন, কিন্তু জহরলালজী রাজেন্দ্রজী আর তোমরা বিন্দুবিসর্গও বুঝবে না।

বিপাশা। যাক যাক। আপনি যখন বাংলা জানেন তখন বাংলাতেই বলুন।

মহাবীর। কিরকম বাংলা? ঢাকাই, না মানভূমের, না বাগ-বাজারী, না বালিগঞ্জী?

বিপাশা। আপনি মাঝামাঝি ভবানীপুরী বাংলায় বলুন, তা হলে আমরা সবাই বুঝতে পারব।

কবিরত্ন। প্রভু মারুতি, আপনার আগমনে আমরা ধন্য হয়েছি, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এলেন না কেন?

মহাবীর। তাঁর আসতে বয়ে গেছে। তোমাদের কি-এমন পুণ্য আছে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও? তাঁর আজ্ঞায় আমি এসেছি। এখন কি জানতে চাও চটপট বলে ফেল, আমার সময় বড় কম।

সুবোধ। শুনুন মহাবীরজী। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আর কিছুই পাই নি।—

কবিরত্ন। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, ধর্ম নেই, সত্য নেই, ত্যাগ নেই, বিনয় নেই, তপস্যা নেই—

অবধবিহারী। বিলকুল চোর, ডাকু, লুটেরা, কালাবাজারুয়া, গাঁঠ-কটৈয়া—

ভুজঙ্গ। পুঁজিপতির অত্যাচার, সর্বহারার আর্তনাদ, জুলুম, ফাসিজ্‌ম, ধাপ্পাবাজি, কথার তুবড়ি, ভাইপো-ভাগনে-শালা-শালী-পিসতুতো-মাসতুতো-ভরণতন্ত্র—

কানাই। বিদেশী গুরুর প্ররোচনায় স্বদেশদ্রোহিতা, ভারতের আদর্শ বিসর্জন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যার প্রচার, কিষান-মজদুরকে কুমন্ত্রণা, বোকা ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া, পিস্তল, বোমা—

মহাবীর। থাম থাম। কি চাও তাই বল।

অবধবিহারী। হামি বোলছি, শুনেন মহাবীরজী।—চারো তরফ ঘুস-খবৈয়া, সব মুনাফা ছিনিয়ে লিচ্ছে। বড় কষ্টে রহেছি, যেন দাঁতের মাঝে জিভ। বিভীখনজী জৈসা বোলিয়েছেন—

স্নুনহু পবনস্নুত রহনি হমারী।
জিমি দসনন্‌হি মহু জীভ বিচারী॥

প্রভু, এক মুক্কা মার কে ইয়ে সব দাঁত তোড়িয়ে দেন।

কবিরত্ন। তুমি একটু চুপ কর তো বাপু। মহাবীরজী, আমরা কেবল রামরাজ্য চাই, তা হলেই সব হবে। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ, প্রজার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

কানাই। পণ্ডিত মশাই, ব্যস্ত হলে চলবে না, রাষ্ট্র-শাসনের ভার কদিনই বা আমরা পেয়েছি। মহাবীরজীর কৃপায় যদি দেশ-বিদ্রোহীদের জব্দ করতে পারি তবে দেখবেন শীঘ্রই কিষান-মজদুর-রাজ হবে।

কবিরত্ন। কিষান-মজদুর সেক্রেটেরিয়েটে বসে রাজকার্য চালাবে?

ভুজঙ্গ। শোনেন কেন ওসব কথা, শুধু ভোট বজায় রাখবার জন্য ধাপ্পাবাজি।

কানাই। ভাই হে, ধাপ্পাবাজির ওস্তাদ তো তোমরা, তোমাদেরই গুটিকতক বুলি আমরা শিখেছি।

সুবোধ। থাম, এখন ঝগড়া করো না। মহাবীরজী, দলাদলিতে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে, আপনি প্রতিকারের একটা উপায় বলুন। আমরা চাই বিশুদ্ধ ডিমোক্রেসি অর্থাৎ গণতন্ত্র, কিন্তু নানা দলের নানা কথা শুনে লোকে ঘাবড়ে যাচ্ছে, ডিমোক্রাসি দানা বাঁধতে পাচ্ছে না।

মহাবীর। একটি প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—গোনর্দ দেশের রাজা গোবর্ধনের একলক্ষ গরু ছিল, তারা রাজধানীর নিকটস্থ অরণ্যে চরে বেড়াত, জনকতক গোপ তাদের পালন করত। কি একটা মহাপাপের জন্য অগস্ত্য মুনি শাপ দেন, তার ফলে রাজা এবং বিস্তর প্রজার মৃত্যু হল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। রাজার গরুর পাল রক্ষকের অভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বিনষ্ট হতে লাগল। তখন একটি বিজ্ঞ বৃষ বললে, এরকম অরাজক অবস্থায় তো আমরা বাঁচতে পারব না, ওই পর্বতের গুহায় পশুরাজ সিংহ থাকেন, চল আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই। গরুদের প্রার্থনা শুনে সিংহ বললে, উত্তম প্রস্তাব, আমি তোমাদের রাজা হলুম, তোমাদের রক্ষাও করব। কিন্তু আমাকেও তো জীবনধারণ করতে হবে, অতএব তোমরা রাজকর স্বরূপ প্রত্যহ একটি নধর গরু আমাকে পাঠাবে। গরুর দল রাজী হয়ে প্রণাম করে চলে গেল এবং সিংহকে রাজকর দিতে লাগল। কিছুকাল পরে সিংহ মাতব্বর গরুদের ডেকে আনিয়ে বললে, দেখ একটি গরুতে আর কুলচ্ছে না, রাজ্যশাসনের জন্য অনেক অমাত্য পাত্র মিত্র বহাল করতে হয়েছে। আমিও সংসারী লোক, পুত্রকন্যা ক্রমেই বাড়ছে, তাদেরও তো খাওয়াতে হবে। অতএব রাজকর বাড়াতে হচ্ছে, এখন থেকে

তোমরা প্রত্যহ দশটি গরু পাঠাও। গরুরা বিষণ্ণ হয়ে যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আরও কিছুকাল পরে সিংহ বললে, ওহে প্রজাবৃন্দ, দশটি গরুতে আর চলে না, রাজ্যশাসন সোজা কাজ নয়। আর তোমরাও অতি বেয়াড়া প্রজা, তোমাদের দমনের জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। অতএব এখন থেকে প্রতিদিন কুড়িটি করে গরু পাঠাও। গরুর মুখপাত্ররা উপায়ান্তর না দেখে এবারেও বললে, যে আজ্ঞে মহারাজ ; তার পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। তখন সেই বিজ্ঞ বৃষ বললে, এই অরণ্যের উত্তর প্রান্তে এক মহাস্থবির তপস্বী বৃষ আছেন। পূর্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অখাদ্য ভোজনের ফলে বৃষত্ব পেয়েছেন। এখন তিনি তপস্যা করে গবর্ষি হয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, চল তাঁকে আমাদের দুঃখ জানাই। গরুরা গবর্ষির আশ্রমে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা বললে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে গর্বিষ বললেন, আমি তোমাদের একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এটি তোমরা নিরন্তর জপ কর—গোহিতায় গোভির্গবাং শাসনম্।

বিপাশা। মানে কি হল ?

কবিরত্ন। অর্থাৎ গরুর হিতের নিমিত্ত গরু কর্তৃক গরু শাসন।

বিপাশা। আশ্চর্য ! ঠিক যেন government of the people, by the people, for the people.

মহাবীর। তার পর শোন। গবর্ষি বললেন, এই মন্ত্রটি তোমরা সর্বত্র প্রচার করবে, এক মাস পরে আবার আমার কাছে আসবে। গরুর দল মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেল এবং এক মাস পরে আবার এল। গবর্ষি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত ? গরুরা বললে, প্রায় এক লক্ষ ; সিংহ অনেককে খেয়েছে, নয়তো আরও বেশী হত। গবর্ষি বললেন, সিংহ আর তার অনুচরবর্গের সংখ্যা কত ? গরুরা বললে, শ-খানিক হবে। গবর্ষি বললেন, মন্ত্র জপ করে তোমাদের তেজ বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এক কাজ কর—সকলে মিলে শিং উঁচিয়ে চারিদিক থেকে তেড়ে গিয়ে সিংহদের গুঁতিয়ে দাও। গরুর দল

মহা উৎসাহে সিংহদের আক্রমণ করলে, গোটাকতক গরু মরল, কিন্তু সিংহের দল একেবারে ধ্বংস হল।

বিপাশা। কিন্তু আবার তো অরাজক হল?

মহাবীর। উঁহু। গরুরা গণতন্ত্রের মন্ত্র শিখেছে, তারা নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকটি চালাক উদ্যমশীল গরু নির্বাচন করে তাদের উপর প্রজাশাসনের ভার দিলে। কিছুকাল পরে দেখা গেল, সেই শাসক-গরুদের খাড়া খাড়া গোঁফ বেরিয়েছে, শিং খসে গেছে, খুরের জায়গায় থাবা আর নখ হয়েছে। তাদের কেউ বাঘের, কেউ শেয়ালের, কেউ ভালুকের রূপ পেয়েছে। প্রজা-গরুরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই সব, এ কি দেখছি? কোন্ পাপে তোমাদের এই শ্বাপদ-দশা হল? শাসক-গরুরা উত্তর দিলে হুঁহুঁ, পাপ নয়, আমরা ক্ষত্রিয় হয়েছি, ঘাস খেয়ে রাজকার্য করা চলে না, জাবর কাটতে বৃথা সময় নষ্ট হয়। এখন আমরা আমিষাহারী। ঘরে বাইরে শত্রুরা ওত পেতে আছে, তোমাদের রক্ষণ আর সেবার জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। আমাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, সেজন্য ক্ষুধাও প্রবল। বনের সব মৃগ আমরা খেয়ে ফেলেছি। যদি সুশাসন চাও তবে তোমরা সকলে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করে আমাদের উপযুক্ত আহার যোগাও, যেমন সিংহের আমলে যোগাতে। গরুরা রাজী হল। কিন্তু গুটি কতক ধূর্ত গরু ভাবলে, বাঃ, এরা তো বেশ আছে, সর্দারি করে বেড়াচ্ছে, ঘাস খুঁজতে হচ্ছে না, জাবর কাটতে হচ্ছে না, আমাদেরই হাড় মাস কড় মড় করে খাচ্ছে। আমারই বা ফাঁকে পড়ি কেন? এই স্থির করে তারা দল বেঁধে শ্বাপদ গরুদের গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিলে এবং নিজেরাই শাসক হল। কিছুকাল পরে তারাও শ্বাপদ হয়ে গেল এবং তাদের দেখে অন্য গরুদেরও প্রভুত্বের লোভ হল। এই রকমে সমস্ত গরু গুঁতোগুঁতি কামড়াকামড়ি করে মরে গেল, গোনর্দ দেশ একটি গোভাগাড়ে পরিণত হল।

কানাই। আপনার এই গল্পের মরাল কি? আপনি কি বলতে চান গণতন্ত্র খারাপ?

মহাবীর। তন্ত্রে রাজ্যশাসন হয় না, মানুষই রাজ্য চালায়। গণতন্ত্র বা যে তন্ত্রই হোক, তা শব্দ মাত্র, লোকে ইচ্ছানুসারে তার ব্যাখ্যা করে।

সুবোধ। ঠিক বলেছেন। ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়া প্রত্যেকেই বলে যে তাদের শাসনতন্ত্রই খাঁটি ডিমোক্রাসি।

মহাবীর। শাসনপদ্ধতির নাম যাই হ'ক দেশের জনসাধারণ রাজ্য চালায় না, তারা কয়েকজনকে পরিচালক রূপে নিযুক্ত করে, অথবা ধাপ্পায় মুগ্ধ হয়ে একজনের বা কয়েকজনের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এই কর্তারা যদি সুবুদ্ধি সাধু নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মপটু হয় তবে প্রজারা সুখে থাকে। কিন্তু কর্তারা যদি মূর্খ হয়, অথবা ধূর্ত অসাধু স্বার্থপর ভোগী আর অকর্মণ্য হয় তবে প্রজারা কষ্ট পায়, কোনও তন্ত্রেই ফল হয় না।

ভুজঙ্গ। আপনার রামরাজ্য কি ছিল? একেবারে অটোক্রাসি, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না।

মহাবীর। কে বললে ছিল না? কোশলরাজমহিষী সীতার বনবাস হল কাদের জন্য? শম্বুককে মারা হল কাদের কথায়?

বিপাশা। কিন্তু রামচন্দ্রের এইসব কাজ কি ভাল?

মহাবীর। ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক রামচন্দ্র লোকমত মেনেছিলেন। তখনকার ভাল-মন্দের বিচার করা এখনকার লোকের সাধ্য নয়। লোকমত সৃষ্টি করেন প্রভাবশালী সুবুদ্ধি সাধুগণ, অথবা ধূর্ত অসাধুগণ। রামচন্দ্র নিজের মতে চলতেন না। নিঃস্বার্থ জ্ঞানী ঋষিরা কর্তব্য-অকর্তব্য বেঁধে দিয়েছিলেন, রামচন্দ্র তাই মানতেন, প্রজারাও তাই মানত। এখনকার বিচারে ঋষিদের অনেক বিধানে ত্রুটি বেরুবে, কিন্তু তাঁরা ঐশ্বর্যকামী বা প্রভুত্বকামী ছিলেন না, রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধেও সকলে প্রায় একমত ছিলেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ছিদ্র পেত না, বিপক্ষও হত না।

সুবোধ। অর্থাৎ রামরাজ্য মানে ওআন পার্টি ঋষিতন্ত্র। এখন সেরকম ঋষি যোগাড় করা যায় কি করে?

মহাবীর। ঋষি চাই না। যাঁদের হাতে দেশশাসনের ভার এসেছে তাঁরা যদি বুদ্ধিমান সাধু নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মী হন তবে লোকমত তাঁদের অনুসরণ করবে।

সুবোধ। কিন্তু ধূর্ত অসাধুরা তাঁদের পিছনে লাগবে, ভাঁওতা দিয়ে স্বপক্ষে ভোট যোগাড় করবে, কর্তৃত্ব দখল করবে।

মহাবীর। কত দিন তা পারবে? স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় তোমাদের বহু লোক বহু বাধা পেয়েছেন, জীবনপাতও করেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের সাধনা সফল হয়েছে। রামরাজ্য অর্থাৎ সাধুজনপরিচালিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠানও সেই রকমের হবে। এই ব্রত যাঁরা নেবেন তাঁরা নিজের আচরণ দ্বারা প্রজার বিশ্বাসভাজন হবেন, উপস্থিত সুবিধার জন্য কুটিল পথে যাবেন না, লোভী ধনপতি অথবা অসাধু সহকর্মীদের সঙ্গে রফা করবেন না, দুষ্কর্ম উপেক্ষা করবেন না। বার বার পরাভূত হলেও তাঁদের চেষ্টা কালক্রমে সফল হবেই। যত দিন একদল লোক এই ব্রত না নেবেন তত দিন শাসনতন্ত্রের নাম নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

কানাই। মহাবীরজী, আপনার ব্যবস্থা এখন অচল, ওতে গণতন্ত্র হবে না। এ যুগে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কেউ নেই।

মহাবীর। তবে সেই গরুদের মত গুঁতোগুঁতি কামড়াকামড়ি করে মর গে।

সুবোধ। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে কি অসাধুতা আর অপটুতা নেই? তাদের দেশে তো গণতন্ত্র অচল হয় নি।

মহাবীর। বিদেশে তারা যতই অন্যায় করুক, নিজের দেশ শাসনের জন্য যে সাধুতা আর পটুতা আবশ্যক তা তাদের আছে।

কানাই। যাই বলুন মহাবীরজী, আগে এই ভুজঙ্গ ভায়ার

দলটিকে শায়েস্তা করতে হবে, যতসব ঘরভেদী বিভীষণ, দাঙ্গাবাজ খুনে ডাকাত, কুচক্রী কমবক্ত কমরেড।

ভুজঙ্গ। মহাবীরজী, এই কানাইদার দলটিকে ধ্বংস না করলে কিছুই হবে না, যতসব ভেকধারী ভণ্ড, ক্রোড়পতির কুত্তা।

কানাই। মুখ সামলে কথা বল ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ। যত সব মিটমিটে শয়তান, বিড়াল-তপস্বী, রক্তচোষা বাহুড়।

কানাই গাঙ্গুলি অত্যন্ত চটে উঠে ঘুষি তুলে মারতে এল, ভুজঙ্গ তার হাত ধরে ফেললে। দুজনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল।

সুবোধবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তোমাদের কি স্থান কাল জ্ঞান নেই, এখন মারামারি করছ? ওহে অবধবিহারী, থামিয়ে দাও না।

অবধবিহারী। হামি আজ একাদ্সি কিয়েছি বাবুজী, বহুত কমজোর আছি।

বিপাশা। মহাবীরজী, আপনি উপস্থিত থাকতে এই সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই হবে?

ভূতনাথ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং নিমেষের মধ্যে পিছন থেকে লাথি মেরে কানাই আর ভুজঙ্গকে ধরাশায়ী করে দিলে। তার পর আবার নিজের চেয়ারে বসে চোখ কপালে তুলে সমাধিস্থ হল।

গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভুজঙ্গ বললে, সুবোধবাবু, আপনার বাড়িতে এই অপমান সইতে হবে?

পাছায় হাত বুলুতে বুলুতে কানাই বললে, কুমোরের পুত্তুর ভূতো নন্দী ব্রাহ্মণের গায়ে লাথি মারবে?

অবধবিহারী। এ কনহৈয়াবাবু, গুস্সা করবেন না। লাত তো ভূতনাথবাবুর থোড়াই আছে, খুদ মহাবীরজী লাত লাগিয়েছেন।

কবিরত্ন। ঠিক কথা, ভূতনাথের সাধ্য কি। স্বয়ং শ্রীহনুমান

কলহ নিবারণের জন্য লাথি ছুড়েছেন। দেবতার পদাঘাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাতে অপমান নেই।

বিপাশা। যেতে দিন, যেতে দিন। মহাবীরজী, কিছু মনে করবেন না।

অবধবিহারী। আচ্ছা মহাবীরজী, বোলেন তো, রামরাজ্য হোনে সে শেয়ার মার্কিট কুছ তেজ হোবে? বড়া নুকসান যাচ্ছে।

মহাবীর উত্তর দিলেন না।

ভূতনাথের মাথা ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। লক্ষণ দেখে সুবোধবাবু বললেন, কনট্রোল ছেড়ে গেছেন। একটু পরে ভূতনাথ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে, দাদা, একটু চা আনতে বলুন।

অবধবিহারী। আরে ভূতনাথবাবু, মহাবীরজী তো বহুত ঝঞ্ঝট কি বাত বোলিয়েছেন, লাত ভি মারিয়েছেন।

ভূতনাথ। বলেন কি! লাথি মেরেছেন? কাকে? আমাদের কানাইদা আর ভুজঙ্গদাকে? সর্বনাশ, ইশ, বড় অপরাধ হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না দাদারা—আমার কি আর হুঁশ ছিল! দিন, পায়ের ধুলো দিন।

১৩৫৬

শোনা কথা

আমাদের পাড়ায় একটি ছোট পার্ক আছে, চার ধারে একবার ঘুরে আসতে পাঁচ মিনিট লাগে। সকাল বেলায় অনেকগুলি বুড়ো ও আধবুড়ো ভদ্রলোক সেখানে চক্কর দেন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল, এক এক দলে তিন-চার জন থাকেন। প্রত্যেক দলের আলাপের বিষয়ও আলাদা, যেমন রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, অমুক সাধুবাবার মহিমা, শেয়ার বাজারের দুরবস্থা, আজকালকার ছেলেমেয়ে,ইত্যাদি।

আশ্বিন মাস। একটি দলের কিছু পিছনে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি এল; পার্কে টালি দিয়ে ছাওয়া একটি ছোট আশ্রয় আছে, দলের চারজন তাতে ঢুকে পড়লেন। পূর্বে সেখানে দুটো বেঞ্চ ছিল, এখন একটা আছে, আর একটা চুরি গেছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে একজন বললেন, ভিতরে আসুন না, ভিজছেন কেন, বেঞ্চে পাঁচজন কুলিয়ে যাবে এখন, একটু না হয় ঘেঁষাঘেঁষি হবে। বাংলায় থ্যাংক ইউ মানায় না, আমি কৃতজ্ঞতা সূচক দন্তবিকাশ করে বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়লুম।

অনেক দিন থেকে এঁদের দেখে আসছি, কিন্তু কাকেও চিনি না। অগত্যা কাল্পনিক পরিচয় দিয়ে এঁদের বিচিত্র আলাপ বিবৃত করছি। প্রথম ভদ্রলোকটি—যিনি আমাকে ডেকে নিলেন—শ্যামবর্ণ, রোগা, মাথায় টাক, গোঁফ-কামানো, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; চোখে পুরু কাচের চশমা, হাতে খবরের কাগজ। এঁকে দেখলেই মনে হয় মাস্টার মশায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে বহুকাল থেকে আমাদের পাড়ায় দেখে আসছি। এঁর বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, ফরসা রং, স্থূলকায়, একটু বেশী বেঁটে। পনর বৎসর আগে এঁর কালো গোঁফ দেখেছি, তার পর পাকতে আরম্ভ করতেই বার্ধক্যের লক্ষণ ঢাকবার জন্য

কামিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি এঁর চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চামড়া খুব উর্বর,, টাক পড়েনি। এই সুযোগে ইনি এখন আবক্ষ দাড়ি-গোঁফ এবং আকণ্ঠ বাবরি চুল উৎপাদন করেছেন, তাতে চেহারাটি বেশ ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে। বোধহয় ইনি যোগশাস্ত্র, থিয়সফি, ফলিত জ্যোতিষ, ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথি প্রভৃতি গূঢ় তত্ত্বের চর্চা করেন। এঁকে ভরদ্বাজবাবু বলব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি দোহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় ষাট, কাঁচা-পাকা কাইজারি গোঁফ, চেহারা সম্ভ্রান্ত রকমের, পরনে ইজের ও হাতকাটা কামিজ, মুখে একটি বড় চুরুট। সর্বদাই ভ্রূ একটু কুঁচকে আছেন, যেন কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। ইনি নিশ্চয় একজন উঁচুদরের রাজকর্মচারী ছিলেন। এঁকে বাবু বললে হয়তো ছোট করা হবে, অতএব চৌধুরী সাহেব বলব। চতুর্থ লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, লম্বা মজবুত গড়ন, কালো রং, গায়ে আধময়লা খাদি পঞ্জাবি। গোঁফটি হিটলারি ধরনে ছাঁটা হলেও দেখতে ভাল-মানুষ, সবিনয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীদের কথা শোনেন, মাঝে মাঝে আনাড়ীর মতন মন্তব্য করেন। ইনি কেরানী, কি গানের মাস্টার, কি ভোটের দালাল, তা বোঝা যায় না। এঁকে ভজহরিবাবু বলব।

জিব দিয়ে একটা নৈরাশ্যের শব্দ করে ভজহরিবাবু বললেন, দিন দিন কি হচ্ছে বলুন তো! যা রোজগার করি তাতে খেতেই কুলয় না, ট্রামে বাসে দাঁড়াবার জায়গা নেই, আবার নতুন উপদ্রব জুটেছে বোমা। বড় ছেলেটা বিগড়ে যাচ্ছে, ধমকাবার জো নেই, তার বন্ধুদের লেলিয়ে দিয়ে কোন্‌দিন আমাকেই ঘায়েল করবে।

মাস্টার মশায় বললেন, আট শ বৎসর দাসত্বের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন অনেকে একটু বেচাল আর অসামাল হবেই। অবাধ্যতা বোমা চুরি-ডাকাতি কালোবাজার ঘুষ সবই কিছুকাল সইতে হবে,

অবশ্য প্রতিকারের চেষ্টাও করতে হবে। এই সমস্তই স্বাধীনতাযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অন্য দেশেও এমন হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব ধমকের সুরে বললেন, তা বলে বেপরোয়া যাকে তাকে বোমা মারবে?

মাস্টার। এ সমস্তই আমাদের কর্মফল—

ভরদ্বাজবাবু তর্জনী নেড়ে বললেন, যা বলেছ দাদা! সবই প্রারব্ধ, পূর্বজন্মের পাপের ফল।

মাস্টার। আজ্ঞে না, ইহজন্মেরই কর্মফল। আমাদের ব্যক্তিগত কর্মের নয়, জাতিগত কর্মের। অত্যাচারী ইংরেজ আর তাদের এদেশী তাঁবেদারদের মারবার জন্য স্বদেশী যুগের বিপ্লবীরা বোমা ছুড়তে। আমরা তখন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে বৈঠকখানায় বসে তাদের প্রশংসা করতাম। এখন আর ইংরেজের ভয় নেই, প্রকাশ্যে বলছি—মিউটিনিই প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ, খুদিরামই আদি শহীদ, সেই দেখিয়ে দিলে—দেবআরাধনে ভারত উদ্ধার, হবে না হবে না খোল তরবার।

ভরদ্বাজ। এই মতিগতির জন্যই দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে। খুদিরাম আমাদের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট করেছে, ছেলেদের খুন করতে শিখিয়েছে।

ভজহরি। বলেন কি মশায়! এই সেদিন মহাসমারোহে তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, দেশের বড় বড় লোক উপস্থিত হয়ে সেই মহাপ্রাণ বালকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

মাস্টার। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এতে খুশী হতেন না। জওহরলালও যেতে চান নি। পূর্বে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে নেতাজী ভারত আক্রমণ করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন। স্বদেশের মুক্তিকামী হলেই সকলের আদর্শ আর কর্তব্যবুদ্ধি সমান হয় না।

চৌধুরী। খুদিরাম তো ইংরেজকে মেরেছিল, কিন্তু এখন যে আমাদের গায়েই বোমা ফেলেছে। একেও কর্তব্যবুদ্ধি বলতে চান নাকি?

ভজহরি। মাস্টার মশায়, আপনি কি ক্ষুদিরামের কাজ গর্হিত মনে করেন?

মাস্টার। আমি অতি সামান্য লোক, ধর্মাধর্ম বিচার আমার সাধ্য নয়। কর্মের ফল যা দেখতে পাই তাই বলতে পারি। খুদিরাম যখন বোমা ফেলেছিল তখন বড় বড় মডারেটরা ধিক্‌কার দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে এই ভয়ংকর পন্থায় তাঁদের আস্থা নেই। খুদিরামের দল নিজের স্বার্থ দেখেনি, প্রাণের মায়া করেনি, ধমাধর্ম ভাবেনি, বিনা দ্বিধায় সরকারের সঙ্গে লড়েছিল। তারা শুধু ইংরেজকে বোমা মারেনি, মডারেট বুদ্ধিতেও ফাট ধরিয়েছিল। অনেক মডারেট আড়ালে বলতেন, বাহবা ছোকরা!

চৌধুরী সাহেব অধীর হয়ে বললেন, আপনি কেবল অবান্তর কথা বলছেন, আদালতে এ রকম বললে জজের ধমক খেতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই—ইংরেজ চলে গেছে, দেশনেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন আবার বোমা কেন?

মাস্টার মশায় সবিনয়ে বললেন, আদালতে কখনও যাইনি সার। আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে পারি এমন বুদ্ধি আমার নেই। যা মনে আসছে ক্রমে ক্রমে বলে যাচ্ছি, দয়া করে শুনুন। যদি তাড়া দেন তবে সব গুলিয়ে ফেলব।

চৌধুরী। বেশ, বলে যান।

মাস্টার। স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানো, বিদেশী শাসকরা চলে যাবার পর কি করতে হবে তা তারা ভাবে নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কোনও উপায়ে মানুষ মারা তারা পাপ মনে করত না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে অন্যত্র আড়াল থেকে বোমা মারতেও বলেছেন।

ভরদ্বাজ। কোথায় আবার বললেন? যত সব বাজে কথা।

মাস্টার। দ্রোণবধের জন্য মিথ্যা বলা এবং দুর্যোধনের কোমরের

নীচে গদাঘাত বোমারই শামিল। সাধারণ ধর্ম আর আপদ্ধর্ম এক নয়, আপৎকাল অনেকেই অল্পাধিক অধর্মাচরণ করে থাকেন। সন্ত্রাসকরা তাই করেছিল। পরে মহাত্মা গান্ধী যখন যুদ্ধের নূতন উপায় আবিষ্কার করলেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাও দেখা গেল তখন সন্ত্রাসকরা নিরস্ত হল। কিন্তু তারা হিংস্রতার জমি তৈরি করে গেল, বহু লোকের ধারণা হল যে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হিংস্র কর্মে দোষ হয় না, বরং তাতে বাহাদুরিও আছে। সাতচল্লিশ সালের দাঙ্গার অনেক শান্ত শিষ্ঠ হিন্দুসন্তান অসংকোচে খুন করতে শিখল। তার পর মহাত্মাজীও নিহত হলেন। অনেক গণ্যমান্য লোক চুপি চুপি বললেন, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুক্তিকামীদের আদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য হিংস্র-অহিংস্র নানা পন্থার উদ্ভব হয়েছে।

চৌধুরী। এখন একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা, তার পন্থা একই—জবরদস্ত গভর্নমেণ্ট।

মাস্টার। আজ্ঞে না। নানা লোকের নানা উদ্দেশ্য, কেউ চান রামরাজ্য, কেউ চান সমাজতন্ত্র, কেউ কিষান-মজদুরের রাজা হতে চান, কেউ চান সমভোগতন্ত্র বা কমিউনিজম। এঁরা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেন না যে ঠিক কি চান, এঁদের পন্থাও সমান নয়, কেউ আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে চান, কেউ তাড়াতাড়ি। কেউ মনে করেন বা মুখে বলেন যে যথাসম্ভব সত্য ও অহিংসাই শ্রেষ্ঠ উপায়, কেউ মনে করেন শঠে শাঠ্যং না হলে চলবে না, কেউ মনে করেন হিংস্র উপায়েই চটপট কার্যসিদ্ধি হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, আজকাল কতগুলি দল হয়েছে—কংগ্রেস, তার মধ্যেও দলাদলি, সমাজতন্ত্রী, হিন্দু-মহাসভা, কমিউনিস্ট আরও কত কি। এদের মধ্যে ভাল মন্দ হিংস্র অহিংস্র সব রকম লোক আছে।

ভজহরি। কংগ্রেসে হিংস্র লোক নেই?

মাস্টার। তা বলতে পারি না। দলের নীতি বা ক্রীড যাই হোক সকলেই তা অন্তরের সঙ্গে মানে না। সব দলেই এমন লোক আছে যাদের নীতি—মারি অরি পারি যে কৌশলে। অগস্ট বিপ্লবে অনেক কংগ্রেসী হিংস্র কাজ করেছিল। এখনও কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছে যারা প্রতিপক্ষকে যে-কোনও উপায়ে জব্দ করতে প্রস্তুত।

ভজহরি। কিন্তু কংগ্রেসের ওপর মহাত্মার প্রভাব এখনও রয়েছে। তারা যতই অন্যায় করুক কমিউনিস্টদের মতন বোমা ছোড়ে না।

মাস্টার। হিংস্র কমিউনিস্টদের তুলনায় হিংস্র কংগ্রেসী অনেক কম আছে তা মানি, কিন্তু সব কংগ্রেসী মনে প্রাণে অহিংস নয়, সব কমিউনিস্টও হিংস্র নয়। বিলাতে লাস্কি হালডেন বার্নাল প্রভৃতি মনীষীরা কমিউনিস্ট, কিন্তু তাঁরা অসৎ বা হিংস্র প্রকৃতির লোক নন, রাশিয়ার অন্ধ ভক্তও নন। এদেশেও যোশী-প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হিংসার বিরোধী বলে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

চৌধুরী। মাস্টার মশায়, আপনার মতলবটা কি খোলসা করে বলুন তো। বোধ হচ্ছে আপনি কমিউনিস্ট দলের ভক্ত।

মাস্টার। কোনও দলেরই ভক্ত নই, মানুষকেই ভক্তি করি। কোনও মানুষের সব কাজেরও সমর্থন করি না। দলের লেবেল দেখে বিচার করব কেন, মানুষ কেমন তাই দেখব। কমিউনিস্টদের কথাই ধরুন। অনেক লোক আছে যারা মার্কস প্রভৃতির অল্পাধিক বিশ্বাস করে, সেজন্য নিজেদের কমিউনিস্ট বলে। এদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের বেশী প্রভেদ নেই। আবার অনেক কমিউনিস্ট গুপ্ত সমিতি সদস্য, তারা স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের মতন লুকিয়ে কাজ করে এবং দলের নেতাদের আদেশে চলে। এদের অনেকে রাশিয়ার তাঁবেদার বা অন্ধ ভক্ত। যেমন কংগ্রেসের মধ্যে তেমন

কমিউনিস্ট দলের মধ্যেও স্বার্থসর্বস্ব লোক আছে। অনেক কংগ্রেসী যেমন মন্ত্রিত্বকেই পরম কাম্য মনে করে, সেইরকম অনেক কমিউনিস্ট আশা করে যে ডিক্‌টেটারী রাষ্ট্র স্থাপিত হলে সে একটা কেষ্টবিষ্টুর পদ পাবে। আবার অনেকে, বিশেষত ছেলেমেয়ে, শখের জন্যই কমিউনিস্ট নাম নেয়। এরা কিছুই বোঝে না, শুধু কতগুলি মুখস্থ বুলি আওড়ায়। আবার এক দল বিশেষ কিছু না বুঝলেও তাদের নেতাদের আদেশে নানা রকম হিংস্র কর্ম করে এবং ভাবে যে দেশের মঙ্গলের জন্যই করছি। এমন দুর্বৃত্তও আছে যাদের কোনও রাজনীতিক মত নেই, কিন্তু সুবিধা পেলেই শুধু নষ্টামির জন্য ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমাও ফেলে। ভর্তৃহরি বলছেন, 'তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ পরিহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে, যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে'—যারা স্বার্থের জন্য পরের ইষ্টনাশ করে তারা নররাক্ষস, কিন্তু যারা অনর্থক পরের অহিত করে তারা কি তা জানি না।

ভরদ্বাজ। মাস্টার, তোমার কথায় এই বুঝলুম যে অনেক লোক দেশের ভাল করছি ভেবেই হিংস্র কর্ম করে, যেমন স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকরা করত; অনেকে হুজুক বা বজ্জাতির জন্য করে, অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে। কিন্তু দেশের জনসাধারণ হিংস্রতার বিরোধী, তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু চায় অন্ন বস্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি আর সুশাসন। তোমাদের পলিটিক্সে তা হবে। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র সমভোগতন্ত্র সমস্তই অচল ও অনাবশ্যক। দিল্লীতে যে ভারতশাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তাতে কিছুই হবে না।

মাস্টার। কি রকম শাসনতন্ত্র চান আপনিই বলুন।

ভরদ্বাজ। ধর্মরাজ্য চাই। প্রথমেই রাজার আশ্রয় নিতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশে একজন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা থাকবেন, তাঁদের সকলের ওপরে একজন সার্বভৌম রাজ-চক্রবর্তী সম্রাট

থাকবেন। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কেবল বিদ্বান সদ্‌ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরাই আইন করবেন রাজ্য চালাবেন। প্রজাদের কোনও সভা থাকবে না, রাম শ্যাম যদুর খেয়াল অনুসারে রাজ্য চলতে পারে না, তাতে কেবল ঝগড়া হবে। রাজারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবেন, মাঝে মাঝে যজ্ঞ করে প্রজাদের ধর্মকর্মে উৎসাহ দেবেন। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পূজা হবে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজবে, ধূপের ধূম উঠবে। রাষ্ট্রের লাঞ্ছনা, হবে? গরু, বাঘ-সিংগি চলবে না। জাতীয় সংগীত হবে মোহমুদ্‌গর। ফাঁসি উঠে যাবে, পাপীদের শূলে দেওয়া হবে। অনাচারী নাস্তিক আর বিধর্মীরা রাজকার্য করবে না, তারা নগরের বাইরে বাস করবে।

মাস্টার। চমৎকার, যেন সত্যযুগের স্বপ্ন। আপনার এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির রাষ্ট্রের কিছু কিছু মিল আছে। শরিয়তী রাজ্য এবং গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকদের আদর্শ খ্রীষ্টীয় রাজ্যও অনেকটা এই রকম। কিন্তু পৃথিবীতে বহু কোটি সনাতনী থাকলেও আপনার আদর্শ ধর্মরাজ্য বা শরিয়তী-খিলাফতী রাজ্য বা হোলি রোমান এম্পায়ার আর হবার নয়।

ভরদ্বাজ। আচ্ছা বাপু, তুমিই বল কোন্‌ উপায়ে দেশে শান্তি আর সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হবে।

মাস্টার। এমন উপায় জানি না যাতে রাতারাতি আমাদের দুঃখ ঘুচবে। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী আর গুণ্ডা ছাড়া দেশের সকলে শান্তি আর শৃঙ্খলা চায় তা ঠিক, কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোক উদ্‌যোগী বেপরোয়া, জনসাধারণ অলস নিরুদ্যম কাপুরুষ। একটা দশ বছরের ছেলে ট্রামে উঠে যদি বলে—নেমে যান আপনারা, গাড়ী পোড়ানো হবে—অমনি ভেড়ার পালের মতন যাত্রীরা সুড়্‌সুড় করে নেমে যাবে। অত প্রাণের মায়া করলে প্রাণরক্ষা হয় না। জড়পিণ্ড হয়ে শান্তি আর সুশাসন চাইলে তা মেলে না, শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করলেও মেলে না, চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়। বিপ্লবীদের

যেমন দল আছে শান্তিকামী লোকেও যদি সেই রকম আত্মরক্ষা আর দুষ্টদমনের জন্য দল তৈরি করে তবেই দেশে শান্তি আসবে। তা না হলে মুষ্টিমেয় লোকেরই আধিপত্য হবে।

ভরদ্বাজ। কেন, পুলিশ আর মিলিটারি কি করতে আছে ?

মাস্টার। জনসাধারণ যদি সাহায্য না করে তবে তারাও হাল ছেড়ে দেবে।

চৌধুরী সাহেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, হবে না, হবে না, আপনারা যে সব উপায় বলছেন তাতে কিছুই হবে না। আপনাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রে গোড়া থেকেই ঘুণ ধরেছে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—কেন রে বাপু ? জমিদার উচ্ছেদ করবার কি দরকার ছিল ? তারাই তো দেশের স্তম্ভস্বরূপ, চিরকাল গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করে এসেছে। নুনের শুল্ক আর মদ বন্ধ না করলে কি চলত না ? ভাবুন দেখি, কতকটা রাজস্ব খামকা নষ্ট করা হয়েছে! কিষান-মজদুরের উপর তো দরদের সীমা নেই, অথচ পেনশেনভোগীদের কথা কারও মনে আসে না। তাদের কি সংসার খরচ বাড়ে নি ? রাজা মহারাজ সার রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব তুলে দিয়ে কি লাভ হল ? এসব থাকলে বিনা খরচে সরকারের সহায়কদের খুশী করা যেত। রাজভক্ত প্রজাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ মন্ত্রীরা তো দিব্যি ডি এস-সি এল্‌-এল্‌ ডি খেতাব নিচ্ছেন! আরে তোদের বিদ্যে কতটুকু ? দেশনেতারা সবাই মন্ত্রী হতে চান। তাঁরা কেবল ভাবছেন কিসে ভোট বজায় থাকবে আর প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষ বোস সেনদের জব্দ করা যাবে। আমি বলছি, আপনাদের এই গভর্নমেণ্ট কিছুই করতে পারবে না, দেশ-শাসন এদের কাজ নয়।

মাস্টার। চৌধুরী সাহেব, আপনিও কমিউনিস্ট শাসন চান নাকি ?

চৌধুরী। টু হেল উইথ কমিউনিস্ট কংগ্রেস হিন্দুসভা অ্যাণ্ড সোশ্যালিস্ট !

মাস্টার। তবে বলুন কি চান ?

চৌধুরী। শুনবেন ? উঁহু, শেষকালে আমার পেনশনটি বন্ধ না হয়। কোথায় গোয়েন্দা আছে তা তো বলা যায় না।

ভরদ্বাজ। চৌধুরী সাহেব, আমরা আপনার পুরানো বন্ধু, আমাদের বিশ্বাস করেন না ?

চৌধুরী আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন দেখে আমি বললাম, আমি অতি নিরীহ লোক, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। ভরসা পেয়ে বললেন, সুশাসনের একমাত্র উপায় বলছি শুনুন।— রাজেন্দ্রজী পণ্ডিতজী আর সর্দারজী বিলেত চলে যান। সেখানে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে বলুন, প্রভু, ঢের হয়েছে, আমাদের শখ মিটে গেছে, আর স্বাধীনতায় কাজ নেই, আপনারা আবার এসে দেশ শাসন করুন। দু'শ বৎসর এখানে রাজত্ব করেছিলেন, আরও দু'শ বৎসর করুন, পিতার ন্যায় আমাদের জ্ঞানশিক্ষা দিন। তার পর যদি আমাদের লায়েক মনে করেন তবে নিজের দেশে ফিরে আসবেন।

মাস্টার। রোমানরা যখন ব্রিটেন থেকে চলে যাচ্ছিল তখন সেখানকার লোকেও এইরকম প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তাতে ফল হয় নি, বর্বর জার্মানদের আক্রমণ থেকে নিজের দেশ রক্ষার জন্যই রোমানদের চলে যেতে হয়েছিল। এদেশের কোনও নেতা ইংরেজকে ফিরে আসতে বলবেন না, বললেও ইংরেজ আর আসতে পারবে না।

চৌধুরী সাহেব উরুতে চাপড়ে মেরে বললেন, তবে রইল আপনাদের ভারত, এদেশে আমি থাকব না, বিলেতেই বাস করব।

জিরাফের মতন গলা বাড়িয়ে ভজহরিবাবু মৃদুস্বরে বললেন,

সার, আপনার আইভি রোডের বাড়িটা? বেচেন তো বলুন ভাল খদ্দের আমার হাতে আছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে দেখে আমি উঠে পড়লাম। ভরদ্বাজবাবু আমাকে বললেন, কই মশায়, আপনি তো কিছুই বললেন না!

আমি হাত জোড় করে উত্তর দিলাম, মাপ করবেন, কানে তালা লেগে আছে, গলা ভেঙে গেছে। এখন যেতে হবে রণজিৎ ভটচাজ ডাক্তারের কাছে। বসুন আপনারা, নমস্ক ।

১৩৫৬

তিন বিধাতা

সমস্ত উচ্চস্তরের আলাপ অর্থাৎ হাই লেভেল টক যখন ব্যর্থ হল তখন সকলে বুঝলেন যে মানুষের কথাবার্তায় কিছু হবে না, ঐশ্বরিক লেভেলে উঠতে হবে। বিশ্বমানবের হিতার্থী সাধু-মহাত্মারা একযোগে তপস্যা করতে লাগলেন। অবশেষে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি তা সম্ভব হল, ব্রহ্মা গড আর আল্লা সুমেরু অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বতে সমবেত হলেন। আরও বিস্তর দেবতা ও উপদেবতার এই ঐশ্বরিক সভার বিতর্কে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় উদ্‌যোক্তারা তিন বিধাতাকে আহ্বান করেছিলেন।

ব্রহ্মার সঙ্গে নারদ, গডের সঙ্গে সেণ্ট পিটার, এবং আল্লার সঙ্গে একজন পীরও অনুচর রূপে অবতীর্ণ হলেন। তা ছাড়া অনেক অনাহূত দেব দেবী ঋষি সেণ্ট যক্ষ নাগ ভূত পিশাচ এঞ্জেল ডেভিল প্রভৃতি মজা দেখবার জন্য অদৃশ্যভাবে আশেপাশে অবস্থান করলেন।

ব্রহ্মার মূর্তি সকলেই জানেন,—চার হাত, চার মুখ, একবার মনে হয় দাড়ি-গোঁফ আছে, আবার মনে হয় নেই। পরনে সাদা ধুতি-চাদর, কাঁধে পইতার গোছা, মাথায় মুকুট। গড নিরাকার, তাঁকে দেখবার জো নেই। তথাপি ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য তিনি পুরাকালের জিহোভার মূর্তিতে এলেন। বুকভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধভরা চুল, বড় বড় চোখ, কোঁচকানো ভ্রূ, দুর্বাসার মতন রাগী চেহারা, পরনে একটি আলখাল্লা। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে চীনাবাজারে ছবির

দোকানে খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় বিশেষের জন্য এই রকম ছবি বিক্রী হত, এখনও হয় কিনা জানি না।

আল্লা গডের চাইতেও নিরাকার, অনেক অনুরোধেও মূর্তি ধারণ করতে অথবা কোনও কথা বলতে মোটেই রাজী হলেন না। পীর-সাহেব বললেন, কোনও ভাবনা নেই, আল্লা সর্বত্র আছেন, এখানেও আছেন ; তাঁর মতামত আমিই ব্যক্ত করব। কিন্তু নারদ আর সেণ্ট পিটার বললেন, তুমি যে নিজের কথাই বলবে না তার প্রমাণ কি ? পীরসাহেব উত্তর দিলেন, এই চাঁদমার্কা ঝাণ্ডা খাড়া করে রাখছি, এর নীচে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে আমি কথা বলব ; আল্লা যদি নারাজ হন তবে এই পবিত্র ঝাণ্ডা আমার মাথায় পড়বে। ব্রহ্মা ও গড় এই প্রস্তাবে রাজী হলেন, কারণ আল্লার সেবককে খুশী রাখতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত।

নারদ, সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেবের বর্ণনা অনাবশ্যক। এঁদের চেহারা যাত্রার আসরে, প্রাচীন ইওরোপীয় চিত্রে এবং ইসলামী সভায় ও মিছিলে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা গড ও আল্লা—এঁদের মেজাজ একরকম নয়। ঠাট্টা তামাশায় কোনও হিন্দু দেবতা চটেন না। ব্রহ্মার তো কথাই নেই, তিনি সম্পর্কে সকলেরই ঠাকুরদা। গড অত্যন্ত গম্ভীর, তবে সম্প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ রসবোধ হয়েছে, তাঁকে নিয়ে একটু আধটু পরিহাস করা চলে। কিন্তু আল্লা শুধু দৃষ্টির অতীত বাক্যের অতীত নন, পরিহাসেরও অতীত। পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে যে আল্লার আধিপত্য ঘোষণা করা হয়েছে তা মোটেই তামাশা নয়।

কালিদাস লিখেছেন, মহাদেবের তপস্যার সময় নন্দীর শাসনে গাছ-পালা নিস্পন্দ হল, ভোমরা-মৌমাছি চুপ করে রইল, পাখি বোবা হল, হরিণের ছুটোছুটি থেমে গেল,—সমস্ত কানন যেন ছবিতে আঁকা।

তিন বিধাতার সমাগমে সুমেরু পর্বতেরও সেই অবস্থা হল ; কিন্তু এঁরা ধ্যানস্থ না হয়ে তর্ক আরম্ভ করলেন দেখে স্থাবর জঙ্গম আশ্বাস পেয়ে ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হল।

ব্রহ্মাকে দেখেই জিহোভারূপী গড ভ্রূকুটি করে বললেন, তুমি কি করতে এসেছ ? তোমাকে তো আজকাল কেউ মানে না, শুধু বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে তোমার ছবি ছাপা হয়। কৃষ্ণ শিব কালী বা রামচন্দ্র এলেও কথা ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, তাঁরা আমাকেই প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

পীরসাহেব অবাক হয়ে ব্রহ্মার দিকে চেয়ে আছেন দেখে নারদ বললেন, কি দেখছ সাহেব ?

পীর চুপি চুপি বললেন, এঁর তো চারো তরফ চার মুহ্। বিছানায় শোন কি করে ?

নারদ। শোবার জো কি! ভর রাত ঠায় বসে থাকেন। ইনি ঘুমুলে তো প্রলয় হবে।

পীর। ইয়া গজব !

সেণ্ট পিটার করজোড় বললেন, এখন সভার কাজ শুরু করতে আজ্ঞা হোক।

ব্রহ্মা বললেন, মাই হেভন্লি ব্রাদার্স, মেরে আসমানী বরাদরান, আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই সভায় একজন সভাপতি স্থির করা। আমি বয়সে সব চেয়ে বড়, অতএব আমিই সভাপতিত্ব করব।

গড় বললেন, তা হতেই পারে না। তুমি হচ্ছ তেত্রিশ কোটির একজন, আর আমি হচ্ছি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর—

ঝাণ্ডার দিকে সসম্ভ্রমে দুই হাত বাড়িয়ে পীর সাহেব বললেন, ইনিও, ইনিও।

গড। বেশ তো, আমি আর ইনি দুজনেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কিন্তু আমি হচ্ছি সিনিয়ার, অতএব আমিই সভাপতি হব।

ব্রহ্মা। দাদা, কত দিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছ? জগৎ সৃষ্টি করেছ কবে?

গড। আমার পুত্র যিশু জন্মাবার প্রায় চার হাজার বৎসর আগে।

ব্রহ্মা। তার আগে কি করা হত?

গড। বাংলা বাইবেল পড়নি বুঝি? 'ঈশ্বরের আত্মা জলমধ্যে নিলীয়মান ছিল।'

ব্রহ্মা। অর্থাৎ ডুব মেরে ঘুমুচ্ছিলে। আমাদের নারায়ণ ডোবেন না, ভাসতে ভাসতে নিদ্রা যান। আল্লা তালা কি বলেন?

পীর। কোরান শরিফ পড়ে দেখবেন, তাতে সব কুছ লিখা আছে।

গড। ব্রহ্মা, তুমি না বিষ্ণুর নাইকুণ্ডু থেকে উঠেছিলে? তোমারও নাকি জন্মমৃত্যু আছে?

ব্রহ্মা। তাতে কি হয়েছে। আমার এক-একটি জীবনকালই যে বিপুল, একত্রিশের পিঠে তেরটা শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর। তুমি যখন জলমধ্যে নিলীয়মান ছিলে তখনও আমি দেদার সৃষ্টি করেছি।

নারদ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, প্রভুরা, আমি বলি কি কে বড় কে ছোট সে তর্ক এখন থাকুক। আপনার তিনজনেই সভাপতিত্ব করুন।

সেণ্ট পিটার বললেন, সেই ভাল। পীরসাহেব নীরবে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে মাথা নাড়তে লাগলেন।

নারদ বললেন, আপনাদের কষ্ট দিয়ে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য —জগতে যাতে শান্তি আসে, মারামারি কাটাকাটি দ্বেষ হিংসা অত্যাচার প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য যাতে দূর হয় তার একটা উপায় স্থির করা।

ব্রহ্মা। গড ভায়া, তুমিই একটা উপায় বাতলাও।

গড। উপায় তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। জগতের সমস্ত লোক যিশুর শরণাপন্ন হোক, তাঁর উপদেশ মেনে চলুক, দু-দিনে শান্তি আসবে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

ব্রহ্মা। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ লোকে যিশুর উপদেশ মানছে না। তবু তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার বজ্র ঝঞ্ঝা মহামারী অগ্নিবৃষ্টি এসব কি হল?

গড। সবই আছে, তেমন তেমন দেখলে অন্তিম অবস্থায় প্রয়োগ করব, এখন নয়। আমি মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছি, যাকে বলে ফ্রি উইল। মানুষ যদি জেনে শুনে উৎসন্নে যায় তো আমি নাচার।

ব্রহ্মা। তা হলে মানছ যে মানুষের কুবুদ্ধি দূর করবার শক্তি তোমার নেই। আল্লা তালার মত কি?

পীর। দুনিয়ার লোকে যদি ইসলাম মেনে নেয় তবে সব দুরুস্ত্ হয়ে যাবে।

নারদ। যারা মেনে নিয়েছে তাদেরও তো গতিক ভাল দেখছি না। আল্লা তাদের খৈরিয়ত করেন না কেন?

পীর। আগে সকলকে পাকিস্তানের সঙ্গে একদিল হতে হবে।

নারদ। তা তো হচ্ছে না। আল্লা জোর করে সকলকে একদিল করে দেন না কেন?

পীর। আল্লার মর্জি।

গড। শোন ব্রহ্মা।—আমি একজোড়া নিষ্পাপ মানুষ-মানুষী সৃষ্টি করে তাদের ইদং কাননে রেখেছিলুম। তারা পরম শান্তিতে ছিল, কিন্তু তোমাদের তা সইল না। তোমার এক বংশধর সেখানে কুমন্ত্রণা দিয়ে আদম আর হবাকে নষ্ট করলে।

ব্রহ্মা। সে তো শয়তান করেছিল, তোমারই এক বিদ্রোহী অনুচর।

গড। শয়তান অতি বজ্জাত, কিন্তু আদম-হবাকে সে নষ্ট করে নি, করেছিল বাসুকি, তোমারই এক প্রপৌত্র।

ব্রহ্মা। বাসুকি? সাপ হলেও সে অতি ভাল ছোকরা, কুমন্ত্রণা কখনই দেবে না। আচ্ছা, তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। নারদ, ডাক তো বাসুকিকে।

নারদ হাঁক দিলেন—বাসুকি, ওহে বাসুকি—

নিকটেই একটি দেবদারু গাছের ডালে ল্যাজ জড়িয়ে বাসুকি ঝুলেছিলেন। ডাক শুনে সড়াক করে নেমে এলেন। দণ্ডবৎ হয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, কি আজ্ঞা হয় পিতামহ?

ব্রহ্মা। হাঁ হে, তুমি নাকি ইদং কাননে গিয়ে হবা আর আদমকে নষ্ট করেছিলে?

বাসুকি তাঁর চেরা জিব কামড়ে বললেন, ছিছি, তা কখনও পারি? ভুল শুনেছেন প্রভু। যদি অভয় দেন তো প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করি।

ব্রহ্মা। অভয় দিলুম। তুমি ব্যাপারটা প্রকাশ করে বল।

বাসুকি বলতে লাগলেন।—সে কি আজকের কথা। সমুদ্রমন্থনের পর আমার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়েছিল। দুই অশ্বিনীকুমারকে জানালে তাঁরা বললেন, ও কিছু নয়, হাড় ভাঙে নি, শুধু মাংস একটু থেঁতলে গেছে; দিন কতক হাওয়া বদলে এস, সেরে যাবে। তখন আমি পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলুম। বেড়াতে বেড়াতে একদিন তৌরস পর্বতের পাদদেশে এসে দেখলুম উপরে একটি চমৎকার উপবন রয়েছে। ঢোঁড়া সাপের রূপ ধরে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে সড়সড় করে উপরে উঠলুম। দেখলুম দুটি নরনারী সেখানে বন্দী হয়ে আছে। তারা একেবারে অসভ্য, কিছুই জানে না, লজ্জাবোধও নেই। দেখে আমার দয়া হল। মেয়েটির কাছে গিয়ে মধুর স্বরে বললুম, অয়ি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? তোমার পরনে কাপড়

নেই কেন? চুল বাঁধনি কেন? নখ কাটনি কেন? গলায় হার পরনি কেন? ওই যে ষণ্ডা জংলী পুরুষটা ঘাস কাটছে, ওটা কে? তোমাদের চলে কি করে? খাও কি?

আমার সম্ভাষণে মেয়েটি খুশী হল। একটু হেসে বললে, আমি হচ্ছি হবা। ওর নাম আদম, আমার বর। আমি কারও কন্যা নই, আদমের পাঁজরা থেকে জিহোভা আমাকে তৈরি করেছেন। আমরা এখানে চাষবাস করি, ফলমূল খাই, মনের আনন্দে গান গাই আর নেচে বেড়াই।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি ফল খাও? আম কাঁঠাল কলা আছে?

হবা বললে, আখরোট আঙুর আনার আবজুস আঞ্জীর এইসব মেওয়া খাই। শুধু ওই গাছটার ফল খাওয়া বারণ। জিহোভা বলেছেন, খেলে সর্বনাশ হবে, আক্কেল খুলে যাবে, ভালমন্দ জ্ঞান হবে।

আমি ল্যাজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সেই জ্ঞানবৃক্ষের একটা ফল কামড়ে খেলুম। দন্তস্ফূট করা শক্ত, কিন্তু বেশ খেতে। খোসা নেই, বিচি নেই, ছিবড়ে নেই, যেন কড়া পাকের সন্দেশ। পিতামহ, আপনি সর্পজাতিকে আক্কেলদাঁত দেন নি, কিন্তু সেই ফলটি খাওয়া মাত্র আমার চারটি আক্কেলদাঁত ঠেলা দিয়ে বেরুল, বুদ্ধি টনটনে হল, কর্তব্য সম্বন্ধে মাথা খুলে গেল। হবাকে বললুম, ও বাছা, অ্যাদ্দিন করেছো কি, এমন ফল খাও নি?

—প্রভুর যে বারণ আছে।

—তুত্তোর বারণ। বুড়াদের কথা সব সময় শুনতে গেলে কিছুই খাওয়া হয় না। আমি বলছি, তুমি এক কামড় খেয়ে দেখ।

—যদি আক্কেল খুলে যায়?

—কোথাকার ন্যাকা মেয়ে তুমি? আক্কেল তো খোলাই দরকার, চিরকাল উজবুক হয়ে থাকতে চাও নাকি? নাও, এই তুটো ফল পেড়ে দিচ্ছি, একটা তুমি খাও, আর একটা ওই জংলী ভূত আদমকে খাওয়াও।

হবা নিজে বড় ফলটা খেয়ে ছোটটা আদমকে দিলে। তার পরেই জিব কেটে ছুটে পালাল। একটু পরে একটা ডুমুরপাতার ঝালর পরে ফিরে এসে বললে, এইবার কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?

—বাঃ, অতি চমৎকার, কোথায় লাগে উর্বশী রম্ভা মেনকা!

হবা ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ কুঁচকে বললে, আমার হার নেই, চুড়ি নেই, চিরুনি নেই, আলতা নেই, ঠোঁটে দেবার রং নেই—

বললুম, সব হবে, ওই আদমকে বল।

আরও ঠোঁট ফুলিয়ে হবা বললে, ও বিশ্রী, কিচ্ছু দেয় না, ওর কিচ্ছু নেই। তুমি দাও, আমি তোমার কাছে থাকব, হুঁ—

বললুম, আমি ওসব কোথায় পাব? ওর হাত পা আছে, আমার তাও নেই। সাপের সঙ্গে তুমি ঘর করবে কি করে? আমার আবার পঞ্চাশটা সাপিনী আছে, তোমাকে দেখেই ফোশ করে উঠবে। ভাবনা কি খুকী, তোমার বরের কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে আবদার কর তা হলেই ও রোজগার করতে যাবে, যা চাও সব এনে দেবে।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে বজ্রনাদ হতে লাগল। দেখলুম দূর থেকে তালগাছের মতন লম্বা এক ভয়ংকর পুরুষ কোঁতকা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছেন। বুঝলুম ইনিই জিহোভা। আমি হেলে সাপের রূপ ধরে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেলুম।

গড় বললেন, শুনলে তো, বাসুকি দোষ কবুল করছে।

ব্রহ্মা। দোষ কোথায়? তুমি দুটি প্রাণী সৃষ্টি করে তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখেছিলে, সামনে জ্ঞানবৃক্ষ রেখেও তার ফল খেতে বারণ করেছিলে। বাসুকি দয়া করে তাদের জ্ঞানদান করেছে।

গড। ছাই করেছে, আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করেছে। সেই আদি মানব-মানবীর আদিম অবাধ্যতার ফলেই জগতে পাপ আর দুঃখকষ্ট এসেছে।

সেণ্ট পিটার বললেন, শ্রীকৃষ্ণও তো অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ করতে বারণ করেছেন।

নারদ। ভুল বুঝেছ বাবাজী। তাঁর কথার অর্থ—বোকা লোকেদের বাজে তর্ক করতে শিখিও না। যারা চালাক তাদের তিনি বুদ্ধিযোগ চর্চা করতে বলেছেন।

সেণ্ট পিটার। কিন্তু হবা আর আদম তো বোকাই।

নারদ। আরে তারা যে আদিম মানব-মানবী, শিশুর সমান। যদি চিরকাল বোকা করে রাখাই উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল? ভেড়া গুরুর মতন আরও জানোয়ার তৈরি করে লাভ কি? আমাদের পিতামহের কীর্তি দেখ দিকি, প্রথমেই পয়দা করলেন দশ জন প্রজাপতি, মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশটি বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ।

জলদগম্ভীর স্বরে গড় বললেন, চোপ, গোল করো না। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে হবা আর আদম যে আদিম পাপ করেছিল তার ফলেই তাদের সন্ততি মানবজাতি অধঃপাতে যাচ্ছে। এখনও যদি সকলে যিশুর শরণ নেয় তো রক্ষা পাবে।

ব্রহ্মা। লোকে যখন যিশুর শরণ নিচ্ছে না তখন ফ্রি উইল বাতিল করে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দাও না কেন?

সেণ্ট পিটার। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোঝা মানুষের অসাধ্য।

নারদ। আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা তো মানুষ নন, তাঁকে অভিপ্রায় জানালে ক্ষতি কি? প্রভু গড না হয় প্রভু ব্রহ্মার কানে কানে বলুন।

পীর। আল্লার যদি মর্জি হয় তবে এক লহমায় বিলকুল শাইস্তা করে দিতে পারেন।

নারদ। তবে শাইস্তা করেন না কেন?

পীর। যদি মর্জি না হয় তবে শাইস্তা করেন না।

নারদ। বুঝেছি, সব প্রভুই লীলা খেলা খেলেন।

গড। চুপ কর তোমরা। ব্রহ্মা, তুমি কেবল উড়ো তর্ক করছ, যেন আমিই আসামী আর তুমি হাকিম। তোমার প্রজারাও তো কম বদমাশ নয়, তাদের শাসন কর না কেন? তাদেরও ফ্রি উইল আছে নাকি?

ব্রহ্মা। ফ্রি উইল থাকবে কেন। আমার প্রজারা অত্যন্ত বাধ্য, যেমন চালাচ্ছি তেমনি চলছে, আবার কর্মফলও ভোগ করছে।

গড। অর্থাৎ তুমিই তাদের দিয়ে কুকর্ম করাচ্ছ।

ব্রহ্মা। সুকর্ম কুকর্ম সবই করাচ্ছি।

গড। তোমার নীতিজ্ঞান নেই। আমি তোমার মতন পাপের প্রশ্রয় দিই না, এক দল পাপীকে মারবার জন্য আর এক দল পাপী উৎপন্ন করেছি, পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্য দু দলকেই বজ্র দিয়েছি।

পীর। ইয়া গজব, ইয়া গজব! হারামজাদোঁকে দুশমন হারামজাদে!

ব্রহ্মা। তুমি কি মনে কর এই মারামারির ফলে সুবুদ্ধি আসবে?

গড। বেশ ভাল রকম ঘা খেলে ফ্রি উইলই পন্থা বাতলে দেবে, বেগতিক দেখলে সকলেই যিশুর শরণ নেবে।

পীর। নহি জী, নহি জী।

গড। ব্রহ্মা, এইবার তোমার জেরা বন্ধ কর। তুমি নিজে কি করতে চাও তাই বল।

ব্রহ্মা। কিছুই করতে চাই না। বিশ্বের বিধান তৈরি করে আমি খালাস।

গড। কেন, তুমি দয়াময় নও?

ব্রহ্মা। আমি নই। হরিকে লোকে দয়াময় বলে বটে।

গড। তুমি সর্বশক্তিমান নও? তোমার সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য নেই?

ব্রহ্মা। যার শক্তি কম তারই উদ্দেশ্য থাকে। যে সর্বশক্তিমান তার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েই আছে, তার দয়া করবারই বা দরকার

হবে কেন? আসল কথা চুপি চুপি বলছি শোন। লোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে, কিন্তু মানুষও আমাদের সৃষ্টি করেছে। যে লোক নিজে নির্দয় সেও একজন দয়ালু ভগবান চায়। যে নিজের তুচ্ছ শক্তি কুকর্মে লাগায় সেও একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চায় যিনি তার সকল কামনা পূর্ণ করবেন। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় আমাদের দয়ালু আর সর্বশক্তিমান বানাতে চায়।

গড। ওসব নাস্তিকের বুলি ছেড়ে দাও। স্পষ্ট করে বল—মানুষ পাপ করলে তুমি রাগ কর? ভাল কাজ করলে তুমি খুশী হও?

ব্রহ্মা তাঁর চার মাথা সজোরে নাড়তে লাগলেন।

নারদ গুন গুন করে বললেন, নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ—প্রভু কারও পাপপুণ্য গ্রাহ্য করেন না।

গড। ব্রহ্মা, তুমি অতি কুচক্রী, মানুষ উৎসন্নে যেতে বসেছে, তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে? কিছুই করবে না?

ব্রহ্মা। তোমরাই বা কি করছ? ব্যস্ত হও কেন, অনন্ত কাল তো সামনে পড়ে আছে। মানুষ নানারকম সুকর্ম কুকর্ম করে ফলাফল পরীক্ষা করছে, কিসে তার সব চেয়ে বেশী লাভ হয় তাই খুঁজছে। যখন সে পরম স্বার্থসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করতে পারবে তখন মানবসমাজে শান্তি আসবে। যতদিন তা না পারবে ততদিন মারামারি কাটাকাটি চলবে।

গড। তবে তুমিও ফ্রি উইল মান?

ব্রহ্মা। খেপেছ!

নারদ তাঁর কচ্ছপী বীণায় ঝংকার তুলে বললেন, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন এবং ভেলকি লাগিয়ে তাদের চরকিতে চড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন।

সেণ্ট পিটার বললেন, আমাদের প্রভু প্রেমময়, পরম কারুণিক, সর্বশক্তিমান—

নারদ। কিন্তু শয়তানকে জব্দ করতে পারেন না।

পীর। আল্লা মেহেরবান, তাঁর মতলব খুঁজতে গেলে গুনাহ্ হয়। আল্লার রিয়াসতে কুছ ভি বুরা কাম হয় না।

ব্রহ্মা। শোন গড় ভাই—মানুষ নিজে যখন প্রেমময় আর কারুণিক হবে তখন আমরাও তাই হব। তার আগে কিছু করবার নেই।

সেণ্ট পিটার। বলেন কি! আপনারা যদি হাল ছেড়ে দেন তবে লোকে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাবে। তিন জনে যখন এখানে এসেছেন তখন কৃপা করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষে মিল হয়।

পীর। কভি নহি হো সকতা। আল্লার প্রজা হচ্ছে মিঠা শরবত, গডের প্রজা তেজী শরাব। এদের মিল হতে পারে, শরবত আর শরাব বেমালুম মিশে যায়। কিন্তু এই হজরত ব্রহ্মার প্রজা হচ্ছে বদবুদার অলকতরা।

সহসা আকাশ অন্ধকার হল, একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ প্রকাণ্ড ডানা নাড়ছে। ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু আসছেন নাকি? গরুড় পাখার শব্দ শুনছি।

নারদ বললেন, গরুড় নয়। দেখছেন না, বাদুড়ের মতন ডানা, কালো রং, মাথায় শিং, পায়ে খুর, ল্যাজও রয়েছে। শ্রীশয়তান আসছেন।

সেণ্ট পিটার চিৎকার করে বললেন, অ্যাভণ্ট, দূর হ! পীরসাহেব হাত নেড়ে বললেন, গুম্ শো, তফাত যাও! গড তাঁর আলখাল্লার পকেটে হাত দিয়ে বজ্র খুঁজতে লাগলেন।

ব্রহ্মা বললেন, আহা আসতেই দাও না, আমরা তো কচি খোকা নই যে জুজু দেখলে ভয় পাব।

শয়তান অবতীর্ণ হয়ে মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করে বললেন, প্রভুগণ, যদি অনুমতি দেন তো কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। গড মুখ গোঁজ করে রইলেন। সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেব চোখ বুজে কানে আঙুল দিলেন। ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, কি বলতে চাও বৎস?

শয়তান বললেন, পিতামহ, আপনারা তিন বিধাতা এখানে এসেছেন, এমন সুযোগ আর মিলবে না; সেজন্য আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি। জগতের সমস্ত ধনী মানী মাতব্বর লোকেরা আমাকে তাঁদের দূত করে পাঠিয়েছেন। তাঁরা চান কর্মের স্বাধীনতা, কিন্তু তার ফলে ইহলোকে বা পরলোকে তাঁদের কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। এর জন্য তাঁরা আপনাদের খুশী করতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রহ্মা। অর্থাৎ তাঁরা বেপরোয়া দুষ্কর্ম করতে চান। মূল্য কি দেবেন? চাল-কলার নৈবেদ্য? হোমাগ্নিতে সের দশেক ভেজিটেবল ঘি ঢালবেন?

শয়তান। না প্রভু, ওসব নিয়ে আপনাদের আর ভোলানো যাবে না তা তাঁরা বোঝেন। তাঁরা যা রোজগার করবেন তার একটা অংশ আপনাদের দেবেন।

ব্রহ্মা। নগদ টাকা আমরা নিতে পারি না।

শয়তান। নগদ টাকা নয়। আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ আতুরশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল রেড ক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুকে খিচুড়ী খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাঁদের বড় বড় চাকরি আর মোটর কার দেওয়া হবে। এইসবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেল-গণকে নিরাপদে রাখবেন।

ব্রহ্মা। কত খরচ করবেন?

শয়তান। ধরুন তাঁদের উপার্জনের শতকরা এক ভাগ।

ব্রহ্মা। তাতে হবে না বাপু।

শয়তান। আচ্ছা, ডু পারসেণ্ট।

ব্রহ্মা। আমাকে দালাল ঠাউরেছ নাকি?

শয়তান। পাঁচ পারসেণ্ট? দশ—পনের—বিশ? আচ্ছা, না হয় শতকরা পঁচিশ ভাগ আপনাদের প্রীত্যর্থে খয়রাত করা হবে। তাতেও রাজী নন? উঃ, আপনাদের খাঁই দেখছি দেশসেবকদের চাইতেও বেশী। ক বছর জেল খেটেছেন প্রভু? আচ্ছা, আপনি বলুন কত হলে খুশী হবেন।

ব্রহ্মা। শতকরা পুরোপুরি এক শ চাই।

নারদ। ওহে শয়তান, প্রভু বলছেন, কর্মের সমস্ত ফল সমর্পণ করতে হবে তবেই নিষ্কৃতি মিলবে।

শয়তান। তা হলে তো রোজগার করাই বৃথা। যদি সবই ছেড়ে দিতে হয় তবে চুরি ডাকাতি লুটপাট মারামারি করে লাভ কি?

ব্রহ্মা। এই কথা তোমার মক্কেলদের বুঝিয়ে দিও। কিছু হাতে রেখে চুক্তি করা যায় না। গড আর আল্লা তালা কি বলেন? কই, এরা সব গেলেন কোথা?

নারদ। সবাই অন্তর্হিত হয়েছেন।

শয়তান। তবে আমিও যাই পিতামহ। আপনি তো নিরাশ করলেন।

ব্রহ্মা। একটু থাম, শুধু হাতে ফিরে যেতে নেই। একটা বর দিচ্ছি।—বৎস শয়তান, পুরুত পাদরী মোল্লা, পুলিস সৈন্য বা মিলিত জাতিসংসদ, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, তোমার মক্কেলদের তুমি নির্বিঘ্নে নরকস্থ করতে পারবে। তারপর আমি আবার মানুষ সৃষ্টি করব। নারদ, এখন যাই চল, আমার হাঁসটাকে ডেকে আন।

নারদ। প্রভু, সে মানস সরোবরে চরতে গেছে, এত শীঘ্র সভা-ভঙ্গ হবে তো তা জানত না। আপনি আমার ঢেঁকিতেই চলুন।

১৩৫৭

ভীমগীতা

প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় কুরুপাণ্ডব বীরগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এসে স্নান ও জলযোগের পর বিশ্রাম করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, দু জন বামন সংবাহক তাঁর হাত পা টিপে দিচ্ছে। এমন সময় ভীমসেন এসে বললেন, বাসুদেব, ঘুমুলে নাকি?

কৃষ্ণ কুন্তীপুত্রদের মামাতো ভাই। তিনি অর্জুনের প্রায় সমবয়সী, সেজন্য যুধিষ্ঠির আর ভীমকে সম্মান করেন। ভীমকে দেখে বিছানা থেকে উঠে বললেন, আসতে আজ্ঞা হোক মধ্যম পাণ্ডব। আপনি বিশ্রাম করলেন না?

ভীম বললেন, আমার বিশ্রামের দরকার হয় না। চার ঘটি মাধ্বীক পান করেছি, তাতেই ক্লান্তি দূর হয়েছে, এখনই আবার যুদ্ধে লেগে যেতে পারি। কৃষ্ণ, তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করছি না তো?

কৃষ্ণ। না না, আপনি এই খট্বায় বসুন। সেবকের প্রতি কি আদেশ বলুন।

ভীম। তোমার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

কৃষ্ণ। চোক্কমল্ল তোক্কমল্ল, তোমরা এখন যেতে পার, আর আমার সেবার প্রয়োজন নেই। আর্য ভীমসেন, বলুন কি জানতে চান।

ভীম। হাঁ হে কেশব, আজ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের কি হয়েছিল? তুমি তাকে কিসব বলছিলে? আমি দূরে ছিলুম, শুনতে পাই নি, শুধু দেখেছি—অর্জুন তার ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে কাঁদছিল, হাত জোড় করছিল, পাগলের মতন ফ্যালফ্যাল করে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল

আবার বার বার নমস্কার করছিল। ব্যাপার কি? যদি গোপনীয় না হয় তবে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

কৃষ্ণ। বিশেষ কিছুই নয়। কুরুপাণ্ডব দু পক্ষেই গুরুজন বয়স্য ও স্নেহভাজন আত্মীয়গণ আছেন দেখে অর্জুন কৃপাবিষ্ট হয়েছিলেন। বলছিলেন, যুদ্ধ করবেন না।

ভীম। অর্জুনটা চিরকাল ওইরকম, মাঝে মাঝে তার ভাব উথলে ওঠে। কৃপাবিষ্ট হবার আর সময় পেলেন না! তা তুমি তাকে কি বললে?

কৃষ্ণ। বললুম, তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাতে লাভও আছে, যদি জয়ী হও তো পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে, যদি মর তো সোজা স্বর্গে যাবে।

ভীম। একবারে খাঁটী কথা। তাতে অর্জুনের আক্কেল হল?

কৃষ্ণ। সহজে হয় নি। তাকে অনেক রকমে বুঝিয়ে বললুম, তুমি নিষ্কাম হয়ে কর্তব্য কর্ম কর, ফলাফল ভেবো না। তার পর তাকে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতিও বোঝালুম। অর্জুনের মোহ দূর করতে আমাকে প্রায় দুটি ঘণ্টা বকতে হয়েছিল।

ভীম। দুর্যোধনের দল আমাদের উপর কিরকম অত্যাচার করেছিল অর্জুন তা ভুলে গেছে নাকি? তুমি সব মনে করিয়ে দিয়েছিলে তো?

কৃষ্ণ। মনে করিয়ে দেবার কথা আমার মনেই পড়ে নি।

ভীম। বল কি হে মধুসূদন! ছেলেবেলায় আমাকে বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল, জতুগৃহে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল, এসব কথা অর্জুনকে বল নি?

কৃষ্ণ। কই, না।

ভীম। আশ্চর্য, এর মধ্যেই তোমার ভীমরতি হল নাকি? পাশা খেলায় শকুনির জুয়াচুরি, দুঃশাসনের হাতে পাঞ্চালীর নিগ্রহ, এসবও মনে করিয়ে দাও নি! উঃ দুঃশাসনের নাম করলেই আমার

রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। আচ্ছা, আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু তুমি যখন ধর্মরাজের দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিলে তখন দুর্যোধন তোমাকে বন্দী করতে চেয়েছিল। তার পর সেদিন শকুনির ব্যাটা উলূক এসে দুর্যোধনের হয়ে তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে গেল, এও তুমি ভুলে গেছ নাকি?

কৃষ্ণ। কিছুই ভুলি নি। কিন্তু যুদ্ধের আগে এসব কথা অর্জুনকে বলবার প্রয়োজন দেখি না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন পাঁচটি মাত্র গ্রাম চেয়েছিলেন তখন তো কৌরবদের সমস্ত অপরাধ মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। দুর্যোধন আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নি, তাই আপনাদের মন্ত্রণাসভায় যুদ্ধ করা স্থির হয় এবং সেজন্যই আপনারা যুদ্ধ করছেন। কৌরবদের অপরাধ স্মরণ করা এখন নিরর্থক।

হাতে হাত ঘষে ভীম বললেন, কৃষ্ণ, তোমার শরীরে কি ক্রোধ বলে কিছুই নেই?

কৃষ্ণ। আছে বই কি। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন মানুষের সব দোষই আছে।

ভীম। ক্রোধকে দোষ বলতে চাও! তুমি তো একজন মস্ত পণ্ডিত—আমাদের ছটি রিপু আছে জান? তাতে আমাদের কত উপকার হয় ভেবে দেখেছ?

কৃষ্ণ। রিপু তো দমন করাই উচিত।

ভীম। দমনের মানে কি লোপ? রিপুর লোপ হলে মানুষ পাথর হয়ে যায়, যেমন আমাদের ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব হয়েছেন। মেয়েরা তাঁকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই স্নান করে।

কৃষ্ণ। প্রথম তিন রিপুর দমন এবং শেষ তিনটির লোপ করতে পারলেই মঙ্গল হয়।

ভীম। এইবারে তুমি কতকটা পথে এসেছ। মদ মোহ মাৎসর্য—এই তিনটে প্রবল হলে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়, একেবারে লোপ

পেলেও বোধ হয় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রথম তিনটি না থাকলে বংশরক্ষা হয় না, আত্মরক্ষা হয় না, ধনাগম হয় না।

কৃষ্ণ। সাধু সাধু! ভীমসেন, আপনি অনেক চিন্তা করেছেন দেখছি।

ভীম খুশী হয়ে বললেন, ওহে জনার্দন, তুমি হয়তো মনে কর যে মধ্যম পাণ্ডব শুধুই একজন গোঁয়ারগোবিন্দ দুর্ধর্ষ বীর, যুদ্ধ আর ভোজন ছাড়া কিছুই জানে না তা নয়, আমি দর্শনশাস্ত্রেরও একটু আধটু চর্চা করেছি। যদি চাও তো কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা শোনাতে পারি।

আগ্রহ দেখিয়ে কৃষ্ণ বললেন, অবশ্যই শুনব, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন।

ভীম। ছয় রিপুর মধ্যে প্রথম তিনটিই আবশ্যক, আবার সেই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি, কাম আর ক্রোধ, না হলেই নয়। কামতত্ত্ব তোমাকে বোঝান বাহুল্য মাত্র, লোকে বলে তোমার নাকি ষোল হাজার কারা সব আছেন—

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, লোকে বলে আপনি প্রত্যহ ষোল হাজার লাড্ডু ভোজন করেন। উড়ো কথায় কান দেবেন না। কামতত্ত্ব থাক, আপনি ক্রোধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ভীম। কোনও বিষয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী খেলে মেদবৃদ্ধি হয়, উদর স্ফীত হয়, যুদ্ধের শক্তি কমে যায়। কিন্তু উপযুক্ত আহার না হলে জীবনরক্ষাও হয় না। অত্যধিক ক্রোধও ভাল নয়, তাতে হাত পা কাঁপে, লক্ষ্যভ্রংশ হয়, যুদ্ধে নিপুণতার হানি হয়। কিন্তু ক্রোধ বর্জন করলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ত্যাগ করেও তো আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যায়।

ভীম। যেমন কাম ত্যাগ করে বংশরক্ষা করা যায়! কৃষ্ণ বাজে কথা বলো না।

কৃষ্ণ। অনেক যোগী তপস্বী আছেন যাঁদের ক্রোধ মোটেই নেই।

ভীম। তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁদের স্বজন নেই, আত্মরক্ষারও দরকার হয় না। সকলেই জানে তাঁরা শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ঘাঁটায় না, তাঁরাও নির্বিবাদে অক্রোধী অহিংস হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা তপস্বী নই, তাই দুর্যোধন শত্রুতা করতে সাহস করে। অন্যায়ের প্রতিকার এবং দুষ্টের দমনের জন্যই বিধাতা ক্রোধ সৃষ্টি করেছেন। একাদশ রুদ্র আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, দেহীর অপমান হলে তাঁরা রক্তে রৌদ্ররস সঞ্চার করেন, তার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, কোনও রকম বিচারের দরকার হয় না। বুঝতে পারলে ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি।

ভীম। যদি তৎক্ষণাৎ অপমানের শাস্তি দেওয়া কোনও কারণে অসম্ভব হয় তবে ক্রোধ মন্দীভূত হয়, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। এই কারণেই বীরগণ যুদ্ধের পূর্বে নিজের বিক্রম ঘোষণা করে এবং শত্রুকে কটুবাক্য বলে ক্রোধ ঝালিয়ে নেন। শত্রুও অশ্রাব্য ভাষায় পালটা গালাগালি দেয়, তা শুনে রৌদ্ররসের পুনঃসঞ্চার হয়, উত্তেজনা আসে, প্রহারশক্তি বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণ। কিন্তু জ্ঞানীদের উপদেশ—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে।

ভীম। গোবিন্দ, তুমি নিতান্তই হাসালে। কংসকে মেরেছিলে কেন ? জরাসন্ধকে মারবার জন্য আমাকে আর অর্জুনকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন ? রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলে কেন ? তোমার অক্রোধ কোথায় ছিল ? আজ রণক্ষেত্রে অর্জুনের অক্রোধ দেখেও তাকে যুদ্ধে উৎসাহ দিলে কেন ? কৃষ্ণ, তুমি নিজের মতিগতি বুঝতে পার না, পাত্রাপাত্রের ভেদও জান না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। বিপক্ষ যদি সজ্জন হয়, তার শত্রুতা যদি ভ্রান্ত ধারণার জন্য হয়, তবেই অক্রোধ আর অহিংসা চলতে পারে।

ভদ্র বিপক্ষ যদি দেখে যে অপর পক্ষ প্রতিহিংসার চেষ্টা করছে না, শুধু ধীরভাবে প্রতিবাদ করছে, তবে তার ক্রোধ শান্ত হয়ে আসে, সে ন্যায়-অন্যায় বিচারের সময় পায়, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। হয়তো মার্জনা চাইতে সে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু অপর পক্ষ যদি উদারতা দেখায় তবে সহজেই শত্রুতার অবসান হয়। বিরাট রাজা—আহা বেচারার দুই ছেলে আজ মারা গেল—কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরকে পাশা ছুড়ে মেরেছিলেন, রক্তপাত করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির রাগ দেখান নি। বিরাট ভদ্রলোক, সেজন্য যুধিষ্ঠিরের অক্রোধে ফল হল, ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। আর দুর্যোধনকে দেখ। তার সহস্র অপরাধ আমাদের ধর্মরাজ ক্ষমা করেছেন, দুরাত্মাকে সুযোধন বলে আদর করেছেন, কিন্তু তার ফল কিছুই হয়নি। কারণ, দুর্যোধন ভদ্র নয়, স্বভাবত দুর্বৃত্ত। তার ভাইরা, শকুনি মামা, আর উচ্ছিষ্টভোজী সূতপুত্র কর্ণও সমান নরাধম। ধর্মরাজের সহিষ্ণুতার ফলে এদের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। এই সব দেখেও কি তুমি বলবে যে অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করতে হবে?

কৃষ্ণ। ভীমসেন, আপনার যুক্তি যথার্থ। অক্রোধ দ্বারা সজ্জনকেই জয় করা যায়, কিন্তু দুর্জনকে জয় করবার জন্য ধর্মযুদ্ধ আবশ্যক। আপনারা সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্তি হয়েছেন। ধর্মযুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তি বর্জনীয়। যদি যুদ্ধই কর্তব্য হয় তবে রাগদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। এই কারণেই দুর্যোধনের অপরাধের কথা অর্জুনকে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করি নি।

ভীম। প্রকাণ্ড ভুল করেছ। সোজা উপায় ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথে গেছ, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছ, দু ঘণ্টা ধরে তত্ত্বকথা শুনিয়ে অতি কষ্টে অর্জুনকে যুদ্ধে নামাতে পেরেছ। যদি তাকে রাগিয়ে দিতে তবে তখনই কাজ হত, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কিছুই দরকার হত না। এই আমাকে দেখ,—বিধাতা শাস্ত্রজ্ঞান বেশী দেন নি, কিন্তু আমার জঠরে যেমন অগ্নিদেব আছেন তেমনি গ্রন্থিতে

গ্রন্থিতে রুদ্রগণ নিরন্তর বিরাজ করছেন। কেউ যদি আমাকে অপমান করে তবে একাদশ রুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার দেহে শত হস্তীর বল আসে, বাহু লৌহময় হয়, গদা তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রতি ধাবিত হয়, তত্ত্বকথা শোনবার দরকারই হয় না।

কৃষ্ণ। আপনার কথা সত্য। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়, আপনারা পাঁচ ভ্রাতা সকলই ক্রোধপ্রবণ নন। আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু ধর্মরাজ আর অর্জুনের উপর রুদ্রগণের প্রভাব অল্প, সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁদের তত্ত্বকথা শোনাতে হয়। আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া কি ভাল? পরিণাম না ভেবে প্রবল শত্রুকে আক্রমণ করলে অনেক সময় নিজের ও আত্মীয়বর্গের সর্বনাশ হয়।

ভীম। জন কয়েকের সর্বনাশ হলই বা। সাপের মাথায় পা দিলে সাপ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ছোবল মারে। তার পর হয়তো সে লাঠির আঘাতে মরে, কিন্তু তার জাতির খ্যাতি বেড়ে যায়। লোকে বলে, সর্পজাতি অতি ভয়ানক, সাবধান, ঘাঁটিও না। বাঘ যখন বাছুরকে ধরে তখন গরু প্রাণের মায়া করে না, ক্রোধের বশে শত্রুকে শৃঙ্গাঘাত করে। এজন্য সকলেই শৃঙ্গীকে সম্মান করে। যে লোক পরিণাম না ভেবে ক্রোধের বশে শত্রুকে আঘাত করে, সে হঠকারিতার ফলে নিজে মরতে পারে, তার আত্মীয়রাও মরতে পারে, কিন্তু তার স্বজাতির খ্যাতি ও প্রতাপ বেড়ে যায়। হৃষীকেশ, ক্রোধ বিধিদত্ত মনোবৃত্তি নামে রিপু হলেও মিত্র, তার নিন্দা করো না। ক্রোধের প্রভাবে আমি কি দারুণ কর্ম করব তা দেখতে পাবে। ধৃতরাষ্ট্রকে নির্বংশ করব, দুঃশাসনের রক্তপান করব, দুর্যোধনের ঊরু চূর্ণ করব। আমার কীর্তি হবে কি অকীর্তি হবে তা গ্রাহ্য করি না; কিন্তু লোকে চিরকাল বলবে, হাঁ, ভীম একটা পুরুষ ছিল বটে, অত্যাচার সইত না, দুরাত্মাদের শাস্তি দিতে জানত।

কৃষ্ণ। বৃকোদর, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে। আপনি

যা বললেন তাও তত্ত্বকথা। কিন্তু কোনও বিধানই সর্বত্র খাটে না। অত্যাচারিত হলে যে রাগ করে না, প্রতিকারও করে না, সে অক্রোধী জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপ করে ফেলে, সে হটকারী দুষ্কর্মা, কিন্তু তার পৌরুষ আছে। যে ক্রোধের বশে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হারায় না এবং অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভীম সহাস্যে বললেন, যদুনন্দন, আমি কাপুরুষ অমানুষ নই, ধর্মভীরু পুরুষশ্রেষ্ঠও নই, আমি মধ্যম পাণ্ডব, সকল বিষয়েই মধ্যম। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি, তুমি বিশ্রাম কর।

কৃষ্ণ নমস্কার করে বললেন, ভীমসেন, আপনি বীরাগ্রগণ্য পুরুষশার্দূল। আপনার জয় হোক।

কৃষ্ণের দুই পরিচারক চোক্কমল্ল আর তোক্কমল্ল আড়ি পেতে সব শুনছিল। ভীম চলে গেলে তোক্ক বললে, দাদা, কার কথা ঠিক, শ্রীকৃষ্ণের না শ্রীভীমের?

চোক্ক বললেন, ওসব বড় বড় লোকের বড় বড় কথা, তোর আমার মতন বেঁটেদের জন্য নয়। ক্রোধ অক্রোধ ধর্মযুদ্ধ, সবই আমাদের নাগালের বাইরে। দুর্বলের একমাত্র উপায় জোট বাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংগিকেও জব্দ করতে পারে।

সিদ্ধিনাথের প্রলাপ

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় পাশের বাড়িতে পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল। সিদ্ধিনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর একটি বেকারের আগমন হল।

গৃহস্বামী গোপাল মুখুজ্যে বললেন, সিধু, তুমি দিন দিন দুর্মুখ হচ্ছ। কত হোম যাগ আর মানত করে বুড়ো বয়সে মল্লিক মশায় একটি বংশধর লাভ করলেন। প্রতিবেশীর সৌভাগ্যে আমাদের সকলেরই খুশী হবার কথা, আর তুমি ধরে নিচ্ছ যে ছেলেটি বেকার হবে!

আবার একটি নিঃশ্বাস ফেলে সিদ্ধিনাথ বললেন, দেশবাসীর আধপেটা অন্নের আর এক জন ভাগীদার জুটল।

ঘরে চার জন আছেন। গোপালবাবু উকিল। বয়স চল্লিশ, বেশ পশার করেছেন। সিদ্ধিনাথ তাঁর সমবয়সী বাল্যবন্ধু, গোপালবাবুর বাড়ির পিছনেই তাঁর বাড়ি। পূর্বে সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করতেন বিদ্যার খ্যাতিও ছিল, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকুরি গেছে। এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছেন, কিন্তু মাথার গোলমাল সম্পূর্ণ দূর হয় নি। সামান্য পেনশনে এবং বাড়িতে দু-চারটি ছাত্র পড়িয়ে কোনও রকমে সংসার চালান। তৃতীয় লোকটি রমেশ ডাক্তার, বয়স ত্রিশ, কাছেই বাড়ি, সম্প্রতি গোপালবাবুর শালী অসিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রমেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ এই সান্ধ্য আড্ডায় আসে। আজও দুজনে এসেছে।

অসিতা সিদ্ধিনাথের কাছে পড়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধাও করে। সবিনয়ে বললে, সার, মল্লিক মশায়ের ছেলে বেকার হতে যাবে কেন?

পৈতৃক ব্যবসাতে ভাল রোজগারও তো করতে পারে। পরের অন্নেই বা ভাগ পাড়বে কেন, তার বাপের তো অভাব নেই।

সিদ্ধিনাথ বললেন, মল্লিকের ছেলে হাইকোর্টের জজ হতে পারে, জওহরলাল বা বিড়লা-ডালমিয়াও হতে পারে, বহু লোককে অন্নদানও করতে পারে। কিন্তু আমি শুধু তাকে উদ্দেশ করে বলি নি, যারা জন্মাচ্ছে তাদের অধিকাংশের যে দশা হবে তাই ভেবে বলেছি?

গোপালবাবু বললেন, দেখ সিধু, আমরা তোমার মতন পণ্ডিত নই, কিন্তু এটুকু জানি, দেশে যে খাদ্য জন্মায় তাতে সকলের কুলয় না, আর লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে, তার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। যিনি জীবের সৃষ্টিকর্তা তিনিই রক্ষাকর্তা এবং আহারদাতা।

সিদ্ধিনাথ। সৃষ্টিকর্তা সব সময় রক্ষা করেন না, আহারও দেন না। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে ওসব মোলায়েম কথা বলা চলত, যখন দেশ ভাগ হয় নি, লোকসংখ্যাও অনেক কম ছিল। তখন এক কবি সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বলে জন্মভূমির বন্দনা করেছিলেন, আর এক কবি গেয়েছিলেন—চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন। এখন দেশ বিদেশ থেকে অন্ন আমদানি করতে হচ্ছে।

গোপাল। সরকার ফসল বাড়াবার যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে এক বছরের মধ্যেই আমরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারব।

সিদ্ধিনাথ। হাঁ, যদি কর্তাদের উপদেশ অনুসারে চাল আটার বদলে টাপিওকা রাঙা আলু আর মহামূল্য ফল খেয়ে পেট ভরাতে পার। যদি ঘাস হজম করতে শেখ, আসল দুধের বদলে সয়া বীন বা চীনে বাদাম গোলা জলে তুষ্ট হও, যদি উপোসী বেরালের মতন মাছের অভাবে আরসোলা টিকটিকি খেতে পার তবে আরও চটপট স্বয়ম্ভর হতে পারবে।

গোপাল। শুনছি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দুগ্ধতরু আসছে, যা পয়স্বিনী গাভীর মতন দুগ্ধ ক্ষরণ করে।

সিদ্ধিনাথ। আরও কত কি শুনবে। রাশিয়া থেকে এক্সপার্ট আসবেন যিনি ব্যাং থেকে রুই কাতলা তৈরি করবেন। শোন গোপাল, কর্তারা যতই বলুন, লোক না কমালে খাদ্যাভাব যাবে না।

রমেশ ডাক্তার লাজুক লোক, পত্নীর ভূতপূর্ব শিক্ষককে একটু ভয়ও করে। আস্তে আস্তে বললে, আমার মতে জনসাধারণকে বার্থ কনট্রোল শেখাবার জন্য হাজার হাজার ক্লিনিক খোলা দরকার।

সিদ্ধিনাথ। তাতে ছাই হবে। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে কিছু ফল হতে পারে, কিন্তু আর সকলেই বেপরোয়া বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে। যত দুর্দশা বাড়বে ততই মা ষষ্ঠির দয়া হবে, কেল্টে ভুল্টু বুঁচী পেঁচীতে ঘর ভরে যাবে। বহুকাল পূর্বেই হার্বার্ট স্পেনসার আবিষ্কার করেছিলেন যে যারা ভাল খায় তাদের সন্তান অল্প হয়, যাদের অন্নাভাব তাদেরই বংশবৃদ্ধি বেশী।

গোপাল। তা তুমি কি করতে বল?

সিদ্ধিনাথ। প্রাচীন কালে গ্রীসে স্পার্টা প্রদেশের কি প্রথা ছিল জান? সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার বাপ তাকে একটা চাঙারিতে শুইয়ে পাহাড়ের ওপর রেখে আসত। পরদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাকে ঘরে আনা হত। এর ফলে খুব মজবুত শিশুরাই রক্ষা পেত, রোগা পটকারা বেঁচে থেকে সুস্থ বলিষ্ঠ প্রজার অন্নে ভাগ বসাত না। এদেশেরও সেইরকম একটা কিছু ব্যবস্থা দরকার।

গোপাল। কিরকম ব্যবস্থা চাও বলে ফেল।

সিদ্ধিনাথ। কোনও লোকের দুটোর বেশী সন্তান থাকবে না—

গোপাল। ব্রহ্মচর্য চালাতে চাও নাকি?

সিদ্ধিনাথ। পুলিস বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাশ করে বাড়তি ছেলে-মেয়ে কেড়ে নেবে, যেমন মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে বেওয়ারিস কুকুর ধরে নিয়ে যায়। তার পর লিথাল ভ্যানে—

গোপাল। মহাভারত! তোমার যদি ছেলেপিলে থাকত তবে এমন বীভৎস কথা মুখে আনতে পারতে না।

সিদ্ধিনাথ। রাষ্ট্রের মঙ্গলের কাছে সন্তানস্নেহ অতি তুচ্ছ। আমি যা বললুম তাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর উপায়। এর ফলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও কিছু করতে হবে। ডাক্তারদের দমন করা দরকার।

অসিতা। বেওয়ারিস কুকুরের মতন ঠেঙিয়ে মারবেন নাকি ?

সিদ্ধিনাথ। তোমার ভয় নেই। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজে খুব কম ভরতি করলেই চলবে।

অসিতা। ডাক্তারদের দ্বারা জগতের কত উপকার হয় জানেন ? বসন্তের টিকে, কলেরার স্যালাইন, তারপর ইনস্থুলিন পেনিসিলিন— আরও কত কি! প্রতি বৎসরে কত লোকের প্রাণরক্ষা হচ্ছে খবর রাখেন ?

সিদ্ধিনাথ। ও, তুমি তোমার বরের কাছে এইসব শিখেছ বুঝি ? প্রাণরক্ষা করে কৃতার্থ করেছেন! কতকগুলো ক্ষীণজীবী লোক, রোগের সঙ্গে লড়বার যাদের স্বাভাবিক শক্তি নেই, তাদের প্রাণরক্ষায় সমাজের লাভ কি ? বিস্তর টাকা খরচ করে ডিসপেপসিয়া ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার থ্রম্বোসিস আর প্রস্টেট রোগগ্রস্ত অকর্মণ্য লোকদের বাঁচিয়ে রাখলে দেশের কোন্ উপকার হয় ? যারা স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী কাজের লোক, যারা বীর বিদ্বান প্রজ্ঞাবান কবি কলাবিৎ, কেবল তাদেরই বাঁচবার অধিকার আছে। তাদের সেবা করতে সমর্থ স্ত্রীলোকেরও বাঁচা দরকার। তা ছাড়া আর সকলেই আগাছার মতন উৎপাটিতব্য।

গোপাল। ওহে রমেশ, এবারে সিধুবাবুর হাঁপানির টান হলে ওষুধ দিও না, বিছানা থেকে উৎপাটিত করে একটা রিকশায় তুলে কেওড়াতলায় ফেলে দিও।

সিদ্ধিনাথ। আমার কথা আলাদা, বেঁচে থাকলে জগতের লাভ। আমার মতন স্পষ্টবাদী জ্ঞানী উপদেষ্টা এদেশে আর নেই।

গোপালবাবুর গৃহিণী নমিতা দেবী একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়স বেশী না হলেও এঁর ধাতটি সেকেলে। অসিতা তার দিদিকে আধুনিকী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নমিতা এই সান্ধ্য আড্ডাটির জন্য খুশী নন, বিশেষত সিদ্ধিনাথকে তিনি ছুচক্ষে দেখতে পারেন না; বলেন, পাগল না হাতি, শুধু ভিটকিলিমি, কুকথার ধুকড়ি। গতকাল সেকরা নমিতার ফরমাশী নথ দিয়ে গিয়েছিল। তা দেখতে পেয়ে সিদ্ধিনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন। তারই শোধ তোলবার জন্য আজ নমিতা যুদ্ধের সাজে দর্শন দিলেন। নাকে নথ, কানে মাকড়ি, গলায় চিক, হাতে অনন্ত আর বালা, কোমরে গোট। কোথা থেকে একটা বাঁকমলও যোগাড় করে পায়ে পরেছেন।

সিদ্ধিনাথ বললেন, আসুন মিসেস মুখুজ্যে।

নমিতা। মিসেস আবার কি? আমি ফিরিঙ্গী হয়ে গেছি নাকি? বউদিদি বলতে মুখে বাধল কেন?

সিদ্ধিনাথ। আর বলা চলবে না, এত দিন ভুল ধারণার বশে বলেছি। আজ সকালে হিসাব করে দেখলুম গোপাল আমার চাইতে আট দিনের ছোট। যদি অনুমতি দেন তো এখন থেকে বউমা বলতে পারি।

নমিতা। বেশ, তাই না হয় বলবেন।

সিদ্ধিনাথ। বউমা, একটু সামনে দাঁড়াও তো।

নমিতা কোমরে হাত দিয়ে বীরাঙ্গনার মতন সগর্বে দাঁড়ালেন। সিদ্ধিনাথ এক মিনিট নিরীক্ষণ করে চোখ বুজলেন। নমিতা বললেন, চোখ ঝলসে গেল নাকি?

সিদ্ধিনাথ। উঁহু, আমি এখন ধ্যানস্থ। বিশ হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাপার মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তখন বন্য, গুহায় বাস করে, পাথর আর হাড়ের অস্ত্র দিয়ে শিকার করে। জনসংখ্যা খুব কম, গৃহিণী সহজে জোটে না, জবরদস্তি করে ধরে

আনতে হয়। দেখছি—একটা ষণ্ডা লেংটা পুরুষ, আমাদের গোপালের সঙ্গে একটু আদল আছে, কিন্তু মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথায় জটা পড়া চুল, হাতে একটা হাড়ের ডাণ্ডা। সে বউ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর ধারে একটা মেয়ে গুগলি কুড়চ্ছে, এই বউমার সঙ্গে একটু মিল আছে। পুরুষটা কোনও প্রেমের কথা বললে না, উপহার দিলে না, খোশামোদও করলে না, এসেই ধাঁই করে এক ঘা লাগালে। মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়ল, কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তার পর তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটা নিজের আস্তানায় এল এবং নাকে বেতের আংটা পরিয়ে তাতে দড়ি লাগিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে, যেমন বলদকে বাঁধা হয়। তবু মেয়েটা পালাবার চেষ্টা করছে দেখে তার পায়ের পাতা চিরে রক্তপাত করলে, দু কান ফুঁড়ে কড়া পরিয়ে দিলে, গলায় হাতে কোমরে আর পায়ে চামড়ার বেড়ি লাগিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললে। এইরকম আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের পর ক্রমে ক্রমে মেয়েটা পোষ মানল, স্বামীর ওপর ভালবাসাও হল। অল্প কালের মধ্যে সকল মেয়েরই ধারণা হল যে নির্যাতনের চিহ্নই হচ্ছে অলংকার আর সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ। তার পর হাজার হাজার বৎসর কেটে গেল, ঘরে বউ আনা সহজ হল, সোনা রুপোর গহনার চলন হল, কিন্তু প্রসাধনের রীতি আর গহনার ছাঁদে আদিম বর্বরতার ছাপ রয়ে গেল। সেকালে যা কপালের রক্ত ছিল তা হল সিঁদুর, পায়ের রক্ত হল আলতা। পূর্বে যা বউ বাঁধবার আংটা কড়া আর বেড়ি ছিল, পরে তা নথ মাকড়ি হার বালা গোট আর মলে পরিবর্তিত হল। সংস্কৃতে 'নাথ'-এর একটি অর্থ বলদের নাকের দড়ি। তা থেকেই নথ আর নথি শব্দ হয়েছে। আজকালকার যা শৌখিন গহনা তাতেও বর্বর যুগের ছাপ আছে। বউমা, জন্মান্তরের ইতিহাস শুনে চটে গেলে নাকি? তোমার বাপ মা নিশ্চয় সব জানতেন, তাই সার্থক নাম রেখেছেন নমিতা, অর্থাৎ যাকে নোয়ানো হয়েছে।

নমিতা বললেন, আপনার বাপ মাও সার্থক নাম রেখেছিলেন। সিদ্ধিনাথের বদলে গাঁজানাথ হলে আরও ঠিক হত। এখানে যা সব বললেন বাড়ি গিয়ে গিন্নীর কাছে বলুন না, মজা টের পাবেন। এই বলে নমিতা চলে গেলেন।

গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, বক্তৃতার চোটে আমার গিন্নিকে তো ঘর থেকে তাড়ালে, এইবার শালীটিকে একটা লেকচার দাও, ছাত্রী বলে দয়া করো না।

সিদ্ধিনাথ অসিতার দিকে চেয়ে বললেন, হাত দুটো অমন করে ঘোরাচ্ছ কেন?

অসিতা। ঘোরাচ্ছি আবার কোথা। দেখছেন না, একটা মফলার বুনছি। আপনারই জন্য।

সিদ্ধিনাথ। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। হাত সুড়সুড় করছে বলেই বুনছ, আমাকে দেবে সে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। লেস-পশম বোনা, চরকা কাটা, মালা জপা, বাঁয়া তবলায় চাঁটি লাগানো, গল্প কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, ইও ইও ঘোরানো—এসবের কারণ একই। দরকারী জিনিস তৈরি করছি, দেশের মঙ্গল করছি, ভগবানের নাম নিচ্ছি, কলা চর্চা করছি, সাহিত্য রচনা করছি—এসব ছুতো মাত্র, আসল কারণ হাত সুড়সুড় করছে। এই সমস্ত কাজের মধ্যে ইও ইও ঘোরানোই নির্দোষ। কোনও ছল নেই, শুধুই খেলা।

পাশের ঘর থেকে নমিতা বললেন, মফলারটা খবরদার ওঁকে দিস নি অসিতা, বিশ্বনিন্দুক নিমকহারাম লোক।

সিদ্ধিনাথ। আমার চেয়ে যোগ্য পাত্র পাবে কোথা। আমার যদি ঠাণ্ডা না লাগে, হাঁপানি যদি না বাড়ে, তবে সকল লোকেরই লাভ। অসিতাও এই ভেবে কৃতার্থ হবে যে একজন অসাধারণ গুণী লোকের জন্যই সে মফলার বুনেছে।

গোপাল। ওসব বাজে কথা রাখ। নমিতাকে দেখে তো পুরাকালের ইতিহাস আবিষ্কার করে ফেললে। এখন অসিতাকে দেখে কি মনে হয় বল।

সিদ্ধিনাথ নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, হাজার হাজার বৎসরেও মেয়েরা সাজতে শিখল না, কেবল ফ্যাশনের অন্ধ নকল। ঠোঁটে রং দেওয়ার ফ্যাশনটাই ধর। যারা চম্পকগৌরী অল্পবয়সী তাদেরই বিম্বাধর মানায়। সাদা বা কালোকে বা বুড়ীকে মানায় না। আজ বিকেলে চৌরঙ্গী রোডে দুটি অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি। একজন বুড়ী মেম, চুল পেকে শণের নুড়ি হয়ে গেছে, গাল তুবড়ে চামড়া কুঁচকে গেছে, তবু ঠোঁটে রগরগে লাল রং লাগিয়েছে। দেখাচ্ছে যেন তাড়কা রাক্ষসী, সদ্য ঋষি খেয়েছে। আর একজন বাঙালী যুবতী, বেশ মোটা, অসিতার চাইতেও কালো, সেও ঠোঁটে লাল রং দিয়েছে।

অসিতা। কেমন দেখাচ্ছে?

সিদ্ধিনাথ। যেন ভাল্লুকে রাঙা আলু খাচ্ছে।

অসিতা। সার, আমি কখনও ঠোঁটে রং লাগাই না।

সিদ্ধিনাথ। তোমার বুদ্ধি আছে, আমার ছাত্রী তো। কালো মেয়ের যদি অধরচর্চা করবার শখ হয় তবে ঠোঁটে সোনালী তবক এঁটে দিলেই পারে, দামী পানের খিলির ওপর যা থাকে।

অসিতা। কী ভয়ানক!

সিদ্ধিনাথ। ভয়ানক কেন মা? কালীর যদি সোনার চোখ আর সোনার জিভ মানায় তবে কালো মেয়ের সোনালী ঠোঁট নিশ্চয় মানাবে। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অসিতা। কি যে বলেন আপনি!

সিদ্ধিনাথ। অর্থাৎ নতুন ফ্যাশন চালাবার সাহস তোমার নেই। কিন্তু সিনেমার অমুকা দেবী বা অমুক মন্ত্রীর কন্যা যদি ঠোঁটে সোনালী তবক আঁটে তবে তোমরাও আঁটবে। আচ্ছা, ডাক্তার বাবাজী, তুমি এই কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলে কেন?

রমেশ তার লজ্জা দমন করে বললে, কালো তো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

সিদ্ধিনাথ। ডাক্তার, তুমি চশমা বদলাও। তোমার বউ মোটেই উজ্জ্বল নয়, দস্তুর মতন কালো। কালোকেই লোক আদর করে শ্যামবর্ণ বলে। তবে হাঁ, তেল মেখে চুকচুকে হলে উজ্জ্বল বলা যেতে পারে।

অসিতা। জানেন, একটি খুব ফরসা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাকে ছেড়ে আমাকেই পছন্দ করলেন।

সিদ্ধিনাথ। শুনে খুশী হলুম, ডাক্তারের আর্টিষ্টিক বুদ্ধি আছে। গৌর বর্ণের ওপর লোকের ঝোঁক একটা মস্ত কুসংস্কার, স্নবারিও বটে। লোকে কি শুধু সাদা কুকুর সাদা গরু সাদা ঘোড়া পোষে? মারবেলের মূর্তির চাইতে কষ্টি পাথর আর ব্রঞ্জের মূর্তির আদর বেশী কেন? প্রাচ্যদেশবাসী খুব ফরসা হলে কুশ্রী দেখায়, গায়ের রং আর কালো চুলের কনট্রাস্ট দৃষ্টিকটু হয়। তার চাইতে কুচকুচে কালো বরং ভাল, যদিও চোখ আর দাঁত বেশী প্রকট হয়। আমাদের অসিতা হচ্ছে কপিলা গাইএর মতন সুন্দরী। গায়ে আরসোলা বসলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডেয়ে পিঁপড়ে বসলে বোঝা যায়।

গোপাল। অসিতার ভাগ্য ভাল, অল্পেই রেহাই পেয়েছে, আবার সুন্দরী সার্টিফিকেটও আদায় করেছে।

দূর থেকে একটা কাঁসির খ্যানখেনে আওয়াজ এল। সিদ্ধিনাথ চমকে উঠলেন। নমিতা ঘরে এসে বললেন, শুনতে পাচ্ছেন না? যান যান দৌড়ে যান, নইলে গিন্নী আপনার দফা সারবে।

সিদ্ধিনাথের পত্নী রান্না হয়ে গেলেই স্বামীকে ডাকবার জন্য একটা ভাঙ্গা কাঁসি বাজান। সিদ্ধিনাথ তাঁর মুখরা গৃহিণীকে ভয় করেন। বিনা বাক্যব্যয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে চললেন।

১৩৫৭

চিরঞ্জীব

পুজোর ছুটিতে দুই বন্ধু হরিহর বসু আর তারক গুপ্ত পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছেন। দিল্লি মেল ছাড়বার দেড় ঘণ্টা আগে তাঁরা হাওড়া স্টেশনে এলেন এবং প্লাটফর্মে গাড়ি লাগতেই একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়লেন। তাঁদের সীট আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল।

হরিহরবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানা পেতে গট হয়ে বসে পড়লেন, দেখ তারক, যে কদিন কলকাতার বাইরে থাকব সে কদিন বাঙালীর সঙ্গে মোটেই মিশব না। মেশবার দরকারও হবে না, কারণ দিল্লিতে আমরা লালা গজাননজীর বাড়িতে উঠছি। আগরাতে তাঁর গদি আছে, সেখানেও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। অতি ভাল লোক গজাননজী।

তারকবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, লোক তো ভাল, কিন্তু তাঁর বাড়িতে নিরামিষ খেতে হবে।

হরিহরবাবু বললেন, ওই তো বাঙালীর মহা দোষ, মাছের জন্যে বেরালের মতন ছোঁকছোঁক করে। তুমি আবার বাঙাল, আরও লোভী।

—আচ্ছা বাপু, পনর দিন না হয় বিধবার মতন থাকা যাবে। কিন্তু তুমিও তো প্রচণ্ড গোস্তখোর।

—ক্রমশ মাছ মাংস ত্যাগ করছি। নিখিল ভারতের ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সাজাত্য হওয়া দরকার।

—সাজাত্য আপনিই হচ্ছে, লালাজী শেঠজী চোবেজী সবাই মুরগি খেতে শিখছেন। মহামতি গোখলে ঠিকই বলে গেছেন—what

Bengal thinks today India thinks tomorrow। বাঙালীর আর কষ্ট করে সাত্ত্বিক হবার দরকার নেই।

—খুব দরকার আছে। উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র অন্ধ্র তামিলনাড প্রভৃতি রাজ্যের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের সর্বাঙ্গীণ মিলন হওয়া দরকার। খাদ্য পরিচ্ছদ আর ভাষা বদলাতে হবে, নইলে মচ্ছি-চাওর-খোর বংগালী অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ঠিক বলেছেন—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের পূর্বমর্যাদা স্মরণ করে পূর্বসম্বন্ধ পুনস্থাপন করতে হবে।

—পূর্বসম্বন্ধটা কিরকম? আমরা সবাই আর্য-খোট্টা এই সম্বন্ধ?

—তার চাইতে নিকটতর। আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ বাংলা দেশে এসেছিলেন, তাঁদের নেতার নাম দশরথ বসু। তিনি আমার ছাব্বিশতম পূর্বপুরুষ। আসলে আমি বাঙালী নই, কনৌজ লালা কায়েত। তুমি বাঙালী নও।

—বল কি হে!

—তুমি হচ্ছ কর্ণ টী ব্রহ্মক্ষত্রিয়, বল্লালসেনের স্বজাতি। ইতিহাস পড়ে দেখো।

—আমি তো জানতুম আমি চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের জ্ঞাতি। তোমাদের কথা শুনেছি বটে, আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ আচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তাঁদের তল্পিদার হয়ে পাঁচ জন কায়স্থ এসেছিল।

—ভুল শুনেছ। আদিশূর রাজ্যশাসনের জন্য পাঁচ জন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রকায়স্থ আনিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি পাচক ব্রাহ্মণ এসেছিল।

হরিহরবাবু তাঁর ঘড়িতে দেখলেন গাড়ি ছাড়তে আর পনর মিনিট দেরি আছে। তাঁর ব্যাগ খুলে দুটি খদ্দরের টুপি বার করলেন। একটি নিজে পরলেন, আর একটি তারকবাবুকে দিয়ে বললেন, নাও, মাথায় দাও।

তারকবাবু বললেন, টুপি পরব কেন, শুধু মাথা গরম করা। এই তো তুমি বললে যে আমি কর্ণাটী, অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। আমরা টুপি পরি না, তার সাক্ষী রাজাজী। বরঞ্চ কাছার একটা খুঁট খুলে রাখছি।

গাড়িতে হুড়মুড় করে লোক উঠতে লাগল। হরিহরবাবুদের কামরা ভরে গেল, বাঙালী বিহারী উত্তর প্রদেশী মারোয়াড়ী গুজরাটী প্রভৃতি নানা জাতের লোক উঠে বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল। একটি বাঙালী যুবক একজন স্থবিরের হাত ধরে তাঁকে এক কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে, হালদার মশায়, আপনাকে এখন একটু কষ্ট সইতে হবে। ঘণ্টা তিন চার পরেই লোক কমে যাবে, তখন আপনার বিছানা পেতে দেব।

বৃদ্ধ হালদার মশায় বললেন, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না শরৎ। বয়স হলেও তোমাদের চাইতে শক্ত আছি। দাঁত নেই, কিন্তু এখনও একটি আস্ত ইলিশ মাছ হজম করতে পারি।

তারকবাবু বললেন, বাঃ আপনি মহাপুরুষ। বড্ড ভিড় নইলে আপনার পায়ের ধুলো নিতুম হালদার মশায়।

হালদার খুশী হয়ে বললেন, তবে বলি শোন। মুঙ্গের জেলায় খরকপুরে থাকতে দু বেলায় একটি আস্ত পাঁঠা সাবাড় করতুম। চার আনায় একটি নধর বকড়ি, আবার তার চামড়া বেচলে পুরোপুরি চার আনাই ফিরে আসত। একবার একটি সিকি খরচ করলে ক্রমান্বয়ে পাঁঠার পর পাঁঠা মুফতে পাওয়া যেত। ভারী লোভ হচ্ছে, নয়? ষাট বৎসর আগেকার কথা। এখন আর সেদিন নেই রে দাদা।

গার্ডের বাঁশি ফুর্‌র করে বেজে উঠল। একজন প্রকাণ্ড পুরুষ দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন। হরিহরবাবু বললেন, আর জায়গা নেহি হ্যায়, দুসরা কামরায় যাইয়ে।

গাড়ি চলতে লাগল। আগন্তুকের বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু, কালবৈশাখীর মেঘের মতন গায়ের রং, বাবরি চুল, গাল পর্যন্ত জুলফি, মোটা গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁট। পরনে মিহি ধুতি, কাছার এক কোণ ঝুলছে। গায়ে লম্বা রেশমি কোট, তার উপর ভাঁজ করা আজানুলম্বিত জরিপাড় উড়ুনি। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, দুই কানে হীরার ফুল, আঙুলে অনেকগুলি নীলা চুনি পান্নার আংটি, পায়ে পনর নম্বর চপ্পল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হেসে আগন্তুক পরিষ্কার বাংলায় হরিহরবাবুকে বললেন, ঘাবড়াবেন না মশায়, আমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকব। পান খেয়ে পিক ফেলব না, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ব না, আশ্চর্য মাজন বেচব না। বন্যা ভূমিকম্পের চাঁদা চাইব না, সর্বহারার গানও গাইব না। যদি পরে ভিড় কমে তবে একটু বসবার জায়গা করে নেব। যদি অনুমতি দেন তবে আলাপ করে আপনাদের খুশী করবার চেষ্টা করব।

শরৎ নামক ছেলেটি বললে, কতক্ষণ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনি আমার পাশে বসুন। আগন্তুক কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার করে বসে পড়লেন।

হালদার মশায় বললেন, মহাশয়ের নামটি কি? নিবাস কোথায়? কি করা হয়? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

আগন্তুক উত্তর দিলেন, আমার নাম লংকুস্বামী কর্বুরঙ্গ রেড্ডি। আদি নিবাস ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। কিছু করি না, মহাদেব আর রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই। এখন আসানসোলে শ্বশুরের কাছে যাচ্ছি, কাল অযোধ্যাপুরী রওনা হব, নবরাত্রি উৎসব দেখতে।

হরিহরবাবু বললেন, আপনি রেড্ডি? ক্ষত্রিয়?

—ব্রাহ্মণও বটি ক্ষত্রিয়ও বটি।

—ও, আপনি ব্রহ্মক্ষত্রিয়, আমাদের এই তারক গুপ্তর সজাতি?

—তা বলতে পারি না।

হরিহরবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, তবেই তো সমস্যায় ফেললেন মশায়। আপনি শর্মা, না বর্মা, না দাশ তালব্য-শ, না দাস দন্ত্য-স?

আমি শর্মা-বর্মা-দাষ, দ-এ আকার মূর্ধন্য ষ। আমি জাতিতে মূর্ধাভিষিক্ত। পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা রক্ষঃক্ষত্রিয়া রাজকন্যা। রেড্ডি আমার আসল উপাধি নয়, শুনতে মিষ্ট বলে নামের শেষে যোগ করি।

হালদার মশায় বললেন, আহা, কেন ভদ্রলোককে জেরা করে বিব্রত কর, দেখতেই তো পাচ্ছ ইনি মাদ্রাজী। আরও পরিচয়ের দরকার কি। আপনি তো খাসা বাংলা বলেন মশায়। শিখলেন কোথায়?

লংকুস্বামী হেসে বললেন, আমার বর্তমানা পত্নী আট বৎসর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁর কাছেই বাংলা শিখেছি।

হরিহরবাবু বললেন, বর্তমানা পত্নী?

—আজ্ঞে হাঁ। পত্নীদেরও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান আছে।

হালদার মশায় বললেন, এই সোজা কথাটা বুঝলে না? ইনি অনেক বার সংসার করেছেন। এই আমার মতন আর কি। চার বার বিবাহ করেছি, কলাগাছ নিয়ে পাঁচ। কিন্তু এখন গৃহ শূন্য। আবার বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শেষ পক্ষের সম্বন্ধী এই শরৎ শালার জন্যে তা হচ্ছে না, কেবলই ভাংচি দেয়।

লংকুস্বামী বললেন, মহাশয়ের বয়স কত হয়েছে?

—চার কুড়ি পুরতে এখনও ঢের বাকী।

শরৎ বলে উঠল, মিথ্যে বলবেন না হালদার মশায়, সেই কবে আশি পেরিয়েছেন!

—তুই চুপ কর ছোঁড়া। বুঝলেন লংকুবাবু, বয়স যতই হোক খুব শক্ত আছি। এখনও একটি আস্ত ইলিশ হজম করতে পারি।

লংকুস্বামী বললেন, তবে আর ভাবনা কি। আপনি তো বালক বললেই হয়, এক শ বার বিবাহ করতে পারেন।

—হেঁ হেঁ। বালক নই, তবে জোয়ান বলতে পারেন। মহাশয় ক বার সংসার করেছেন?

লংকুস্বামী পকেট থেকে একটি নোটবুক বার করে দেখে বললেন, এখন উনবিংশত্যধিক-শততম সংসার চলছে।

—তার মানে?

অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এক শ উনিশ বার বিবাহ করেছি।

হালদার মশায় চোখ কপালে তুলে বললেন, প্রত্যেক বারে দশ বিশ গণ্ডা বিবাহ করেছিলেন নাকি?

—না না, বহুবিবাহে আমার ঘোর আপত্তি, যদিও আমার বড়-দা আর মেজ-দার অনেক পত্নী ছিলেন। আমি চিরকালই একনিষ্ঠ, এক-একটি পত্নী গত হলে আবার একটির পাণিগ্রহণ করেছি।

একজন গুজরাটি যাত্রী সশব্দে হেসে বললেন, বুঝছেন না হালদার মোসা, ইনি আপনাকে বিয়া পাগলা বুঢ়া ঠহরেছেন, তাই আপনার পয়ের খিঁচছেন, যাকে বলে লেগ পুলিং।

লংকুস্বামী তাঁর বৃহৎ জিহ্বা দংশন করে বললেন, রাম রাম, আমি ঠাট্টা করছি না, সত্য কথাই বলছি।

গাড়ি বর্ধমানে পৌঁছল, অনেক যাত্রী নেমে গেল। লংকুস্বামী বললেন, এখন একটু জায়গা হয়েছে, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয় তবে আমার স্ত্রীকে মহিলা-কামরা থেকে নিয়ে আসি। সেখানে বড় ভিড়, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ঘণ্টা দুই পরেই আমরা আসানসোলে নেমে যাব।

শরৎ বললে, কোনও অসুবিধা হবে না, আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন।

লংকুস্বামী তাঁর পত্নীকে নিয়ে এলেন। বয়স আন্দাজ পঁচিশ, সুশ্রী তন্বী শ্যামা, কাছা দিয়ে শাড়ি পরা, মাথা খোলা, দুই কানে

আর নাকের দুই পাশে হীরে ঝক্‌মক্‌ করছে। লংকুস্বামী পরিচয় দিলেন, এই ইনিই আমার এক শ উনিশ নম্বরের স্ত্রী, এঁর নাম সুরাম্মা বাই। সুরাম্মা স্মিতমুখে সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

হালদার মশায় চুলবুল করছেন আর তাঁর ঠোঁট বার বার নড়ছে দেখে লংকুস্বামী বললেন, আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান কি? স্বচ্ছন্দে বলুন, আমার স্ত্রীর জন্য কোনও দ্বিধা করবেন না।

হালদার মশায় বললেন, এক শ উনিশ বার বিবাহ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার বয়স কত হবে লংকুবাবু?

—আপনি আন্দাজ করুন না।

—আমার চাইতে কম। এই পঞ্চাশের মধ্যে আর কি।

—হল না, আরও উঠুন।

—ষাট?

—আরও, আরও!

—সত্তর? আশি?

তারকবাবু হেসে বললেন, আপনার কাজ নয় হালদার মশায়। নিলামের দর চড়ানো আমার অভ্যাস আছে। লংকুস্বামীজী আপনার বয়স এক শ।

—হল না, আরও উঠুন।

—পাঁচ শ? হাজার? দু হাজার?

—আরও, আরও।

—চার হাজার? পাঁচ হাজার?

লংকুস্বামী বললেন, এইবার কাছাকাছি এসেছেন। সুরাম্মা, তুমি তো সেদিন হিসেব করেছিলে তোমার চাইতে আমি ক বছরের বড়। তুমিই বাবুমশায়দের শুনিয়ে দাও আমার বয়স কত।

সুরাম্মা সহাস্যে মৃদুস্বরে বললেন, পাঁচ হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্ন।

হালদার মশায় হাঁ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। হরিহরবাবু হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন, স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি? অন্য

যাত্রীরা নির্বাক হয়ে রইল, কেউ কেউ বোকার মতন হাসতে লাগল।

তারকবাবু বললেন, ক বছর অন্তর বিবাহ করেছিলেন মশায় ?

লংকুস্বামী আবার তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, গড়ে ছেচল্লিশ বৎসর অন্তর। আমার স্ত্রীদের আয়ু তো আমার মতন ছিল না, সকলেই যথাকালে গত হয়েছিলেন। অষ্টম হেনরির মতন আমি স্ত্রীবধ করি নি, স্ত্রীত্যাগও করি নি। আমার সকল স্ত্রীই সতীলক্ষ্মী।

হালদার মশায় ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলেন, সন্তানাদি কতগুলি ?

—স্বরাম্মার এখনও কিছু হয়নি। আমার পূর্ব পূর্ব পক্ষের সন্তানদের হিসাব রাখি নি, রাখা সাধ্যও নয়। বিস্তর জন্মেছিল, বিস্তার মরে গেছে, তবু জীবিত বংশধরদের সংখ্যা এখন কয়েক লাখ হবে।

তারকবাবু বললেন, যত রেড্ডি পিল্লে মেনন নাইডু নায়ার চেট্টি আয়ার আয়েঙ্গার সবাই আপনার বংশধর নাকি ?

—শুধু ওরা কেন। চাটুজ্যে বাঁড়ুজে ঘোষ বোস সেন আছে, সিং কাপুর চোপরা মেটা দেশাই আছে, শেখ সৈয়দ আছে, হোর লাভাল কুইসলিং আছে, চ্যাং কিমাগুসা ভডকুইস্কি প্রভৃতিও আছে। সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরে মানুষের জাতিগত পরিবর্তন অনেক হয়।

—আপনি তা হ'লে মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পা যুগের লোক।

—তা বলতে পারেন। ওইসব দেশবাসীর সঙ্গে আমার পূর্ব-পুরুষদের কুটুম্বিতা ছিল। আমার বৃদ্ধপ্রমাতামহীর নাম সালকটংকটা, তিনি হারাপ্পার রাজবংশের কন্যা ছিলেন।

হরিহরবাবু এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, উঃ, দীর্ঘ জীবনে আপনার বিস্তর স্বজনবিয়োগ হয়েছে, কতই না শোক পেয়েছেন !

—শোক পাব কেন। কৃষকের আয়ু ধানগাছের চাইতে বেশী। ধানগাছ শস্য দিয়ে মরে যায়, তার জন্য কৃষক কিছুমাত্র শোক করে না, আবার বীজ ছড়ায়।

হরিহর বললেন, ওঃ, সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আপনার চোখের সামনে ঘটে গেছে!

—হাঁ। পলাসীর যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয়, হর্ষবর্ধনের দিগ্‌বিজয়, আলেকজাণ্ডারের আগমন, বুদ্ধদেবের জন্ম, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, সবই আমি দেখেছি।

—রাম-রাবণের যুদ্ধও দেখেছেন?

লংকুস্বামী গম্ভীর হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তাও দেখতে হয়েছে। শুধু দেখা নয়, লড়তেও হয়েছে। ও কথা আর তুলবেন না।

হরিহরবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে প্রভু।

গুজরাটী ভদ্রলোকটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দুই উরুতে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, ও হো হো হো! আমি বুঝে লিয়েছি আপনি হচ্ছেন বিভীখন মহারাজ, রামচন্দ্রের বরে চিরঞ্জীব হয়েছেন। এখন একটি বাত বলছি শুনেন। আমার নাম শুনে থাকবেন, লগনচাঁদ বজাজ, নয়নসুখ ফিলিম কম্পনির মালিক। নয়া ফিলিম বানাচ্ছি—রাবণ-সন্হার। রোশেনারা পকৌড়িলাল সাগরবালা এঁরা সব নামছেন। আপনারা আমার কম্পনিতে জইন করুন। খুদ আমি রামচন্দ্রের পার্ট লিব। আপনি বড়দাদা রাবণের পার্ট লিবেন, সুরাম্মা বাই সীতার পার্ট লিবেন। হজার টাকা করে মহীনা দিব। এই আমার কার্ড। বিচার করে দেখবেন, রাজী হন তো এক হপ্তার অন্দর এই ঠিকানায় আমাকে তার ভেজবেন। আচ্ছা?

লংকুস্বামী একবার কটমট করে তাকালেন। লগনচাঁদ থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর হাত থেকে কার্ডখানা খসে পড়ে গেল।

এই সময়ে গাড়ি আসানসোলে এসে থামল। সস্ত্রীক লংকুস্বামী কোনও কথা না বলে যুক্ত করে বিদায় নিলেন এবং বাঘের মতন নিঃশব্দে পা ফেলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন।

১৩৫৭

জামাইষষ্ঠী

(অসমাপ্ত)

জামাইষষ্ঠী

মহাবীর প্রসাদ চৌধুরী—নাম অবাঙ্গালী হলেও লোকটি বাঙালী। তার উর্দ্ধতন তিন পুরুষ গোরক্ষপুরে বাস করতেন তাই ভাষায় আর আচার ব্যবহারে কিছু হিন্দী প্রভাব এসেছে। মহাবীর কলকাতায় এম.এ. ফিফ্‌থ ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল, সেই সময় থার্ড ইয়ারের ফুল্লরার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাপের মৃত্যুর পর থেকে মহাবীর পড়া ছেড়ে দিয়ে হ্যারিসন রোডের পৈতৃক কাপড়ের দোকানটি চালাচ্ছে। সম্প্রতি ফুল্লরার সঙ্গে তার প্রেমোত্তর বিবাহ হয়েছে।

ফুল্লরার বাবা যদুগোপাল চন্দননগরে থাকেন, তিনি বনেদী বংশের সন্তান, কিন্তু এখন অবস্থা মন্দ হয়েছে। অনেক খরচ করে পাঁচ মেয়ের বিবাহ ভাল ঘরেই দিয়েছেন, দুজন সরকারী কর্মচারী, একজন অ্যাটর্নি, একজন প্রফেসর। শুধু ছোট জামাই মহাবীর দোকানদার। যদুগোপাল আগেকার চাল বদলাতে পারেন নি, তার ফলে তাঁর দেনা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তিনি আশা করেন তাঁর দুই ছেলের ওকালতি আর ডাক্তারিতে ভাল পসার হবে এবং তারাই সব দেনা শোধ করবে।

একগুঁয়ে বলে মহাবীরের বদনাম আছে। শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের কাছে তাকে কিছু উপহাস আর গঞ্জনা সইতে হয়েছে। সে অনেক উপাধি পেয়েছে—খোট্টা, মেড়ো, ছাতুখোর, কাপড়াবালা, রামভকত, হনুমানজী ইত্যাদি। শালীরা বলেছে, তোমার দোকান তুলে দাও, একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। ভগিনীপতি কাপড় বিক্রী করে—এই পরিচয় দেওয়া যায় নাকি? স্ত্রী ফুল্লরার শাসনে তার কথাবার্তা অনেকটা দুরস্ত হয়েছে, এখন সে ঘৈলা লোটা গিলাস কটোরা না বলে কলসী ঘটি গেলাস বাটি বলে।

যদুগোপাল বাবুর বাড়ীতে খুব আড়ম্বর করে জামাইষষ্ঠী হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ফুল্লরা মহাবীরকে বলল, জামাইষষ্ঠী এসে পড়ল, আমি ছোড়দার সঙ্গে পরশু চন্দননগর যাচ্ছি। দিদিরা ত

আগেই পৌঁছে গেছে। এবারকার ভোজে একটু বেশী ঘটা হবে, এখান থেকে দুজন বাবুর্চি যাবে, একগাড়ী আইসক্রীমও যাবে।

মহাবীর বলল, ঘটা করার কি দরকার। আমরা পাঁচটি জামাই কি পাঁচটি রাক্ষস যে ভূরিভোজন না করলে চলবে না? শ্বশুর মশায়ের তো শুনেছি মোটারকম দেনা আছে, এখন অনর্থক খরচ করাই অন্যায়। তুমি আর তোমার দিদিরা বারণ কর না কেন?

ফুল্লরা বলল, বছরের মধ্যে একটি দিন পাঁচ জামাই আর পাঁচ মেয়ে একত্র হবে, একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করবে, জামাইকে তত্ত্ব পাঠানো হবে—এতে অন্যায়টা কি? তোমার দোকানদারি বুদ্ধি, কেবল মুনাফাই বোঝ। বংশের যা দস্তুর আছে তা কি ছাড়া যায়? দেনা তো সব বনেদী বংশেরই থাকে, তার জন্যে ভাববার কিছু নেই, আমার ভাইরা শোধ করবে।

মহাবীর বলল, আমার কিন্তু ঘোর আপত্তি আছে।

—খরচ করবেন আমার বাবা, তোমার মাথাব্যাথা কেন? যেরকম একগুঁয়ে তুমি, জামাইষষ্ঠী বয়কট করবে না তো?

—নিমন্ত্রণ পেলে অবশ্যই রক্ষা করব, কিন্তু পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট সন্দেশ রাবড়ি চর্ব্য-চূষ্য রাজভোগ খাব না।

—তবে খাবে কি, কচু না ছাতু?

—ছাতুই খাব।

—তোমার যেরকম বেয়াড়া গোঁ, ওখানে না যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল, একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে। নিমন্ত্রণের চিঠি এলে একটা ছুতো ক'রো, দোকানে কাজের চাপ, তাই যেতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহাবীর বলল, নিমন্ত্রণ এলে নিশ্চই যাব, না এলেও যাব।

—দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করবে নাকি?

—দক্ষযজ্ঞে শিব নিজে যান নি, অনুচর বীরভদ্রকে পাঠিয়েছিলেন। সেরকম অনুচর আমার নেই, তাই নিজেই যাব। আমি কোনও উপদ্রব করব না, নিঃশব্দে অসহযোগ জানাবো। [অসমাপ্ত]

লঘুগুরু

নামতত্ত্ব

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন। এত বড় গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে, ব্যক্তিবিশেষ বোঝায় না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভাল। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধ হয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশী রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি।—বড় জোর বানরজি। সুরেন্দ্রবাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ, ইহা বড় বিসদৃশ: মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এরকম বিলাতী নজির নাই।

বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু ; কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশগত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার সুরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্‌বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাঁড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রী অর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পায় ; আর অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হউক সাধারণে এখন গতানুগতিক ভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যক বোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারী ভারী বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রীঅক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক ? ষষ্ঠীতৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথ নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ রাজার রাজা। রাজেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্রও বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুংসংস্করণ। মোট কথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভাল হইলেই হইল। রাজা-মহারাজেরা গালভরা নাম চান, যথা

জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার বিলাতী অভিজাত-বর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থ বিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা connotation। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধ হয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নাম রূপে গণ্য হইয়াছে কিন্তু পবন-নন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালীদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে হইবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারীজনোচিত নামের

বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমল-বিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্‌গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিস কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছুকাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেমেদের যেমন আগে মিস বা মিসিস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতী বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা সধবা বা বিধবা সূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধ হয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে

নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ় কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে নামান্তে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজাতির দেবত্বের দাবি করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যেসকল মহিল বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া দ্বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন? অবশ্য নারী মাত্রেই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্প পরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধ পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকাও প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস মিসিস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা, তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হউন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি?

১৩৩০

ডাক্তারি ও কবিরাজি

আমি চিকিৎসক নহি, তথাপি আমার তুল্য অব্যবসায়ীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। আমার এবং আমার উপর যাঁহারা নির্ভর করেন তাঁহাদের মাঝে মাঝে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং সেই চিকিৎসা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহা আমাকেই স্থির করিতে হয়। অ্যালোপাথি, হোমিওপাথি, কবিরাজি, হাকিমি, পেটেণ্ট, স্বস্ত্যয়ন, মাদুলি, আরও কত কি—এইসকল নানা পন্থা হইতে একটি বা ততোধিক আমাকে বাছিয়া লইতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের উপদেশে বিশেষ সুবিধা হয় না, কারণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমারই তুল্য। আর, যদি কেহ চিকিৎসক বন্ধু থাকেন, তাঁহার মত একেবারেই অগ্রাহ্য, কারণ তিনি আপন পদ্ধতিতে অন্ধবিশ্বাসী। অগত্যা জীবনমরণ সংক্রান্ত এই বিষম দায়িত্ব আমারই উপর পড়ে।

শুনিতে পাই চিকিৎসাবিদ্যা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে আমরা একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। ডাক্তার, কবিরাজ, মাদুলিবিশারদ সকলেই বিজ্ঞানের দোহাই দেন। কাহার শরণাপন্ন হইব? সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এত গণ্ডগোল নাই। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোল। সব প্রমাণ মনে নাই, মনে থাকিলেও পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই। সকলেই বলে পৃথিবী গোল, অতএব আমিও তাহা বিশ্বাস করি। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী ত্রিকোণ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের মত বদলাইতে দেরী হইবে না। কিন্তু চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে লোকে একমত নয়, সে জন্য সকলেই একটা গতানুগতিক বাঁধা রাস্তায় চলিতে চায় না।

সর্বাবস্থায় সকল রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা কোনও পদ্ধতির নাই, আবার অনেক রোগ আপনাআপনি সারে অথচ চিকিৎসার কাকতালীয় খ্যাতি হয়। অতএব অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন লোক আপন বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার শরণ লইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিকিৎসা নির্বাচনে এত মতভেদ থাকিলেও দেখা যায় যে, কেবল কয়েকটি পদ্ধতির প্রতিই লোকের সমধিক অনুরাগ। ব্যক্তিগত জনমত যতটা অব্যবস্থ, জনমতসমষ্টি তত নয়। ডাক্তারি (অ্যালোপাথি), হোমিওপাথি ও কবিরাজি বাংলা দেশে যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্য পদ্ধতি বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সকলের সামর্থ্যে তাহা কুলায় না, সরকার বা জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর আমাদের অনেককেই নির্ভর করিতে হয়। যে পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজলভ্য। যদি রাজমত বা জনমত বহু পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়।

দেশের কর্তা ইংরেজ, সেজন্য বিলাতে যে চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে এদেশে তাহাই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কবিরাজির সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে যে এই সুলভ সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতিকে সাহায্য করা সরকারের অবশ্য-কর্তব্য। হোমিওপাথিরও বহু ভক্ত আছে, তথাপি তাহার পক্ষে এমন আন্দোলন হয় নাই। কারণ বোধ হয় এই—হোমিওপাথি সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, সেজন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। সরকারী সাহায্যের বখরা লইয়া যে দুটি পদ্ধতিতে এখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ডাক্তারি ও কবিরাজি, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হাকিমি-

চিকিৎসা ভারতের অন্যত্র কবিরাজির তুল্যই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলা দেশে তেমন প্রচলিত নয় সেজন্য তাহার আলোচনা করিব না। তবে কবিরাজি সম্বন্ধে যাহা বলিব হাকিমি সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটি প্রযোজ্য।

যাঁহারা প্রাচ্য পদ্ধতির ভক্ত তাহাদের সনির্বন্ধ আন্দোলনে সরকার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন—বেশ তো, একটা কমিটি করিলাম, ইঁহারা বলুন প্রাচ্য পদ্ধতি সাহায্যলাভের যোগ্য কিনা, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই কমিটি দেশী বিলাতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মত লইয়াছেন। এযাবৎ যাহা লইয়া মতভেদ হইয়া আসিতেছে তাহা সাধারণের অবোধ্য নয়। সরকারী সাহায্য যাহাকেই দেওয়া হউক তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সর্বসাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

প্রাচ্য পদ্ধতির বিরোধীরা বলেন—তোমাদের শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বাত পিত্ত কফ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এসকল কেবল হিং টিং ছট। তোমাদের ঔষধে কিছু কিছু ভাল উপাদান আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিস্তর বাজে জিনিস মিশাইয়া অনর্থক আড়ম্বর করা হইয়াছে। তোমাদের ঋষিরা প্রাচীন আমলের হিসাবে খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা কেবল অন্ধভাবে সেকালের অনুসরণ করিতেছ। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে পার নাই। তোমরা ভাব যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই চূড়ান্ত, তাহার পর আর কিছু করিবার নাই—অথচ তোমরা আয়ুর্বেদবর্ণিত শস্ত্রচিকিৎসার মাথা খাইয়াছ। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে গেলে যেসব বিদ্যা জানা দরকার, যথা আধুনিক শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ণ, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদি, তাহার কিছুই জান না। মুখে যতই আস্ফালন কর ভিতরে ভিতরে তোমাদের আত্মনির্ভরতায় শোষ ধরিয়াছে, তাই লুকাইয়া কুইনীন চালাও। তোমাদের সাহায্য করিলে কেবল কুসংস্কার ও

ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এইবার আমাদের কথা শোন।—আমরা কোনও প্রাচীন যোগী-ঋষির উপর নির্ভর করি না। হিপোক্রাটিস গালেন প্রভৃতির আমরা অন্ধ শিষ্য নহি। আমাদের বিদ্যা নিত্য উন্নতিশীল। পূর্বসংস্কার যখনই ভুল বলিয়া জানিতে পারি তখনই তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করি। বিজ্ঞানের যে কোনও আবিষ্কারের সাহায্য লইতে আমাদের দ্বিধা নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নব নব ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করি। আমাদের কেহ কেহ মকরধ্বজ ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু গোপনে নয় প্রকাশ্যে। আমাদের কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতা নাই।

অপর পক্ষ বলেন—আচ্ছা বাপু, তোমাদের বিজ্ঞান আমরা জানি না মানিলাম। কি আমাদের এই যে বিশাল আয়ুর্বেদশাস্ত্র, তোমরা কি তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ? বাত, পিত্ত, কফ না বুঝিয়াই ঠাট্টা কর কেন? আমাদের অবনতি হইয়াছে স্বীকার করি, এখন আর আমাদের মধ্যে নূতন ঋষি জন্মেন না। অগত্যা যদি আমরা পুরাতন ঋষির উপদেশেই চলি, সেটা কি মন্দের ভাল নয়? তোমাদের পদ্ধতিতে অনেক খরচ। তোমাদের স্কুলে একটা হাতুড়ে ডাক্তার উৎপন্ন করিতে যত টাকা পড়ে, তাহার সিকিতে সিকিতে আমাদের বড় বড় মহামহোপাধ্যায় গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তোমাদের ঔষধ পথ্য সরঞ্জাম সমস্তই মহার্ঘ, বিদেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বিজ্ঞানের অজুহাতে তোমরা চিকিৎসায় বিলাসী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধপথ্য সমস্তই সস্তা, এদেশেই পাওয়া যায়, গরিবের উপযুক্ত। আমাদের ঔষধে যতই বাজে জিনিস থাক, স্পষ্ট দেখিতেছি উপকার হইতেছে। তোমাদের অনেক ঔষধে কোহল আছে। বিলাতী উদরে হয়তো তাহা সমুদ্রে জলবিন্দু, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্থ জঠরে সেই অপেয় অদেয় অগ্রাহ্য জিনিস ঢালিবে কেন? আমাদের দেশবাসীর ধাতু তোমাদের বিলাতী গুরুগণ কি করিয়া বুঝিবেন?

তোমাদের চিকিৎসা যতই ভাল হউক, এই দরিদ্র দেশের কয়জনের ভাগ্যে তাহা জুটিবে? যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা ডাক্তারি চিকিৎসা করান, কিন্তু গরীবের ব্যবস্থা আমাদের হাতে দাও। বড় বড় ডাক্তার যাহাকে জবাব দিয়াছে এমন রোগীকেও আমরা সারাইয়াছি, বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেও আমাদের ডাকে, আমরাও মোটর চালাই। কেবল কুসংস্কারের ভিত্তিতেই কি এতটা প্রতিপত্তি হয়? মোট কথা—তোমাদের বিজ্ঞান একপথে গিয়াছে, আমাদের বিজ্ঞান অন্যপথে গিয়াছে। কিন্তু তোমরা জান, কিছু আমরা জানি। অতএব চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দ টাকার কিছু তোমরা লও, কিছু আমরা লই।

আমার মনে হয় এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসাপদ্ধতি'র অর্থবিপর্যয়। Eastern science, eastern system, western science, western system—এসকল কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা ভাল।

'বিজ্ঞান' শব্দে যদি পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান বুঝায় তবে তাহা দেশে দেশে পৃথক হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জগতের গুনিসভার বিচারে উত্তীর্ণ হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, সে জন্য কালে কালে সিদ্ধান্তের অল্পাধিক পরিবর্তন হইতে পারে। যাঁহারা বলেন— —পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান মানি না, অপৌরুষেয় অথবা দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সনাতন সিদ্ধান্তই আমাদের নির্বিচারে গ্রহণীয়—তাঁহাদের সহিত তর্ক চলে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এমন অর্থ হইতে পারে না যে একই সিদ্ধান্ত কোথাও সত্য কোথাও মিথ্যা। কুতার্কিক বলিতে পারে— শ্রাবণ মাসে বর্ষা হয় ইহা এদেশে সত্য বিলাতে মিথ্যা; মশায় ম্যালেরিয়া আনে ইহা এক জেলায় সত্য অন্য জেলায় মিথ্যা। এরূপ

হেত্বাভাস খণ্ডনের আবশ্যকতা নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের একমাত্র অর্থ—বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যাহা সর্বদেশেই মান্য।

বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক আর বিজ্ঞানীর এইমাত্র প্রভেদ যে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। অগ্নিপক্ব দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীতনিবারণ হয় এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি। কতক সংস্কারবশে করি, কতক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করি। অসত্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াও অনেক কাজ করি বটে কিন্তু জীবনের যাহা কিছু সফলতা তাহা সত্য সিদ্ধান্ত লাভ করি।

চরক বলিয়াছেন—

সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ং।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞানজনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গাড়িতে চাকা লাগাইলে তাড়াতাড়ি চলে এই সিদ্ধান্ত কোন্ দেশে কোন্ যুগে কোন্ মহাবিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু সমগ্র জগৎ বিনা তর্কে ইহার সৎপ্রয়োগ করিতেছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে এই সত্য পাশ্চাত্ত্য দেশে আবিষ্কৃত হইলেও এদেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্তের উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার জাতিদোষ থাকিতে পারে না, বয়কট চলিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া বুঝিব অমুক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কি না? বিজ্ঞানীদের মধ্যেও মতভেদ হয়। আজ যাহা অভ্রান্ত গণ্য হইয়াছে ভবিষ্যতে হয়তো তাহাতে ত্রুটি বাহির হইবে অতএব সিদ্ধান্তেরও

মর্যাদাভেদ আছে। মোটামুটি সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে—

১। যাহার পরীক্ষা সাধ্য এবং বার বার হইয়াছে।

২। যাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে নাই অথবা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহার সহিত কোনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বলাবাহুল্য প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তরই ব্যবহারিক মূল্য অধিক। এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত আরও নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যাহা এখনও অপরীক্ষিত অথবা কেবল লোকপ্রসিদ্ধ বা ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞানীর শ্রেণীতে ফেলা অনুচিত।

চিকিৎসা একটি ব্যবহারিক বিদ্যা। ইহার প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিজ্ঞানের সকলগুলি সমান উন্নত নয়। কৃত্রিম যন্ত্রের কার্যকারিতা অথবা এক দ্রব্যের উপর অপর দ্রব্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে যত সহজে পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফল যেপ্রকার নিশ্চয়ের সহিত জানা যায়, জটিল মানবদেহের উপর সেপ্রকার সুনিশ্চিত পরীক্ষা সাধ্য নয়। অতএব চিকিৎসাবিদ্যায় সংশয় ও অনিশ্চয় অনিবার্য। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্পপরীক্ষিত অপরীক্ষিত কিংবদন্তীমূলক ও ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। অতএব বর্তমান অবস্থায় সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা অত্যুক্তি মাত্র, এবং তাহাতে সাধারণের বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়।

কবিরাজগণ মনে করেন তাঁহাদের চিকিৎসাপদ্ধতি একটা স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, অতএব ডাক্তারি বিদ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক রাখা

নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্যার যে অংশ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে, কিন্তু যাহা বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা বর্জন করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। অমুক তথ্য বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই—কবিরাজগণের এই ধারণা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তাঁহাদের অবনতি অনিবার্য। এমন দিন ছিল যখন দেশের লোকে সকল রোগেই তাঁহাদের শরণ লইত। কিন্তু আজকাল যাঁহারা কবিরাজির অতিশয় ভক্ত তাঁহারাও মনে করেন কেবল বিশেষ বিশেষ রোগেই কবিরাজি ভাল। নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রভাবে কবিরাজি চিকিৎসার এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিরই চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদেরও আয়ুর্বেদের প্রতি অবজ্ঞা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নবলব্ধ বিদ্যার অভিমানে হয়তো তাঁহারা অনেক পুরাতন সত্য হারাইতেছেন। এইসকল সত্যের সন্ধান করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। চরকের এই মহাকাব্য সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

> নচৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারং। তস্মাৎ
> অপ্রমত্তঃ শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ।...
> কৃৎস্নোহি লোকে বুদ্ধিমতাং আচার্যঃ, শত্রুশ্চ
> অবুদ্ধিমতাম্। এতচ্চ অভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা
> অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরং
> ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যং অনুবিধাতব্যঞ্চ।

অর্থাৎ—সুতরাং আয়ুর্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে। ...বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান ধনকর যশস্কর আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশবাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন এবং অনুসরণ করিবেন।

কেহ কেহ বলিলেন, কবিরাজগণ যদি ডাক্তারি শাস্ত্র হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা ভক্তগণের শ্রদ্ধা হারাইবেন—যদিও সেসকল ভক্ত আবশ্যকমত ডাক্তারি চিকিৎসাও করান। এ আশঙ্কা হয়তো সত্য। এমন লোক অনেক আছে যাহারা নিত্য অশাস্ত্রীয় আচরণ করে কিন্তু ধর্মকর্মের সময় পুরোহিতের নিষ্ঠার ত্রুটি সহিতে পারে না। সাধারণের এইপ্রকার অসমঞ্জস গোঁড়ামির জন্য কবিরাজগণ অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এযাবৎ প্রাচীনকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ; সাধারণেও তাহাই শিখিয়াছে। তাঁহারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্যবিধ করেন এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সাক্ষ্য একটু কমাইয়া বর্তমানকালোচিত যুক্তি প্রয়োগ করেন তবে লোকমতের সংস্কারও অচিরে হইবে।

শাস্ত্র ও ব্যবহার এক জিনিস নয়। হিন্দুর শাস্ত্র যাহা ছিল তাহাই আছে, কিন্তু ব্যবহার যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ সেকালেও হিন্দু ছিল, একালেও আছে। প্রাচীন চিন্তাধারার ইতিহাস এবং প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে শাস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়, কিন্তু কোনও শাস্ত্র চিরকালের উপযোগী ব্যবহারিক পন্থা নির্দেশ করিতে পারে না। চরকসুশ্রুতের যুগে অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোনও একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত যেসকল আবিষ্কার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত, তাহার পর আর উন্নতি হইতে পারে না—এরূপ ধারণা অধোগতির লক্ষণ। নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেই আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির জাতিনাশ হইবে না। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশকাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন সমাজের উপযোগী পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে এবং একই পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াও আপন সমাজগত বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে পারে।

বিলাতের লোক টেবিলে চীনামাটির বাসন কাচের গ্লাস ইত্যাদির সাহায্যে রুটি মাংস মদ খায়। আমাদের দেশের লোকের সামর্থ্য ও রুচি অন্যবিধ, তাই ভূমিতে বসিয়া কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে ভাত ডাল জল খায়। উদ্দেশ্যে এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু কলাপাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। দেশীয় পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আলু কপির ব্যবহার বিলাত হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী প্রথায় রাঁধি। গ্লাসে জল খাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশীয় রুচি অনুসারে পিতল কাঁসায় গড়ি। এইরূপ অনেক জিনিস প্রথা একটু বদলাইয়া বা পুরাপুরি লইয়া আপন পদ্ধতির অঙ্গীভূত করিয়াছি। অনেক দুষ্ট প্রথা শিখিয়া ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি নির্বিচারে ভাল মন্দ সকল বিদেশী প্রথাই বর্জন করিতাম তবে আরও বেশী করিতাম।

চাকা সংযুক্ত গাড়ি যে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমি যদি ধনী হই এবং আমার দেশের রাস্তা যদি ভাল হয় তবে আমি মোটরে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু যদি আমার অবস্থা মন্দ হয়, অথবা পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে যাইতে হয়, অথবা যদি অন্য গাড়ি না জোটে, তবে আমাকে গরুর গাড়িই চড়িতে হইবে। আমি জানি, গোযান অপেক্ষা মোটরযান বহু বিষয়ে উন্নত এবং মোটরে যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে গোযানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমি গরুর গাড়ি নির্বাচন করিলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিব না। মোটরে যে অসংখ্য জটিল বৈজ্ঞানিক কৌশলের সমবায় আছে তাহা আমার অবস্থার অনুকূল নয়, অথচ যে সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গরুর গাড়ি নির্মিত তাহাতে আমার কার্যোদ্ধার হয়। কিন্তু যদি গরুর গাড়ির মাঝে চাকা না বসাইয়া শেষ প্রান্তে বসাই অথবা ছোটবড় চাকা লাগাই তবে অবৈজ্ঞানিক

কার্য হইবে। অথবা যদি আমাকে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাইতে হয়, এবং কেহ গাড়ির সম্মুখে লণ্ঠন বাঁধিবার যুক্তি দিলে বলি—গরুর গাড়ির সামনে কস্মিন্‌কালে কেহ লণ্ঠন বাঁধে নাই, অতএব আমি এই অনাচার দ্বারা সনাতন গোযানের জাতিনাশ করিতে পারি না—তবে আমার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি মোটরের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশে মনে করি—বরং বাড়িতে বসিয়া থাকিব তথাপি অসভ্য গোযানে চড়িব না—তবে হয় তো আমার পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তি হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন আমি কবিরাজি পদ্ধতিকে গরুর গাড়ির তুল্য হীন এবং ডাক্তারিকে মোটরের তুল্য উন্নত বলিতেছি। আয়ুর্বেদভাণ্ডারে এমন অনেক তথ্য নিশ্চয় আছে যাহা শিখিলে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ ধন্য হইবেন। আমার ইহাই বক্তব্য যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞজনের গ্রহণীয়—যদি অন্ধ সংস্কার না থাকে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পরিবর্তন করিতে দ্বিধা না থাকে। এই পরিবর্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-বিধান বিষয়ে কেবল যে কবিরাজি পদ্ধতি উদাসীন তাহা নয়, ডাক্তারিও সমান দোষী। ডাক্তারি পদ্ধতি বিলাত হইতে যথাযথ উঠাইয়া আনিয়া এদেশে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহাতে যে নিত্য-বর্ধমান আছে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার ঔষধ কেবল বিলাতে জ্ঞাত ঔষধ, তাহার পথ্য বিলাতেরই পথ্য। এদেশে পাওয়া যায় কিনা, অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। দেশীয় উপকরণে আস্থা নাই, কারণ তাহার সহিত পরিচয় নাই। যাহা আবশ্যক তাহা বিদেশ হইতে আসিবে অথবা বিলাতী রীতিতেই এদেশে প্রস্তুত হইবে। চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ বিলাতের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাস ও রুচি অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হওয়া চাই, আধেয়

অপেক্ষা আধারের খরচ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, এই দরিদ্র দেশের সামর্থ্যে না কুলাইলেও আপত্তি নাই। দেশসুদ্ধ লোকের ব্যবস্থা নাই হইল, যে কয়েকজনের হইবে তাহা বিলাতের মাপকাঠিতে প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। কাঙালী ভোজনের টাকা যদি কম হয় তবে বরঞ্চ জনকতককে পোলাও খাওয়ানো হইবে কিন্তু সকলকে মোটা-ভাত দেওয়া চলিবে না। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে।

একদল পুরাতনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন, আর একদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানের এবং বিলাসিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। একদিকে অসংস্কৃত সুলভ ব্যবস্থা, অন্যদিকে অতিমার্জিত উপচারের ব্যয়বাহুল্য। আমাদের কবিরাজ ও ডাক্তারগণ যদি নিজ নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কার-মুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন তবে ক্রমশ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এদেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্বেদের উদ্ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই উদ্‌যোগে অগ্রণী হইবেন তাঁহাদিগকে দেশী বিদেশী উভয়বিধ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পক্ষপাত বর্জন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতি হইতে বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং চিকিৎসার যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল উৎকর্ষের দিকেই লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, যাহাতে চিকিৎসার উপায় বহুপ্রসারিত, দরিদ্রের সাধ্য এবং সুদূর পল্লীতেও সহজপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যদি নূতন এক শ্রেণীর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হয় এবং ব্যয়লাঘবের জন্য নিকৃষ্ট প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য। কবিরাজি পাচন অরিষ্ট চূর্ণ মোদক বটিকাদির প্রস্তুতপ্রণালী যদি অল্পব্যয়সাপেক্ষ হয় তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একপ্রকার ঔষধ যদি ডাক্তারি টিংচার প্রভৃতির তুল্য প্রমাণসম্মত বা standardized অথবা অসার অংশ বর্জিত না

হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। দেশের যে অসংখ্য লোকের ভাগ্যে কোনও চিকিৎসাই জুটে না তাহাদের পক্ষে মোটামুটি ব্যবস্থাও ভাল। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি হইবার কারণ নাই, যাহার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সে প্রকৃষ্ট চিকিৎসাই করাইতে পারে। অবশ্য যদি দেশের অবস্থা উন্নত হয় তবে নিম্নস্তরের চিকিৎসাও ক্রমে উচ্চস্তরে পৌঁছিবে।

কবিরাজগণ দেশীয় ঔষধের গুণাবলী প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত। ঔষধের বাহ্য আড়ম্বরের উপর তাঁহাদের অন্ধভক্তি নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তারগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অধিকতর উন্নত। অতএব উভয় পক্ষের মতবিনিময় না হইলে এই সমন্বয় ঘটিবে না।

এইপ্রকার চিকিৎসা-সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। প্রচলিত কবিরাজি পদ্ধতিকে সাহায্য করিলে দেশে চিকিৎসার অভাব অনেকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না, ডাক্তারির ব্যয়বাহুল্য এবং কবিরাজির গতানুবর্তিতা কমিবে না। যদি অর্থ ও উদ্যমের সৎপ্রয়োগ করিতে হয় তবে সরকারী সাহায্যে এইপ্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত—

১। ডাক্তারি স্কুল-কলেজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদকে স্থান দেওয়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র না পড়িলে যেমন ফিলসফি-শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, চিকিৎসাবিদ্যাও তেমনই আয়ুর্বেদের অপরিচয়ে খর্ব হয়।

২। সাধারণের চেষ্টায় যেসকল আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা। সাহায্যের শর্ত এই হওয়া উচিত যে চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞান-সকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বিলাতী ফার্মাকোপিয়ার অনুরূপ এদেশের উপযোগী সাধারণ প্রযোজ্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকলন। ডাক্তারি চিকিৎসায় যদিও অসংখ্য ঔষধ প্রচলিত আছে

তথাপি ফার্মাকোপিয়া-ভুক্ত ঔষধসকলেরই ব্যবহার বেশী। বিলাতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত সমিতি দ্বারা এই ভৈষজ্য-তালিকা প্রস্তুত হয়। দশ পনর বৎসর অন্তর ইহার সংস্করণ হয়, যেসকল ঔষধ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়, সুপরীক্ষিত নূতন ঔষধ গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঔষধ তৈয়ারির নিয়মও পরিবর্তিত হয়। এদেশে এককালে শার্ঙ্গধর এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সকল সভ্য দেশেরই আপন ফার্মাকোপিয়া আছে এবং তাহা দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে সংকলিত হইয়া থাকে। এদেশের ফার্মাকোপিয়া বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ তৈয়ারির যেসকল ডাক্তারি প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত। অবশ্য যে-সকল ঔষধ বা প্রণালী বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অখ্যাত বা অপরীক্ষিত তাহা বর্জিত হইবে। কেবল কিংবদন্তীর উপর অত্যধিক নির্ভর অকর্তব্য। কিন্তু দেশীয় অমুক ঔষধ বা প্রণালী, বিলাতী অমুক ঔষধ বা প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়াই বর্জিত হইবে না, ব্যয়লাঘব ও সৌকর্যের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এপ্রকার ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে পক্ষপাতহীন উদারমতাবলম্বী ডাক্তার ও কবিরাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই সংযোগ দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই হতাশ হইবার কারণ নাই। এখন ডাক্তারগণই প্রবল পক্ষ, সুতরাং প্রথম উদ্যমে তাঁহারাই একযোগে সাক্ষী বিচারকের আসন গ্রহণ করিবেন এবং কবিরাজগণকে কেবল সাক্ষ্য দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। প্রথম যাহা দাঁড়াইবে তাহা যতই সামান্য হউক, শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানবিনিময়ের ফলে ভবিষ্যতের পথ ক্রমশ সুগম হইবে।

৪। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ। যেসকল নূতন

চিকিৎসক আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এদেশের প্রতিষ্ঠাবান অনেক ডাক্তার আয়ুর্বেদকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইসকল নবপ্রবর্তিত দেশীয় ঔষধের প্রচলনে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কার্যে পরিণত করা অর্থ উদ্যম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিকে কালোপযোগী করা এবং চিকিৎসার উপায় সাধারণের পক্ষে সুলভ করার অন্যবিধ পন্থা খুঁজিয়া পাই না। সরকারী সাহায্য মিলিলেই কার্যোদ্ধার হইবে না, চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলেরই উৎসাহ আবশ্যক। মোট কথা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয় যে, জ্ঞান সর্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য অভ্যাস ও রুচি অনুসারে করিব, তবেই উদ্দেশ্য সহজ হইবে।

১৩৩০

ভদ্র জীবিকা

বাংলার ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় ভাবিতেছেন এবং জীবিকা নির্বাহের নূতন পন্থা নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হউক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঔষধ নির্বাচন মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য চাই, উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভবপর বোধহয় তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া দুর্দশার কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দশা কেবল ভদ্রসমাজেই বর্তমান এমন নয়। কিন্তু সমগ্র বাঙালীসমাজের অবস্থার বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায় তাহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই আছেন। অন্যধর্মীর ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। প্রতিকারের পন্থা যে সকলের পক্ষেই সমান তাহা বলা বাহুল্য।

শতাধিক বৎসর পূর্বে 'ভদ্র' বলিলে কেবল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানত জন্মগত হইলেও একটা গুণকর্মবিভাগজ বিশিষ্টতা সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্ত্ব ভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন

ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, অধিকাংশ বৈদ্য চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য করিতেন, এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরেজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিককে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন। উভয় গৃহস্থের মধ্যে সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকের জমিদারি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন করিতেছেন তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জিত আচারব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনও বর্তমান, কেবল প্রভেদ এই—বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশপরম্পরালব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের আর চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্বাহ হইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর আসিল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমের সুবিধা হয়। কেরানীযুগের সেই আদি কালে সামান্য ইংরেজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল, সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকতক অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্‌যোগী তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি

স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদেয় সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরেজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জনের পরিমাণ যাহাই হউক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চালচলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণপোষণ হইত। সভ্যতা ও বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জকের নিজ খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্মান বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবনযাত্রার প্রণালীবিশেষ। ভদ্রতালাভের উপায় হইল—বিশেষ-প্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটি ভদ্রমণ্ডূক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমাও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মাঠের মণ্ডূক হাটের মণ্ডূক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কূপমণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই ভদ্রতা বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা অর্থাৎ স্কুল-কলেজে লব্ধবিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায় তাহাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরানীগিরির বেতন যতই অল্প হউক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই কম হউক, তথাপি এসকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি পুরানো লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যা-প্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এসকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না; তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্রসন্তান ক্রমশ অকেতাবী বৃত্তিও লইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহার নূতন আমদানি হইয়াছে কিংবা যাহার ইংরেজী নামই প্রচলিত, সেরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, ধোবার কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি বা বাইসিকেল মেরামত, নক্‌শা আঁকা, ডাইং-ক্লিনিং, চা-এর দোকান, মাংসের হোটেল, স্টেশনারী-শপ—এসকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক বা ইংরেজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এইসকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগার করা সম্ভব নয়। দরিদ্র ভদ্রসন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনও রকমে সংসার চালাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকিলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, এঞ্জিনিয়ার প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদরী হয়, সৈনিক হয়, নাবিক হয় কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এসকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শিখাও, ইউনিভারসিটির পাঠ্য বদলাও। ছেলেরা অল্পবয়স হইতে হাতে কলমে কাজ করিতে শিখুক, তাহার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প-উৎপাদন শিখুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না তাহারা banking, accountancy, economics প্রভৃতিতে মন দিক। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সমস্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রাও স্থির হয় নাই, রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধসেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয় তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার কর্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতটা জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দরজীর কাজ, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, নক্‌শা করা ও কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিংবা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ কাজ বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয় হিতকর। যাহারা অবস্থাসম্পন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্যা ও ব্যায়ামশিক্ষা আবশ্যক, হাতের নিপুণতা তেমনই আবশ্যক। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এইপ্রকার শিক্ষার কেবল গৌণভাবেই হিতকর, মুখ্যভাবে উপার্জনের কোনও সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা। Mechanical ও electrical engineering, agriculture, surveying, banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্পবিস্তর আছে। এখন কয়েকপ্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, যথা—চামড়া, সাবান, কাচ, চীনামাটির জিনিস, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারি এবং সুতা ও কাপড় রং করার প্রণালী। উদ্দেশ্য এই যে দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা, যথা—engineering, accountancy ইত্যাদি শিখিলে চাকরির ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে কেবল এইপ্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা ; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল বি. এস-সি. এম. এস-সি.-তে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য ? আত্মীয়স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরানী বা উকিল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে ? বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমেস্ট্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত হইলেই

বিজ্ঞানে প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে teachnical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসংযত ছিল তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, এবং এবারেও হয়তো সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞানে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে তাহা উদাহরণ-রূপেই থাকে, উৎপাদনের প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসার সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান-পাঠে কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান লাভ হয়, এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয় শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যে সকল কারণ বর্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞানশিক্ষা তাহার অন্যতম কারণ, প্রধান কারণও বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সংগত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য তৈয়ারি বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না, তাহার জন্য দক্ষ ব্যক্তির কাছে হাতা-খন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। এই শিক্ষা লাভ করিলে পাচকের চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয়ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না,

তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনও উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধন-বিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধনশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত যায়গায় বাড়ি চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাকালে বহুলোকের আহার্য সরবরাহ চাই, হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়ব্যয় খতাইয়া লাভ-লোকসান নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনও শিক্ষালয়ে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের কঠোর প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্‌যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞানচর্চা করিয়া কিংবা বিজ্ঞানের কোনও চর্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চা এবং কার্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এই সুযোগ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্বে যদি এক লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে এখন হয়তো দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আমরা একমাত্র আশা করিতে পারি যে

কয়েকজনের নূতন প্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে কোনও প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical Education-কে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাহি—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফলমনোরথ হইবেন। কারণ, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এদেশে কারখানাও এত নাই যে যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। বিজ্ঞান সকলের রুচিকরও নয়। অতএব জীবিকা-লাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কিনা দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের এক দল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর এক দল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এইসকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, economics বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয়, কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়াইয়া ইহার পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কতক অজ্ঞতার জন্য এইসকল পরদেশীর কার্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে ; যা-তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোন বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মনে করার কোনও হেতু নাই যে ঐসকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে বাঙালীর পরাভব তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এইসকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরানী মার্চেণ্ট অফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice voucher day-book ledger লিখিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া আসে, মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য

পালন করে মাত্র, মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই স্বার্থও নাই। ভারতীয় বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। তাহার সহায়তা করিয়া বণিক-পুত্র অল্প বয়সেই পৈতৃক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শেখে, এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাবেদা রোকড় খতিয়ান হাতচিঠা হুণ্ডি মোকাম—বাজারের গূঢ় তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের দুর্লভ। উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসার কেরানীর সন্তান ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকদের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল আড়তদার ব্যাপারী পাইকার দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে। পণ্যের এই পরিক্রমপথে অগণিত ব্যক্তির অন্নসংস্থান হয়। এই মহাজন অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রলোককে এই পথের বার্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক অনেক সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয় তাহারই কিয়ংদশে ব্যবসায় শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বঞ্চিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকলে সময়ে সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে তাহার সংকল্প স্থির করিয়া পঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত

পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর অনাবশ্যক। আগে অর্থবিদ্যা শিখিব তাহার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ—ইহাই স্বভাবিক রীতি। দোকান হাট বাজার আড়ত ব্যবসায়শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ। এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে; আমদানি রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়প্রথা, পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য, দালালের করণীয়, হিসাবের প্রণালী, পাওনা আদায়ের উপায়—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এইসকল সংবাদ গ্রহণ করেন তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং শিক্ষার্থীকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা—অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা—শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনও ব্যবসায়ীর কর্মচারী হইয়া হাতেকলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য premium দেওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু যদি দিতেও হয় তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনও নির্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যেকোনও সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করায় লাভ আছে, কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না। সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপারে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবিশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চশিক্ষা বা কার্যকরী বিদ্যা লাভ করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে এরূপ আশা করা অসংগত। প্রথমে যে ছোট

কারবার আরম্ভ হইবে তাহা হাতেখড়ি বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তাহার পর অভিজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার সহজেই বৃদ্ধি পাইবে।

এইপ্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, শৌখিন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত লোহার ঘরে জলন্ত হাপরের কাছে লোহা পিটিয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সার্ভেয়িং শেখে। আইনপরীক্ষা পাস করিয়া বহু দিন মুরব্বী উকিলের বাড়িতে ধরনা দেয়। ভোরে অর্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন অফিসে কলম পিশিয়া বাড়ি ফেরে। এসকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে যে বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে, সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনও কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিতেছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীরশিল্প উন্নত কৃষি এবং কার্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মন দেন তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়, ইহার ক্ষেত্রেও বিশাল। দোকানদার না থাকিলে সমাজ চলে না। জনকতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এইসকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয় জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুখাইবে না।

১৩৩১

রস ও রুচি

ঋগ্‌বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বললেন—'কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি'—অগ্রে যা উদয় হ'ল তা কাম। তার পর আমাদের আলংকারিকরা নবরসের ফর্দ করতে গিয়ে প্রথমেই বসালেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদলবলে এসে সাফ সাফ ব'লে দিলেন—মানুষের যাকিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনও মনোবিদ্যার বৈঠকে একটি প্রবন্ধ শুনেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের রচনার সাইকোঅ্যানালিসিস। বক্তা পরমশ্রদ্ধা-সহকারে রবীন্দ্রসাহিত্যের হাড় মাস চমড়া চিরে চিরে দেখাচ্ছিলেন কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবীচক্রে উপস্থিত থাকতেন তবে নিশ্চয় মূর্ছা যেতেন, আর মূর্ছান্তে ছুটে গিয়ে কোনও স্মৃতিভূষণকে ধ'রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যাকিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি তার অনেকেরই মূলে আছে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির ক'রে তার নাম দিয়েছেন 'লিবিডো', কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট রূপ। তার কি সোজাসুজি লালসা? তার শতজিহ্বা শতদিকে লকলক করছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটতে চায়, তার পাত্রাপাত্র কালাকাল জ্ঞান নেই। এই জঘন্য বৃত্তিই কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়বচন মাত্র। আমরা যে সত্য সত্যই এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন

আস্বাদও আমরা মাঝে মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা ঘৃণ্য বা পীড়াদায়ক, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হ'লে আমরা সমাদরে উপভোগ করি। নতুবা শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যাভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে গল্পে চিত্রে স্থান পেত না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয় ফুঁড়ে বার হয়েছে। এতেই তাদের চরিতার্থতা। এইসকল মনোবৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে, এবং সাহিত্যাদি কলায় তারা অনবদ্য ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু যেসব কামনার তেমন রূপান্তরগ্রহের শক্তি নেই তারা মাটিচাপা প'ড়েও অহরহ ঠেলা দিচ্ছে। সমাজ বলছে—খবরদার, যদি ফুটতেই চাও তবে কমনীয় বেশে ফুটে ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলছে—ছদ্মবেশে সুখ নেই, আমি স্বমূর্তিতেই প্রকট হ'তে চাই; আমি পাষাণকারা ভাঙব, কিন্তু করুণাধারা ঢালা আমার কাজ নয়। হুঁশিয়ার রস-স্রষ্টা স্নেহশাল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু-সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়িয়ে আনব, কিন্তু সাজগোজ ক'রে ভদ্রবেশ ধ'রে চল; আর বেশী দাপাদাপি ক'রো না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখে বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ কেউ যেন একটু বেশী দুরন্ত। তাদের স্রষ্টা বুঝিয়ে দেন—এরা তোমার নিতান্তই অন্তরের ধন; ভয় নেই, এরা কিছুই নষ্ট করবে না, আমি এদের সামলাতে জানি; এদের মধ্যে যে বেশী দুরন্ত তাকে আমি অবশেষে ঠেঙিয়ে দুরন্ত ক'রে দেব, যে কম দুরন্ত তাকে অনুতপ্ত করব, যে কিছুতেই বাগ মানবে না তাকে নিবিড় রহস্যের জালে জড়িয়ে ছেড়ে দেব। দ্রষ্টার দল খুশী হয়ে বলেন

—বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দুএকজন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও ভয় পান।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এইসব নিগৃহীত কামনাকে বলেন—কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজগোজের দরকার কি, যাও, উলঙ্গ হয়ে রঙ মেখে নেচে এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সমাদরে বরণ ক'রে বলছেন—এই তো আসল আর্ট, আদিম ও চরম। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন—কখনও আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না, আর্ট যদি হবে তবে ওদের দেখে আমাদের এত-জনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন? সমাজপতিরা বলেন—আর্ট-ফার্ট বুঝি না; সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'তে দেব না; আমাদের সব বিধানই যে ভাল এমন বলি না; যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাতে পার তো দেখাও; কিন্তু তা যদি না পার তবে আত্মস্ফূর্তি বা Self-expression-এর দোহাই দিয়ে যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, আমাদের ছেলেমেয়ে বিগড়ে দেবে, সেটি হবে না; আমরা আছি পুলিসও আছে।

উক্ত দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনও গণ্ডি নেই, আছে কেবল মাত্রাভেদ বা সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরব না, কারণ অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরকবর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী হয়। কোন্ সীমায় সুরুচির শেষ আর কুরুচির আরম্ভ তারও নির্ধারণ হ'তে পারে না। এক যুগ এক দল যাকে উত্তম আর্ট বলবে, অপর যুগ অপর দল তার নিন্দা করবে, আর সমাজ চিরকালই আর্ট সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করবে।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টিতে আমরা নিয়মের রাজত্ব দেখি। মানুষ অনেক, তাই তার সৃষ্টি নিয়ে এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে

নিহিত আছে, তাই বোধহয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো' আর ঋষিপ্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।
(ঋগ্‌বেদ, ১০ম, ১২৯ সূ)

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।
(শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কৃত অনুবাদ)

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ', শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ ই ধরতে হবে। কিন্তু সৎ-অসৎ-এর বাংলা অর্থ ধরলে এই মুক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফ্রয়েডপন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম থেকে সদ্‌বস্তু আর্ট উৎপন্ন হয়েছে। মনীষী কবিরা নিজ হৃদয় পর্যালোচনা ক'রে হয়তো আপন অন্তরে আর্টের স্বরূপ উপলব্ধি করছেন। কিন্তু জনসাধারণের উপলব্ধি এখনও অস্ফুট। কি আর্ট, আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করতে পারে নি, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলবেই। যদি কোনও কালে আর্টের লক্ষণ নির্ধারিত হয়, তাহ'লেও সমাজের শঙ্কা দূর হবে কিনা সন্দেহ।

রস কি তা আমরা বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও আছে তাই আর্ট আরও জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সঙ্গে অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিলনই আর্ট। কিন্তু যে সব উপাদান

আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলি অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্প-বিস্তর অবান্তর খাদ আছে। নির্বাচনের দোষে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত বাজে উপাদান এসে পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে অবাঞ্ছিত স্বাদ জন্মায়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ভোক্তার রুচি গঠিত ক'রে, কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১৩৩৪

অপবিজ্ঞান

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটি কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্তের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না কশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে'। এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্থলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক

সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন! বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবেরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস— মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরো ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহেও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। একটুকরা

মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোকাও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাঁচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন

একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ

জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসাবিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসাবিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায় ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষ মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন—পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কোন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ—যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই—কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম—কুইনীনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন—কুইনীন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন—জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুকপ্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে—কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও

প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন—জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণনির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান—অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহাদের মধ্যে একটি; জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণনির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার করণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি

সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স—তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্ণেয়তা বা অবার্যতাই করিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting -এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—
'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe......A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.'

১৩৩৬

ঘনীকৃত তৈল

চলিত কথায় 'তৈল' বলিলে যে সকল বস্তু বুঝায় তাহাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। সকল তৈলই দাহ্য, অল্পাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য। তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলে এই সকল লক্ষণ বর্তমান। পক্ষান্তরে স্পিরিট তৈল নয়, কারণ তাহা দাহ্য ও তরল হইলেও জলের সহিত মিশে।

কিন্তু তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলের কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। তার্পিন সহজে উবিয়া যায়, কেরোসিন উবিতে সময় লাগে, সর্ষপ তৈল মোটেই উবে না। সর্ষপ তৈলের সহিত সোডা মিশাইয়া সাবান করা যায়, কিন্তু তার্পিন ও কেরোসিনে সাবান হয় না।

আমরা মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য পদার্থের স্থূল লক্ষণ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু বিজ্ঞানী তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং সেইগুলিকেই মুখ্য লক্ষণ গণ্য করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করেন। শ্রেণীনির্দেশের জন্য বিজ্ঞানী নূতন নাম রচনা করেন, অথবা প্রচলিত নাম বজায় রাখিয়া তাহার অর্থ সংকুচিত বা প্রসারিত করেন। এজন্য লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে অনেক স্থলে বিরোধ দেখা যায়। লোকে বলে চিংড়িমাছ, বিজ্ঞানী বলেন চিংড়ি মাছ নয়। লোকে কয়েকপ্রকার লবণ জানে, যথা—সৈন্ধব, করকচ, লিভারপুল, বেআইনী, ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বলেন, লবণ তোমার রান্নাঘরের একচেটে নয়, লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ। কবি লেখেন—তাল-তমাল। বিজ্ঞানী বলেন—ও দুই গাছে ঢের তফাত, বরং ঘাস-বাঁশ লিখিতে পার।

রসায়নশাস্ত্র অনুসারে তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈল তিন পৃথক শ্রেণীতে পড়ে। তার্পিন, চন্দন, নেবুর তৈল প্রভৃতি গন্ধতৈল প্রথম শ্রেণী। কেরোসিন, পেট্রল, ভ্যাসেলিন, এমন কি কঠিন প্যারাফিন—যাহা হইতে বর্মা-বাতি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী। সর্ষপ তৈল, তিল তৈল ঘৃত, চর্বি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ইংরেজী নাম fat; আমরা এই শ্রেণীকেই 'তৈল' নামে অভিহিত করিব। অপর দুই শ্রেণী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

তৈল মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভারতের প্রদেশ-ভেদে সর্ষপ তিল চীনাবাদাম ও নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতের তো কথাই নাই, ভারতবাসী মাত্রই ঘৃতভক্ত। চর্বির ভক্তও অনেক আছে। কার্পাসবীজের তৈলও আজকাল রন্ধনে চলিতেছে। কোনও কোনও স্থানে তিসির তৈলও বাদ যায় না। মাদ্রাজে রেড়ির তৈলে প্রস্তুত উপাদেয় আমের আচার খাইয়াছি।

সাধারণ সাবানের উপাদান তৈল ও সোডা। তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্বি ও নারিকেল তৈলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম। লোকে নরম সাবান পছন্দ করে না, সেজন্য অন্য তৈলের সহিত কিছু চর্বি ও নারিকেল তৈল মিশানো হয়। নারিকেল তৈলের বিশেষ গুণ—সাবানে প্রচুর ফেনা হয়। কোনও কোনও কাজে নরম সাবানই দরকার হয়, সেজন্য নারিকেল তৈল ও চর্বি না দিয়া অন্য উদ্ভিজ্জ তৈল বা মাছের তৈল ব্যবহার করা হয় এবং সোডার বদলে অল্পাধিক পটাশ দেওয়া হয়। কিন্তু মোটের উপর কঠিন সাবানেরই আদর বেশী সেজন্য চর্বি ও নারিকেল তৈলের কাটতি ক্রমে বাড়িতেছে।

কলের তাঁতে বুনিবার পূর্বে সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় তাহার একটি প্রধান উপকরণ চর্বি। আমাদের দেশে তাঁতিরা নারিকেল

তৈল দেয়, কিন্তু মিলে চর্বিই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেও চর্বির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

লুচি কচুরি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় ঘি-এর ময়ান দেওয়া হয়, তাহার ফলে খাবার খাস্তা হয়, অর্থাৎ ময়দাপিণ্ডের চিমসা ভার দূর হয়। খাজা, ঢাকাই পরটা প্রভৃতিতে প্রচুর ময়ান থাকে, সেজন্য ভাজিবার সময় স্তরে স্তরে আলগা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঘি-এর বদলে তেলের ময়ান দেওয়া হয় তবে তত ভাল হয় না। চর্বি দিলে ঘি-এর চেয়েও ভাল হয়, অবশ্য সকলে সে পরীক্ষা করিতে রাজী হইবে না। বিলাতী বিস্কুটে এযাবৎ চর্বির ময়ান চলিয়া আসিতেছে। এদেশে যে 'হিন্দুবিস্কুট' প্রস্তুত হয় তাহা বিলাতীর সমকক্ষ নয়। ইহার প্রধান কারণ—নিপুণতার অভাব, কিন্তু চর্বির বদলে ঘি বা মাখন ব্যবহারও অন্যতম কারণ।

তৈল চর্বি ইত্যাদির যতরকম প্রয়োগ আছে তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন ঘনীকৃত তৈলের কথা পড়িব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন রসায়নবিৎ আবিষ্কার করেন যে নিকেল-ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায়, তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ার নিকেল অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে মাত্র, উৎপন্ন বস্তুর অঙ্গীভূত হয় না। উক্ত আবিষ্কারের পর বহু বিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বিশাল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

যে-কোনও তৈল এই উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে ঘৃতের তুল্য কোমল, চর্বির তুল্য ঘন, মোমের তুল্য কঠিন অথবা তদপেক্ষাও কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। সর্ষপ তৈল, নিম তৈল, এমন কি পূতিগন্ধ মাছের তৈল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন ঘন বস্তুতে পরিণত হয়।

Hydrogenated oil বা solidified oil বা ঘনীকৃত তৈল

এখন ইওরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে হলাণ্ড মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংলাণ্ডও ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। এতদিন চর্বি দ্বারা যে কাজ হইত এখন বহুস্থলে ঘনীভূত তৈল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যে সকল উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল পূর্বে অতি নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহাদেরও সদ্‌গতি হইতেছে।

রুটি-মাখন বিলাতের জনপ্রিয় খাদ্য। কিন্তু গরিব লোকে মাখনের খরচ যোগাইতে পারে না, সেজন্য 'মারগারিন' নামক কৃত্রিম মাখনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইহার উপাদান ছিল—চর্বি, উদ্‌ভিজ্জ তৈল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং ঈষৎ মাত্রায় পিষ্ট-গোস্তনের নির্যাস। শেষোক্ত উপাদান মিশ্রণের ফলে মারগারিনে মাখনের স্বাদ ও গন্ধ কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভাল মারগারিনে কিছু খাঁটি মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মারগারিন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে চর্বি ও স্বাভাবিক উদ্‌ভিজ্জ তৈল প্রায় থাকে না, তৎপরিবর্তে মাখনের তুল্য ঘনীকৃত তৈল্য দেওয়া হয়, কিছু অন্যান্য উপাদান পূর্ববৎ বজায় আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতি খাদ্যে পূর্বে মাখন দেওয়া হইত, এখন প্রায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে লাভ বাড়িয়াছে এবং বিকৃতির আশঙ্কাও কমিয়াছে। বিস্কুটেও ক্রমশ চর্বির বদলে ঘনীকৃত তৈল চলিতেছে, সেজন্য কোনও কোনও ব্যবসায়ী সগর্বে বলিতেছেন—তাঁহাদের জিনিস খাইলে হিন্দুমুসলমানের জাত যায় না। সাবান ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্মের উপযুক্ত অনেকপ্রকার ঘনীকৃত তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকেও তাহার প্রয়োগ শিখিতেছে।

এই নূতন বস্তুর ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইওরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে

দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—vegetable product' বা 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ'। ব্যবসায়িগণ প্রচার করিলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শন-স্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—বনস্পতি বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজ-কাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্বি ভেজাল দিবার দরকার হয় না, বনস্পতি-মার্কা মিশালেই চলে। সুদূর পল্লীতে অনেক গোয়ালার ঘরে খোঁজ করিলে এই জিনিসের টিন মিলিবে। ঘি ভেজালের প্রথম পর্ব এখন গোয়ালার ঘরেই নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু এত গুণ এত সুবিধা সত্ত্বেও এই দ্রব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউনসিলে এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ঘনীকৃত তৈলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম এই :

সপক্ষ বলেন—খাঁটি ঘি নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস। তাহার সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতেছি না। কিন্তু সকলের ঘি খাইবার সংগতি নাই। অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা তেল দিয়া তৈয়ারি করিলে ভাল হয় না, যথা লুচি, কচুরি, গজা, মিঠাই, চপ।

এই সকল দ্রব্য ভাজিবার জন্য বাজারের ভেজাল ঘি-এর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথচ নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিবে না কেন? ইহাতে ভাল ঘি-এর সুগন্ধ নাই সত্য, কিন্তু দুর্গন্ধও নাই, এমন কি কোনও গন্ধই নাই। ইহাতে খাবার ভাজিলে তেলেভাজা বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঘি-এ-ভাজা বলিয়াই ভ্রম হয়, অথচ বাজারের ঘি-এর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। ঘি-এর উপর ভারত-বাসীর যে প্রবল আসক্তি আছে তাহা অন্য তেলে মিটিতে পারে না, কিন্তু নির্গন্ধ ঘনীকৃত তৈলে বহুপরিমাণে মিটিবে। সাধারণ লোকের ঘি-এর উপর লোভ আছে কিন্তু পয়সা নাই, সেইজন্যই ভেজাল ঘি চলিতেছে। দূষিত চর্বিময় ভেজাল ঘি না খাইয়া নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল খাইলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা পাইবে। যদি ঘৃতের সুগন্ধ চাও, তবে ঘনীকৃত তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ঘৃত মিশাইয়া লইতে পার, বাজারের ঘি খাইয়া আত্মবঞ্চনা করিও না।

বিপক্ষ বলেন—ভেজাল ঘি খুবই চলে ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ঘনীকৃত তৈলের আমদানির ফলে ঐ ভেজাল বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িবে। ভেজাল ঘি-এ চর্বি চীনাবাদাম তৈল ইত্যাদির মিশ্রণ যত সহজে ধরা যায়, ঘনীকৃত তৈলের মিশ্রণ তত সহজে ধরা যায় না। যাহারা সজ্ঞানে বা চক্ষু মুদিয়া সস্তায় ভেজাল ঘি কেনে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা সাবধানতার ফলে এপর্যন্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই, এখন তাহারাও অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনিতেছে। মাখন গলাইলেও বিশ্বাস নাই কারণ তাহাতেও মারগারিন আকারে ঘনীকৃত তৈল প্রবেশ করিয়াছে। আর এক কথা—ঘৃতে ভাইটামিন আছে, ঘনীকৃত তৈলে নাই, অতএব ঘৃতের পরিবর্তে ঘনীকৃত তৈলের চলন বাড়িলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর, যতই বৃক্ষ লতা ফল ফুলের মার্কা দাও এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া প্রচার কর, উহা যে অতি

সস্তা মাছের তেল হইতে প্রস্তুত নয় তাহারই বা প্রমাণ কি? বিলাতী ব্যবসাদার মাত্রেই তো ধর্মপুত্র নয়। আরও এক কথা—ঘনীকৃত তেলে ঈষৎ মাত্রায় নিকেল ধাতু দ্রবীভূত থাকে, রাসায়নিকগণ তাহা জানেন। তাহাতে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানি হয় কিনা কে বলিতে পারে?

এই বিতর্ক লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। দূরদর্শী দেশহিতৈষী মাত্রই বুঝিবেন—বিদেশী ঘনীকৃত তৈল সর্বথা-বর্জনীয়। কেবল একটা কথা বলা যাইতে পারে—ভাইটামিনের অভাব জনিত আপত্তি প্রবল নয়। সাবধানে মাখন গলাইয়া ঘি করিলে ভাইটামিন সমস্তই বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের ঘি তৈয়ারির সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না, গোয়ালা ও আড়তদারের গৃহে বহুবার উন্মুক্ত কটাহে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহাতে ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হয়, অবশ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে। হালুইকরের কটাহে যে ঘি দিনের পর দিন উত্তপ্ত করা হয় তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন থাকে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না। মোট কথা, বাড়ির রান্নায় যে ঘি দেওয়া হয় তাহাতে ভাইটামিন থাকিতে পারে কিন্তু বাজারের ঘৃতপক্ব খাবারে না থাকাই সম্ভবপর। ইহাও বিবেচ্য—দেশের অধিকাংশ লোক ঘি খাইতে পায় না, রান্নায় তেলই বেশী চলে, এবং ঘি-এ যে ভাইটামিন থাকে তাহা তেলে নাই।

কিন্তু অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বিদেশী ঘনীকৃত তৈলের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি—ইহাতে ধর্মহানি হয়। এই ধর্ম গতানুগতিক অন্ধসংস্কার নয়, ভাইটামিনের ধর্মও নয়,—দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম। এই ধর্মবুদ্ধির উন্মেষের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে বিদেশী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হয় না, বৃদ্ধি পায় মাত্র। ঘি খাইবার পয়সা নাই, কিন্তু কোন্ দুঃখে বিদেশী তৈল খাইব? এদেশের স্বাভাবিক তৈল কি দোষ করিল? সর্ষপ তৈলের ঝাঁজ সব সময় ভাল না লাগে তো অন্য তৈল আছে। প্রাচীন ভারতে

'তৈল' শব্দে তিল ? তলই বুঝাইত, লোকে তাহাতেই রাঁধিত, বোম্বাই মান্দ্রাজ মধ্যপ্রদেশে এখনও তাহা চলে। ইহা স্নিগ্ধ, নির্দোষ, সুপচ। বাঙালীর নাক সিটকাইবার কারণ নাই। সর্ষপ তৈলের উগ্র গন্ধ আমরা সহিতে পারি, বাজারের কচুরি গজা খাইবার সময় ঘি-এর বিকৃতি গন্ধ মনে মনে মার্জনা করি, নির্গন্ধ ভেজিটেব্‌ল প্রডক্ট উত্তপ্ত হইলে দুর্গন্ধ হয় তাহাও জানি, তবে তিল চীনাবাদাম তৈলে অভ্যস্ত হইব না কেন? সাহেবের দেখাদেখি কাঁচা শাকে স্যালাড অয়েল মিশাইয়া খাই, তাহাতে কি গন্ধ নাই? অশ্বত্থামা পিটুলি-গোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। এজন্য বিদেশী 'উদ্‌ভিজ্জ-পদার্থ, অনাবশ্যক, লুচি, কচুরি ভাজার উপযুক্ত স্বদেশী উদ্‌ভিজ্জ তৈল যথেষ্ট আছে। নিমন্ত্রিত কুটুম্বকে ঠকানো হয়তো একটু শক্ত হইবে, কিন্তু দেশবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা পাইবে। যদি কলিকাতা ও অন্যান্য নগরের মিউনিসিপ্যালিটি চেষ্টা করেন তবে তিলাদি তৈলের প্রচার সহজেই হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুন্দরীমোহন দাস, রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভিষক্ মহোদয়গণ প্রবন্ধাদি দ্বারা সাধারণকে এবিষয়ে জ্ঞানদান করিতে পারেন। ময়রা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তৈলের অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈলের খাবার বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এইরকম খাবার ঘনীকৃত তৈলের অথবা খারাপ ঘি-এর খাবার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ঘি খাইব, অভাবে অজ্ঞাত-উপাদান ভেজাল দ্রব্য খাইব—লোকের এই মানসতার পরিবর্তন আবশ্যক। ঘি খাইব, না জুটিলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তৈল খাইব অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈল খাইব—ইহাই সদ্‌বুদ্ধি।

যদি ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় লোকের উদ্‌যোগে ঘনীকৃত তৈলের উৎপাদন হয় তবে ধর্মহানির আপত্তি থাকিবে না। যতদিন

তাহা না হয় ততদিন ক্ষমতায় কুলাইলে ঘি খাইব, অথবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম বা নারিকেল তৈল খাইব, অথবা ঘৃত ও তৈলে মিশাইয়া খাইব, রুচিতে না বাধিলে স্বদেশী চর্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।

১৩৩৭

ভাষা ও সংকেত

ভাষা একটি নমনীয় পদার্থ, তাকে টেনে বাঁকিয়ে চট্‌কে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম নরম জিনিসে কোনও পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্‌ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই। আলংকারিকের কথায় বলা যেতে পারে—পরিভাষার অভিধাশক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করিলে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু ভাষা আর পরিভাষাতেও সব সময় কুলয় না, তখন সংকেতের সাহায্য নিতে হয়। যিনি ইমারত গড়েন তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা বোধগম্য করতে পারেন না, তাঁকে নক্‌শা আঁকতে হয়। সে নক্‌শা ছবি নয়, সংকেতের সমষ্টি মাত্র—পুরনো গাঁথনি বোঝাবার জন্য হলদে রং, নূতন গাঁথনি লাল, কংক্রিটে হিজিবিজি, খিলানের জায়গায় ঢেরা-চিহ্ন, ইত্যাদি। বস্তুর সঙ্গে নক্‌শার পরিমাপগত সাম্য আছে, কিন্তু অন্য সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নেই। অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্‌শা বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তা প্রায় নিরর্থক ; বরং ছবি দেখলে বা বর্ণনা পড়লে সে কতকটা বুঝতে পারে।

গানের স্বরলিপিও সংকেত মাত্র। গান শুনলে যে সুখ, স্বরলিপি পাঠে তা হয় না, কিন্তু গানের স্বর তাল মান লয় বোঝাবার জন্যে স্বরলিপির প্রয়োজন আছে।

একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে যথাবৎ বোঝাবার সুপ্রয়োজ্য সংক্ষিপ্ত সস্তা উপায়—সংকেত। সংকেতের পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ যে জানে

তার পক্ষে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ধারণা করা অতি সহজ, তাতে ভুলের সম্ভাবনা নেই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নেই, শুধুই বিষয়ের বোধ। সংকেতের কারবার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত, হৃদয়ের সহিত নয়। অবশ্য, নায়ক-নায়িকার সংকেতের কথা আলাদ।

বিজ্ঞানী বহু প্রকার সংকেতের উদ্‌ভাবনা করেছেন। তিনি আশা করেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনেক উপলব্ধিই কালক্রমে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। একদিন হয়তো গানের স্বরলিপির তুল্য রসলিপি গন্ধলিপি স্পর্শলিপিও উদ্‌ভাবিত হবে, তখন আমরা দ্রাক্ষারসের স্বাদ, চুতমুকুলের গন্ধ, মলয়সমীরের স্পর্শ ফরমুলা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারব। শারদাকাশ ঠিক কি রকম নীল, সমুদ্রকল্লোলে কোন্ কোন্ ধ্বনি কত মাত্রায় আছে, তাও ছক-কাটা কাগজে আঁকাবাঁকা রেখায় দেখাব। এখন যেমন জুতো কেনবার সময় বলি ৮ নম্বর চাই, ভবিষ্যতে তেমনি সন্দেশ কেনবার সময় বলব—মিষ্টতা ৬, কাঠিন্য ২। হয়তো সুন্দরীর রং-এর ব্যাখান লিখব—দুধ ৩, আলতা ২, কালি ৫। তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হবে না, যা সত্য তাই সাংকেতিক বর্ণনায় অবধারিত হবে।

কবির ব্যবসায় কি উঠে যাবে? তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খল নমনীয়তা হিসাবী লোককে পদে পদে হয়রাণ করে তারই উপর কবির একান্ত নির্ভর। তিনি বিজ্ঞানীর মতন বিশ্লেষণ করেন না, প্রত্যক্ষ বিষয় যথাবৎ বোঝাবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষ ছাড়াও যে অনুভূতি আছে, যা মানুষের সুখ-দুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যার আশেপাশে মাথা ঠুকছে, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্বথা নমনীয় নির্বোধ ভাষাই তাঁর প্রকাশের উপাদান, তাতে ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন। পরিভাষা আর সংকেতে কবির কি হবে? তা ভাবের পিঞ্জর মাত্র।

আদিকবিকে নারদ বলেছেন—

—সেই সত্য যা রচিবে তুমি ;
ঘটে যা তা সব সত্য নহে ।—'

যাঁরা নিরেট সত্যের কারবারী তাঁরাও এখন মাথা চুলকে ভাবছেন —হবেও বা ।

১৩৩৮

সাধু ও চলিত ভাষা

কিছুকাল পূর্বে সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল এখন তা বড় একটা শোনা যায় না। যাঁরা সাধু অথবা চলিত ভাষার গোঁড়া, তাঁরা নিজ নিজ নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন, কেউ কেউ অপক্ষপাতে দুই রীতিই চালাচ্ছেন। পাঠকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন— বাংলা সাহিত্যের ভাষা পূর্বে এক রকম ছিল, এখন দু রকম হয়েছে।

আমরা শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে যে বাংলা শিখি তা সাধু বাংলা, সেজন্য তার রীতি সহজেই আমাদের আয়ত্ত হয়। খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় অধিকাংশ পুস্তকে প্রধানত এই ভাষাই দেখতে পাই। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধুভাষা এ দেশের সকল অঞ্চলে শিক্ষিতজনের অধিগম্য হয়েছে। কিন্তু চলিতভাষা শেখবার সুযোগ অতি অল্প। এর জন্য বিদ্যালয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না, বহুপ্রচলিত সংবাদপত্রাদিতেও এর প্রয়োগ বিরল। এই তথাকথিত চলিতভাষা সমগ্র বঙ্গের প্রচলিত ভাষা নয়, এ ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী কয়েকটি জেলার মৌখিকভাষার কিছু মিল আছে মাত্র। এই কারণে কোনও কোনও অঞ্চলের লোক চলিতভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা দুরূহ।

যোগেশচন্দ্র-প্রবর্তিত দুটি পরিভাষা এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করছি— মৌখিক ও লৈখিক। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিকভাষা আছে তা রাঢ়ের বা পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। চেষ্টা করলে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিকভাষার অনুরূপ ক'রে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমন হ'ক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালীর বোধ্য, অর্থাৎ সাহিত্যের

উপযুক্ত। এই লৈখিকভাষা 'সাধু' হতে পারে কিংবা 'চলিত' হতে পারে। কিন্তু যদি দুটিই কষ্ট ক'রে শিখতে হয় তবে আমার উপর অনর্থক জুলুম হবে। যদি চলিতভাষাই যোগ্যতর হয় তবে সাধুভাষার লোপ হ'লে হানি কি? সাধুভাষায় রচিত যেসব সদ্‌গ্রন্থ আছে তা না হয় যত্ন ক'রে তুলে রাখব। কিন্তু যে ভাষা অবাঞ্ছনীয় এখন আর তার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যদি সাধুভাষাতেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিদিত ভাষার পাশে আবার একটা অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করবার চেষ্টা কেন?

যাঁরা সাধু আর চলিত উভয় ভাষারই ভক্ত তাঁরা বলবেন, কোনওটাই ছাড়তে পারি না। সাধুভাষার প্রকাশশক্তি একরকম, চলিতভাষার অন্যরকম। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষার দুই ধারা স্বতস্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব ক'রে তার একটিকে গলা টিপে মারতে পারি না।

কোনও ব্যক্তি বা বিদ্বৎসংঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গ'ড়ে না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হ'তে পারে। অতএব সাধু আর চলিত ভাষার সমস্যায় হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিতভাষা আর পশ্চিম বঙ্গের মৌখিকভাষা সর্বাংশে সমান। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিকভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিকভাষা দেখে অর্থাৎ প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিকভাষার উচ্চারণই তার সর্বস্ব। লৈখিকভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই,

মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষা সর্বসাধারণের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হ'ক!

'ভাষা' শব্দটি আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। জাতিবিশেষের কথা ও লেখার সামান্য লক্ষণসমূহের নাম ভাষা, যথা—বাংলা ভাষা। আবার, শব্দাবলীর প্রকার (form)—অর্থাৎ কোন্ শব্দ বা শব্দের কোন্‌রূপ প্রয়োজ্য বা বর্জনীয় তার রীতিও ভাষা, যথা—সাধুভাষা। আবার, প্রকার এক হ'লেও ভঙ্গী (style)-র ভেদও ভাষা, যথা—আলালী, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা।

আলালী আর বঙ্কিমী ভাষা যতই ভিন্ন হ'ক, দুটিই যে সাধুভাষা তাতে সন্দেহ নেই। ভেদ যা আছে তা প্রকারের নয়, ভঙ্গীর। হুতোম প্যাঁচার নকৃশা আর রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র ভাষায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু দুটিই চলিত-ভাষায় লেখা ; প্রকার এক, ভঙ্গী ভিন্ন। আজকাল সাধু ও চলিত ভাষায় যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার লক্ষণাবলী তুলনা করলে এই সকল ভেদাভেদ দেখা যায় :

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানত—সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন'।

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্বনাম কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিকরূপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধুভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্বনাম আর ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা' চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এইরকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান পেয়েছে। 'আজিকালি,

চাউল, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, একচেটে, লতানে' চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ। কিন্তু সাধারণত চলিতভাষায় কিছু কম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফারসী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিতভাষায় কিছু বেশী দেখা যায়। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিকরূপ চলিতভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সে সকল শব্দের মূল রূপ চলিতভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যথা—'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন, অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে সাধুভাষা অতি ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে, কিন্তু চলিতভাষা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায়। সাধুভাষার এই মন্থর পরিবর্তনের কারণ—তার বহুদিনের নিরূপিত পদ্ধতি। চলিতভাষার যদৃচ্ছা বিস্তারের কারণ—নিরূপিত পদ্ধতির অভাব। একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে। যদি লৈখিকভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় নিরূপিত করতে পারা যায় তবে সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হবে, একই লৈখিক-ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস থেকে লঘুতম সাহিত্য পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারবে, বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে ভাষার ভঙ্গীর অদলবদল হবে মাত্র।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ অনিবার্য, কারণ লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয় কথাবার্তায় ততটা হ'তে পারে না। কিন্তু দুই ভাষার প্রকারগত ভেদ অস্বাভাবিক। কোনও এক অঞ্চলের মৌখিকভাষায় প্রকার আশ্রয় করেই লৈখিকভাষা

গড়তে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।

কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। 'মতো, ছিলো, কাল, করো' ইত্যাদি কয়েকটি রূপ নাহয় উচ্চারণসূচক (?) করা গেল, কিন্তু আরও শত শত শব্দের গতি কি হবে? বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি ও-কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা আর ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র। 'কাল' অর্থে কল্য বা সময় বা কৃষ্ণ, 'করে' অর্থে does কি having done, তার নির্ধারণ পাঠকের সহজবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসবে—অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উচ্চারণের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অনাবশ্যক। কলকাতার লোক যদি পড়ে 'রমণীর মোন', আর বরিশালবাসী যদি পড়ে 'রোমোণীর মঅন', তাতে সর্বনাশ হবে না, পাঠকের অর্থবোধ হ'লেই যথেষ্ট। লৈখিক-ভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিকভাষা হ'তে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।

মোট কথা, চলিতভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হ'তে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়। বহু লেখক যে আধুনিক চলিতভাষাকে দূর থেকে নমস্কার করেন তার কারণ কেবল অনভ্যাসের কুণ্ঠা নয়, তাঁরা এ ভাষার নমুনা দেখা পথহারা হয়ে যান। বিভিন্ন লেখকের মর্জি অনুসারে একই শব্দের

বানান বদলায়, একই রূপের বিভক্ত বদলায়, কভু বা বিশেষ্য সর্বনামের আগে অকারণে ক্রিয়াপদ এসে বসে, বাংলা শব্দাবলীর অদ্ভুত সমাস কানে পীড়া দেয়, ইংরেজী ইডিয়মের সজ্জায় মাতৃভাষা চেনা যায় না। সাধুভাষার প্রাচীন গণ্ডি ছেড়ে চলিতভাষায় এলেই অনেক লেখক অসামাল হয়ে পড়েন।

এমন লৈখিকভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিত জনের মৌখিকভাষা দুই-এরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাস-বদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিতভাষার লেখকরা একটু অবহিত হ'লেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে সব রকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।

এখন আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি ঃ

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হ'ক।

(৩) অন্যান্য অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হ'ক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্যে বা অন্ত্য অক্ষরে তার মৌলিকরূপই নেওয়া হোক, যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠান, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিতভাষায় অচল নয়—অর্থাৎ বিখ্যাত

লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না— এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধু-ভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '...হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দু-দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে—চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিতভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তকে যদি এই ভাষা চলে তবে তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণের আয়ত্ত হবে। ব্যাকরণ আর অভিধানে এই ভাষার শব্দাবলীর বিবৃতি দিতে হবে, অবশ্য সাধুভাষাকেও উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, সে ভাষার বহু পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকবে। কালক্রমে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা স্পেনসার শেকস্পিয়রের ভাষার তুল্য সমাদরে অধীত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল একরকম থাকবে না। শক্তিশালী লেখকগণের প্রভাবে পরিবর্তন আসবেই, এবং কালে কালে যেমন পঞ্জিকাসংস্কার আবশ্যক হয়, তেমনি যোগ্যজনের চেষ্টায় লৈখিকভাষারও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।

১৩৪০

বাংলা পরিভাষা

অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ—সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ সে শব্দও যদি প্রসঙ্গবিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষাস্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

সাধারণ লোকে কথাবার্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যালোচনার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সেসকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পরিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এসকল শব্দ অতিপরিচিত। বিলাতে একটা নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হ'ল, আবিষ্কর্তা তার পারিভাষিক নাম দিলেন 'অ্যালুমিনিয়ম'। বহুদিন এই নাম কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণায় আবদ্ধ রইল। এখন অ্যালুমিনিয়মের ছড়াছড়ি, কিন্তু নামের পারিভাষিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম ক্রোমিয়ম' প্রভৃতি নাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সৃষ্ট, সেজন্য পরিভাষা রূপে খ্যাত। 'লোহা তামা সোনা' প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা রূপে খ্যাত হবে। যে শব্দ সাধারণে আলগা ভাবে প্রয়োগ করে তাও পণ্ডিতগণের নির্দেশে পরিভাষা রূপে গণ্য হতে পারে। সাধারণ প্রয়োগে রুই পুঁটি চিংড়ি তিমি সবই

'মৎস্য'। কিন্তু পণ্ডিতরা যদি যুক্তি ক'রে স্থির করেন যে 'মৎস্য' বললে কেবল বোঝাবে—কান্‌কো-যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদণ্ডী অণ্ডজ (এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত) প্রাণী, তবে 'মৎস্য' নাম পারিভাষিক হবে এবং চিংড়ি তিমিকে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে মৎস্য বলা চলবে না।

বিদ্যাচর্চায় যত পরিভাষা আবশ্যক, সাধারণকাজে তত নয়। কিন্তু জনসাধারণেও নূতন নূতন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে সেজন্য বহু নূতন পারিভাষিক শব্দ অবিদ্বানেও শিখছে। যে জিনিস সাধারণের কাজে লাগে তার নাম লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সে নাম একবার শিখলে লোকে সহজে ছাড়তে চায় না। পণ্ডিতরা যদি নূতন নাম চালাবার চেষ্টা করেন তবে সাধারণের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। বাংলা পরিভাষা সংকলনকালে এই বাধার কথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হ'ক আর নিম্নই হ'ক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যত দিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে তত দিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হ'ত, রাজভাষা যদি বাংলা হ'ত বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হ'ত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলাণ্ডে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। এদেশে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হয় তা অতি অল্প, যা হয় তার সংবাদ ইংরাজীতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলিত হ'লেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শব্দ। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়ে একটা বাংলা

পরিভাষার ফর্দ মেনে নিতে পাবেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করতে পারেন যে তাঁদের পুস্তকে প্রবন্ধে ভাষণে বিলাতী শব্দ বর্জন করবেন (অবশ্য চাকরির কাজে তা পারবেন না)। কিন্তু পরিভাষাদ্বারা সূচিত দ্রব্য যদি বিদেশ থেকে আসে এবং সাধারণের ব্যবহারে লাগে, তবে নূতন নাম চালানো কঠিন হবে। বিদেশ থেকে আয়োডিন আসে, প্রেরকের চালানে ঐ নাম লেখা থাকে ; দোকানদার ঐ নামেই বেচে —তাকে 'এতিন' বা 'নীলিন' শেখানো অসম্ভব। তার মারফত জনসাধারণেও ইংরেজী নাম শেখে। যাঁরা মাতৃভাষায় বিদ্যাবিতরণে অগ্রকর্মী হবেন তাঁদের পক্ষেও দেশী নামে নিষ্ঠা বজায় রাখা শক্ত হবে। তাঁরা বিদ্যা অর্জন করবেন ইংরেজী পরিভাষার সাহায্যে আর প্রচার করবেন বাংলা পরিভাষায়—এই দ্বৈভাষিক অবস্থা সহজ নয়। তাঁদের নানা ক্ষেত্রে স্খলন হবে। যাদের শিক্ষার জন্য দেশী পরিভাষার সৃষ্টি তারা যদি ইংরেজী নাম ছাড়তে না চায় তবে শিক্ষকও বিদ্রোহী হবেন। বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সংকলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।

সাধারণে 'আয়োডিন, অক্সিজেন, মোটর, কার্বুরেটর, কলেরা, ভ্যাকসিন' প্রভৃতি শব্দ অভ্যস্ত হয়েছে, এগুলির বাংলা নাম চলবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু কয়েকটি নবরচিত বাংলা শব্দের চলন সহজেই হয়েছে, যথা—'উড়োজাহাজ বেতারবার্তা, আবহসংবাদ'। কতকগুলি বিকট শব্দও চলছে, যেমন 'আইন-অমান্য-আন্দোলন'। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সত্ত্বেও 'বাধ্যতামূলক' প্রবল প্রতাপে চলেছে। এই প্রচলন খবরের কাগজের দ্বারা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রচারে এ সাহায্য মিলবে না। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে প্রবন্ধে যদি একই রকম পরিভাষা গৃহীত হয়, তবে প্রচার অনেকটা সহজ হবে।

এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হয়ে আসছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহীত হয়েছে, 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পারিভাষা রচনা করেছেন। এই সকল পরিভাষা প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ, অথবা সংকলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। এপর্যন্ত আয়োজন যা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু ভোক্তা বিরল। তার একটি কারণ—একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে কিন্তু কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তার নির্বাচন হয় নি। সংকলয়িতা নিজের রচনায় তাঁর পছন্দমত শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু সাধারণ লেখক দিশাহারা হয়। আর এক কারণ—সংগ্রহ বৃহৎ হ'লেও অসম্পূর্ণ। সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ—ইংরেজী পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

আজকাল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ যে ভঙ্গীতে লেখা হয় তা লক্ষ্য করলে আমাদের বাধা কোথায় আর সিদ্ধি কোন্ পথে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

(গ্রামোফোন-রেকড)। 'Master-টি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক grove-এর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে Electroplate করিয়া ইহার উপর Coper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাপ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। Master-এর music lines তখন এই Copy-র উপর উঠিয়া আসে। এই Copy-কে Original বলা হয়।

লেখক পরিশেষে বলেছেন—'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইলস্-এর মধ্যে যাই নাই।' যান নি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ইনি ভাষার দৈন্যের প্রতি দৃকপাত করেন নি, যেমন-তেমন উপায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আর একটি নমুনা দিচ্ছি। প্রবন্ধ

আমার কাছে নেই, কিন্তু নামটি কণ্ঠস্থ আছে, তা থেকেই রচনার পরিচয় হবে—

'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতীলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া'।

এই লেখক তাঁর বক্তব্য বোধগম্য করবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন, বিভীষিকা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইনি নবলব্ধ পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরত করেছেন মাত্র। একজন প্রথিতনামা মনীষীর রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

'মণিসমূহের নিয়ত সংস্থান অসংখ্যপ্রকার? কিন্তু তৎসমুদায়কে ছয়টি মূল সংস্থানে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই ছয় মূল সংস্থানের প্রত্যেক দ্বিবিধ,—স্তম্ভাকার (prismatic) এবং শিখরাকার (pyramidal)। এই সকল সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত মণির মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে। কোন নিয়তাকার মণির দুই বিপরীত স্থানকে মনে মনে কোন রেখা দ্বারা যোগ করিলে তাহার অক্ষরেখা পাওয়া যায়। যথা, দুই বিপরীত কোণ, কিংবা দুই বিপরীত পার্শ্বের মধ্যস্থল, কিংবা দুই বিপরীত ধারের মধ্যস্থল।'

লেখকের বক্তব্য অনধিকারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল তাতে-সন্দেহ নেই। একজন লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনার নমুনা—

'রুমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে, বা সেই পদার্থ রেডিয়মের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হয়...বেশী কিছু নয়, কোন পদার্থ একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হইতে থাকে।'

এই লেখক ইংরেজী শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তথাপি মাতৃভাষার জাতিনাশ করেন নি।

বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষা সংকলন একটি বিরাট কাজ,

তার জন্য অনেক লোকের চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু এই চেষ্টা সংঘবদ্ধ ভাবে একই নিয়ম অনুসারে করা উচিত, নতুবা পরিভাষার সামঞ্জস্য থাকবে না। প্রথম কর্তব্য—সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে নানা দিক থেকে দেখা, তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, উপায় স্থির করাও হয়তো সহজ হবে। এই প্রবন্ধে কেবল সেই দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করব।

সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

বিশেষ (individual)। যথা—সূর্য, বুধ, হিমালয়।

দ্রব্য (বস্তু, substance, অথবা সামগ্রী, article)। যথা—কাষ্ঠ, লৌহ, জল ; দীপ, চক্র, অরণ্য।

বর্গ (class)। যথা—ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।

ভাব (abstract idea)। যথা—গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।

বিশেষণ (adjective)। যথা—তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।

ক্রিয়া (verb)। যথ—চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ অনুসারে দ্রব্য বর্গ বা বিশেষণ বাচক হ'তে পারে। কতকগুলি শব্দ কোন্ শ্রেণীতে পড়ে স্থির করা কঠিন, যেমন—দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র।

দেখা যায় যে এক এক শ্রেণীর শব্দ কোনও বিদ্যায় বেশী দরকার কোনও বিদ্যায় কম দরকার। জ্যোতিষে ও ভূগোলে বিশেষবাচক শব্দ অনেক চাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় খুব কম, অথবা অনাবশ্যক। দ্রব্যবাচক শব্দ রসায়নে অত্যন্ত বেশী, জীববিদ্যায় (botany, zoology, anatomy ইত্যাদিতে) কিছু কম, মণিকবিদ্যায় (mineralogy) আর একটু কম, পদার্থবিদ্যা (physics) ও ভূবিদ্যায় (geology) আরও কম, দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রায় নেই, গণিতে মোটেই নেই। বর্গবাচক শব্দ জীববিদ্যায় খুব বেশী, রসায়ন

ও মণিকবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য বিদ্যায় আরও কম। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দ সকল বিদ্যাতেই প্রায় সমান। সকল বিদ্যার পরিভাষা যদি একযোগে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে মোটের উপর দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, তার পর যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়া-বাচক এবং বিশেষবাচক শব্দ।

ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সম্মুখে রেখেই সংকলয়িতাকে কাজ করতে হবে, অতএব ইংরেজী পরিভাষার স্বরূপ বিচার করা কর্তব্য, তাতে উপায়ের সন্ধান মিলতে পারে। ইংরেজী পরিভাষা জাতি (origin) অনুসারে এইরূপে ভাগ করা যেতে পারে—

a. সাধারণ ইংরেজী শব্দ। যথা—iron, solid।

b. প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ। যথা—lesion, canyon, breccia, typhoon, totem।

c. গ্রীক লাটিন (আরবী সংস্কৃত· বিরল) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ। যথা—atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate।

d. কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ। যথা—glycerine, methanol, aniline, farad।

ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়—যেখানে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা নেই সেখানে c d-র সঙ্গে সঙ্গে a b অবাধে চলে। কিন্তু যেখানে স্পষ্টতর নির্দেশ বা সংক্ষেপ আবশ্যক, সেখানে a শব্দ প্রায় চলে না, তৎস্থানে c d প্রযুক্ত হয় এবং b কিছু কিছু চলে। যথা iron implements, iron salts, spirit of wine, knee-cap, shedding of leaves ; অথচ ferrous (বা ferric) sulphate, alcohol metabolism, patellar fracture, deciduous leaves।

বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলনকালে নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

ক। সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ। হিন্দী-উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

গ। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ববর্ণিত a b c d)।

ঘ। প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ। মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্নজাতীয় শব্দ।

পরিভাষা যদিও মুখ্যত বাঙালীর জন্য সংকলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষত হিন্দী উড়িয়া মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য বা সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে। পূর্বোক্ত c d শব্দাবলী সকল ইওরোপীয় ভাষায় চলে। ভারতের পক্ষে গ ঘ-এর সেইরূপ উপযোগিতা আছে।

আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে গ্রীক লাটিনের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতে সম্বন্ধ অনেক বেশী। সেজন্য এদেশে সংস্কৃত পরিভাষা (ঘ) সহজেই মর্যাদা পাবে। ইংরেজী পরিভাষার (গ) উপযোগিতাও কম নয়, তার কারণ পরে বলছি। এই দুই জাতীয় পরিভাষার পরেই সাধারণ বাংলা শব্দের (ক) স্থান। এরকম শব্দ সাধারণ বিবৃতিতে অবাধে চলবে, যেমন ইংরাজীতে a চলে। তারপরে খ-এর, বিশেষত হিন্দী-উর্দু শব্দের স্থান; কারণ, হিন্দী-উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার প্রতিবেশী, এবং ভারতের বহু অঞ্চলে বোধ্য। বাংলায় ফারসী আরবী শব্দ অনেক আছে। যদি উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে আরও কিছু ফারসী আরবী আত্মসাৎ করলে হানি নেই। পরিশেষে মিশ্র শব্দের (ঙ) স্থান। এরূপ শব্দ কিছু কিছু দরকার হবে।

যদি 'focus' বাংলায় নেওয়া হয়, তবে focussed = ফোকসিত, longfocus = দীর্ঘফোকস।

বাংলা পরিভাষা সংকলনের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিযোগিতা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র বাধ্য হয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশী পরিভাষা শিখবে। যিনি বিদ্যালয়ের শাসনে নেই অথচ বিদ্যাচর্চ্চা করতে চান, তাঁর যদি মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকে তবে তিনি কিছু কষ্ট স্বীকার ক'রেও দেশী পরিভাষা আয়ত্ত করবেন। কিন্তু জনসাধারণকে বশে আনা সহজ নয়। বিদ্যা মাত্রের যে অঙ্গ তত্ত্বীয় (theoretical), তার সঙ্গে সাধারণে বিশেষ যোগ নেই। বিদ্যার যে অঙ্গ ব্যবহারিক (applied), সাধারণে তার অল্পাধিক খবর রাখে। তত্ত্বীয় অঙ্গে দেশী পরিভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ জনসাধারণের রুচির বসে চলতে হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক অঙ্গের সহিত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণ লোকে পথে হাটে বাজারে কর্মস্থানে যে বিদেশী শব্দ শিখবে তাই চালাবে, এর উদাহরণ পূর্বে দিয়েছি। এই বাধা লঙ্ঘন করা চলবে না, ব্যবহারিক অঙ্গে বহু পরিমাণে বিদেশী শব্দ মেনে নিতে হবে।

মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা-সংকলন পণ্ড হবে। পরিভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য—বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশশক্তি বর্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এনিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না। বহু বৎসর পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্যশালিনী আর্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্‌মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের

সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০১)।

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোর্তুগিজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন ক'রে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেট্‌ফুল হয়েছে' তবে ভাষাজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্‌নেটোটা বেশ ফিন্‌কি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইওরোপ আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদান প্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত ক'রে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর যে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজী প'ড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ ক'রে 'যাচ্ঞা'কে 'যাচিঙ্গা', 'জনৈক'কে 'জনৈক, 'মোটর'কে 'মটোর 'গ্লিসারিন'কে 'গিল্‌ছেরিন' বলে তাতে ক্ষতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।

এখন সংকলনের উপায় চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের উপকরণ—এক দিকে দেশী শব্দ, অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ইত্যাদি; অন্যদিকে ইংরেজী শব্দ। কোথায় কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য? ধরাবাঁধা বিধান দেওয়া অসম্ভব। মোটামুটি পথনির্ণয়ের চেষ্টা করব।

১। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে কতকগুলি বিদ্যার চর্চা আছে, যথা—দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা, প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা এখনও প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়া যাবে এবং সেই উদ্ধারকার্য অনেকে করেছেন। এই সমস্ত শব্দ আমাদের সহজেই গ্রহণীয়। এই শব্দসম্ভারের সঙ্গে আরও অনেক নবরচিত সংস্কৃত শব্দ অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বর্গ ঘাত (power) প্রভৃতি প্রাচীন শব্দের সঙ্গে নবরচিত কলন (calculus), অবঘাতন (evolution), উদ্‌ঘাতন (involution) সহজেই চলবে। বর্তমান কালে এই সকল বিদ্যার বৃদ্ধির ফলে বহু নূতন পরিভাষা ইওরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার অনেকগুলির দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত রূঢ় (যেমন focus, thyroid) তা যথাবৎ বাংলা বানানে নেওয়াই উচিত।

২। কতকগুলি বিদ্যা আধুনিক, অর্থাৎ পূর্বে এদেশে অল্পাধিক চর্চিত হ'লেও এখন একবারে নূতন রূপ পেয়েছে, যথা—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, খনিকবিদ্যা, জীববিদ্যা। এইসকল বিদ্যার জন্য অসংখ্য পরিভাষা আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন ক'রে গড়তে হবে, পাওয়া গেলে কিছু কিছু হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকেও নিতে হবে; অধিকন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ রাশি রাশি আত্মসাৎ করতে হবে।

৩। বিশেষবাচক শব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে, যেমন—'চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য'। যে নাম অর্বাচীন

কিন্তু বহুপ্রচলিত, তাও থাকবে, যেমন—'প্রশান্ত মহাসাগর'। কিন্তু অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজী নামই গ্রহণীয়, যথা—'নেপচুন, আফ্রিকা, আটলান্টিক'।

৪। দ্রব্যবাচক শব্দের যদি দেশী নাম থাকে, তো রাখব, যেমন—'স্বর্ণ লৌহ' বা 'সোনা লোহা'। যদি না থাকে তবে প্রচুর ইংরেজী নাম নেব। বৈজ্ঞানিক বস্তু যে নামে পরিচিত, সেই নামই বহু পরিমাণে আমাদের মেনে নিতে হবে। রাসায়নিক ও খনিজ বস্তু এবং যন্ত্রাদি (যথা—মোটর, এঞ্জিন, পাম্প, স্কেল, লেন্স, থার্মমিটার, স্টেথস্কোপ) সম্বন্ধে এই কথা খাটে। রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তালিকায় স্বর্ণ লৌহ গন্ধক প্রভৃতি নামের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ক্লোরিন সোডিয়ম থাকবে। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণ-ই লিখব, ইংরেজী বর্ণমালা আমাদের অপরিচিত নয়। সাধারণত লিখব—'লৌহ কঠিন, পারদ তরল। লেখবার কালি তৈয়ার করতে হিরাকস লাগে'। কিন্তু দরকার হ'লেই নির্ভয়ে লিখব—'ফেরস সালফেট অর্থোডাইক্লোরোবেনজিন, ম্যাগনিসাইট, রুমকর্ফ কয়েল, ইলেকট্রন।' শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছেন। কিন্তু সে পরিভাষা কল্পান্তেও চলবে না। 'অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট'-এর চেয়ে মণীন্দ্রবাবুর 'অন্তমনসশুল্বভাস্ফেত' কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর বা সুবোধ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—'ভাষা মূলে সংকেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ়-অর্থ-বাচক সংকেত হিসাবেই গ্রহণ করব এবং তার প্রয়োগবিধি শিখব। যাঁর কৌতূহল হবে তিনি 'অক্সিজেন, আন্টিমনি' প্রভৃতি নামের বুৎপত্তি খোঁজ করবেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে রূঢ় অর্থের জ্ঞানই যথেষ্ট। জীববিদ্যাতেও ঐ নিয়ম। 'কাষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে; 'প্রোটোপ্লাজম, হিমোগ্লোবিন, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।

৫। বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে, যথা—'ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ'।

কিন্তু যেখানেই শব্দ রচনা কঠিন হবে সেখানে বিনা দ্বিধায় ইংরেজী নাম নেওয়া উচিত। বোধ হয় বর্গের উচ্চতর অঙ্গে (element, compound, phylum, order, genus, species, endogen) দেশী নাম অনায়াসে চলবে। কিন্তু নিম্নতর অঙ্গে বহুস্থলে ইংরেজী নাম মেনে নিতে হবে, যেমন—'হাইড্রোকার্বন, অক্সাইড, গোরিলা, হাইড্রো, ব্যাকটিরিয়া'।

৬। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হ'তে পারবে। Survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী প্রতিশব্দ সহজে চলবে। কিন্তু রূঢ় শব্দ ইংরেজীই নিতে হবে, যথা—'গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড।'

বহুস্থলে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত (cognate) আরও কয়েকটি শব্দ নিতে হবে। 'ফোকস, ফিনল, অক্সাইড, মিটার'-এর সঙ্গে 'ফোকাল, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক' চলবে। ছাপাখানার ভাষায় যেমন 'কম্পোজ করা' চলেছে, রাসায়নিক ভাষায় তেমনি 'অক্সিডাইজ' করা চলবে।

৭। বাংলায় (বা সংস্কৃতে) কতকগুলি পরিভাষিক শব্দ আছে যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা—শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ (winged insect) উদবৃত্ত (circle cutting equinoctial at right angles), ছায়া (both shadow and transmitted light), উপাঙ্গ (limb of a limb)। পরিভাষার তালিকার এই সকল শব্দকে সযত্নে স্থান দিতে হবে।

৮। দেশী পরিভাষা নির্বাচনকালে সর্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা (range of meaning) যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্থলবিশেষে দেশী শব্দের অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার বা সংকোচ থাকে তবে ক্ষতি হবে না—যদি সংজ্ঞার্থ (defi-

nition) ঠিক থাকে। প্রসার, যথা—অঙ্গুলি = finger ; toe। সংকোচ, যথা = fluid—তরল ; বায়ব।

৯। বিভিন্ন বিদ্যার প্রয়োগকালে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থ-ভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরাজীতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভাল ; কারণ বাংলা আর ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যথা—sensitive (mind, balance, photographic plate)। Sensitive শব্দের সমান ব্যঞ্জনা (connotation) বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করাই ভাল। পক্ষান্তরে এমন বাংলা শব্দও আছে যার সমান ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট ইংরেজী শব্দ নেই, যেমন—'বিন্দু' = drop ; point ; spot। এস্থলে ইংরেজীর বশে একাধিক শব্দ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য বা গৌণ ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁহাদের কাছে আর একটি নিবেদন জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। সংকলনের ভার যাঁদের উপর, তাঁহাদের কিরকম যোগ্যতা থাকা দরকার ? বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যার বিশারদ বহু লোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দি-উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। যদি কোনও হিন্দিভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকেন তবে আরও ভাল হয়। সর্বোপরি আবশ্যক এমন লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করতে পারেন, বিশেষত সংকলিত সংস্কৃত শব্দের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে যাঁরা পরিভাষা সংকলন করেছেন তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত এবং অনেকে একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী। তথাপি বিভিন্ন সংকলয়িতার নৈপুণ্যের তারতম্য বহুস্থলে সুস্পষ্ট। Columar, vitreous,

adamantine-এর প্রতিশব্দ একজন করেছেন—'স্তম্ভনিভ, কাচনিভ' হীরকনিভ'। আর একজন করেছেন—'স্তাম্ভিক, কাচিক, হৈরিক'। শেষোক্ত শব্দগুলিই যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত শব্দের মধ্যে কোনটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য তার বিচারের ভার সাধারণের উপর দিলে চলবে না ; সংকলন-সমিতিকেও তা করতে হবে। এ নিমিত্ত যে বৈদগ্ধ আবশ্যক তা সমিতির প্রত্যেক সদস্যের না থাকতে পারে, কিন্তু কয়েকজনের থাকা সম্ভব। অতএব, পরিভাষাসংকলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হ'লেও শেষ নির্বাচন মিলিত সমিতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৩৪০

সাহিত্যবিচার

মানুষের মন একটি আশ্চর্য যন্ত্র। কোন্ আঘাতে এ যন্ত্র কিরকম সাড়া দেয় তা আমরা অল্পই জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্যাম খেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্যাম খুশী হয়ে গেল। মনের এই রকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল বিশেষকে উদ্দেশ না ক'রে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ কোন্ গুণ থাকলে সাধারণে খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চা-এর দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয়নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁর সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন—এই চা দু-টাকা পাউণ্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এইরকম বিচার করেন তা নিজেই বলতে পারেন না। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিদত্ত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্‌টারের পদ লাভ করেন এবং চা ব্যবসায়ী তাঁর যাচাইকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে

নেয়। তিনি যদি বলেন এই চা-এর চেয়ে ঐ চা ঈষৎ ভাল তবে দু-দশ জন সাধারণ লোক হয়তো অন্য মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি ঐ দুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্‌টারের অনুবর্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্‌টারের সহিত তুলনীয়। টি-টেস্‌টারের লক্ষণ—স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বিদগ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ—সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের জন্য এই রচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হ'তে পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করিবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে, কারণ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং সব ক্ষেত্রে নয়), তবে তিনি হয়তো আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলংকারশাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করবেন, বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে হয়তো শ্রোতা অনেক নূতন জিনিষ শিখবে কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সংগীতের রস বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরম্পরায় জেনে এসেছি যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায়, কিন্তু কিজন্য এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের শ্রুতিযন্ত্রে কতক-গুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ব্যাঘাত হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আরও জানা যায়

তবে হয়ত সংগীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যত দিন তা না হয় তত দিন সংগীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট। সুললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কাম্য, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন। এই সমস্ত ঝাপসা কথার রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনার বিষয় আমরা কিছুই জানি না! যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য, তার কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আনুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার খণ্ডন, অস্ফুট অনুভূতির পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্ধন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি। এইসকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরোধী, কতকগুলি নীতিবিরোধী। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অম্ল মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ সাহিত্যিকও সেই রকম করেন। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লঙ্কা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রসুন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শান্তরস বা বীভৎসরস, তত্ত্বকথা বা দুর্নীতি বরদাস্ত হবে, এসবের নির্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েকজন ভোক্তার হয়তো বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম ব'লে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান করেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্য পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশ-

খোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা ; এবং যিনি অন্যের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি ক'রে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে করে এবং সমাজ তাতে আপত্তি করে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার তুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যভিচারও উপভোগ্য ও ক্ষমার্হ গণ্য হয়। মজা পাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুধীজন এবিষয়ে স্বভাবত অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাই-এর নিক্তি আর কষ্টিপাথর কিরকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিতজন সাধারণত তাঁর মতেই মত দেয়।

১৩৪১

খ্রীষ্টীয় আদর্শ

মিত্ররাষ্ট্রসংঘ কোন্ মহাপ্রেরণায় এই যুদ্ধে লড়ছেন তার বিবরণ মাঝে মাঝে ব্রিটিশ নেতাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। তাঁরা অনেক-বার বলেছেন—আমাদের উদ্দেশ্য Christian Ideal-এর প্রতিষ্ঠা। বহু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষে আছে, যেমন চীন, ভারত, মিসর, আরব। রাশিয়ার কর্তারাও খ্রীষ্টধর্ম মানেন না। এই খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রতিবাদ সম্প্রতি বিলাতের মুসলমানদের তরফ থেকে হয়েছে। কিন্তু তার ঢের আগে ব্রিটিশ যুক্তিবাদী আর নাস্তিক সম্প্রদায় তাঁদের আপত্তি প্রবল ভাবে জানিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বললে যদি খ্রীষ্টের উপদেশ বোঝায় তবে তাতে এমন কি নূতন বিষয় আছে যা তাঁর আগে কেউ বলে নি? ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে কি নীতিবাক্য নেই? বিলাতে আমেরিকায় রাশিয়ার যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম মানেন না তাঁদের কি উচ্চ আদর্শ নেই? 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' কথাটিতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। এখন ব্রিটিশ নেতারা আমতা আমতা ক'রে বলছেন—আমাদের কোনও কুমতলব নেই, তোমাদেরও উচ্চ আদর্শ আছে বই কি, সেটা খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে খাটো তা তো বলি নি, তবে কিনা 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' বললে তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই উচ্চতম ধর্মনীতি এসে পড়ে? প্রতিবাদীরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শের অন্য একটা মানে থাকতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন না, যীশু খ্রীষ্টও খ্রীষ্টান ছিলেন না। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বহুকাল

ধ'রে ধর্মসম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে এবং পরিবর্তনও ক্রমান্বয়ে হ'তে থাকে। অবশেষে মঠধারী, প্রচারক, পুরোহিত এবং লোকাচার দ্বারাই ধর্ম শাসিত হয়, এবং যাঁরা আদিপ্রবর্তক তাঁরা সাক্ষিগোপাল মাত্র হয়ে পড়েন। বিলাতেও তাই হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানে খ্রীষ্টকথিত মার্গ নয়, আধুনিক প্রোটেস্টাণ্ট ধনিসমাজের আদর্শ। সে আদর্শ কি? গত দু-শ বৎসরের মধ্যে বিলাতে যে সমৃদ্ধি হয়েছে তার কারণ প্রোটেস্টাণ্ট সমাজের উদ্যম। এই সমৃদ্ধির কারণ অবশ্য প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম নয়, যেমন এদেশের পারসী জাতি জরথুস্ত্রীয় ধর্মের জন্যই ধনী হন নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁরা বিস্তার করেছেন এবং নিজের দেশে যাঁরা বড় বড় কারখানার পত্তন ক'রে দেশ-বিদেশে মাল চালান দিয়ে ধনশালী হয়েছেন, দৈবক্রমে তাঁরা প্রোটেস্টাণ্ট—বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ডের অ্যাংলিক্যান এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবিটেরিয়ান সমাজ। ধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক শক্তি আসে, সেজন্য এই দুই সমাজই বিলাতে প্রবল। এঁরা চার্চের পোষক, চার্চও এঁদের আজ্ঞাবহ। গীতায় আছে—'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত কর, ঐ দেবগণও তোমাদের তৃপ্ত করুন; পরস্পরকে তৃপ্ত ক'রে পরম শ্রেয় লাভ কর। বিলাতের দেবতা বিলাতবাসীকে ঐশ্বর্যদানে তৃপ্ত করেছেন, বিলাতের লোকেরাও তাঁদের যাজকসংঘকে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে তৃপ্ত করে থাকেন। কিন্তু শুধু তৃপ্ত করেন না, পরোক্ষভাবে হুকুমও চালান। পার্লিমেণ্ট যেমন ধনীর করতলস্থ, চার্চও সেইরকম। পাদ্রীরা যথাসম্ভব ধনীর ইঙ্গিতে চলেন, অবাধ্য রাজাকে সরাবার বিধান দেন, কমিউনিস্টদের শয়তানগ্রস্ত ব'লে প্রচার করেন, অসহিষ্ণু দরিদ্রকে স্বর্গরাজ্যের আশ্বাস দিয়ে শান্ত রাখবার চেষ্টা করেন, অধীন দুর্বল জাতিদের চিরস্থায়ী হেপাজত সমর্থন করেন। আমাদের দেশেও ধনী আর পুরোহিতের মধ্যে একটু ঐরকম সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ধর্মের ভেদ এখানে বেশী, রাজ-

সাহায্যও নেই, তাই 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' ব্যাপারটা দেশব্যাপী হয়নি।

যে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এতটা শ্রীবৃদ্ধি জড়িত তার নামেই যে ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর আদর্শ ঘোষিত হবে তা বিচিত্র নয়। কিন্তু নূতন ক'রে আদর্শ খ্যাপনের কারণ এ নয় যে পূর্বের আদর্শ ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। কথাটা বিদেশীকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি, বৃটিশ জাতিরই আত্মপ্রসাদ রক্ষার জন্য বলা হয়েছে, যাতে এই বিপৎকালে কারও মনে গ্লানি বা বৈরাগ্য না আসে। এই আদর্শের আন্তরিক অর্থ— যে উত্তম ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত ইওরোপ এশিয়া আফ্রিকায় চ'লে এসেছে তাই কিঞ্চিৎ শোধনের পর পাকা করা। আদর্শটা ধূমাচ্ছন্ন স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করা যায় না, সেজন্য একটা পবিত্র বিশেষণ আবশ্যক। আমাদেরও অনেক ক্ষুদ্র আদর্শ আছে, এক কথায়—আমরা রামরাজ্য চাই। বিলাসী ধনী তাতে বোঝেন—তাঁর ন্যস্ত সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে, দারজিলিং সিমলা বিলাত সুগম হবে, হীরে জহরত সিল্ক সাটিন পেট্রল 'সার'-উপাধি সুলভ হবে, গৃহিণী পুত্র কন্যারা দু-খানা মোটরেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতি নিরীহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বোঝেন —তাঁর রোজগার বজায় থাকবে, ট্যাক্স বাড়বে না, দোকানদার সস্তায় জিনিসপত্র দেবে, চাকর কম মাইনের কাজ করবে, ছেলে-মেয়েরা আইন লঙ্ঘন বা বিয়ের আগে প্রেম করবে না। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বা আমাদের অতি ক্ষুদ্র আদর্শ যতই প্রচ্ছন্ন হ'ক, তার মানে —যা আছে বা ভূতপূর্ব তাই কায়েম করা বা আরও সুবিধাজনক করা। কিন্তু আমাদের একটা বড় আদর্শও আছে—স্বাধীনতা, যা অভূতপূর্ব, যার খসড়াও তৈরি হয় নি, শুধু নামটিই সম্বল। সুতরাং কিছু উহ্য না রেখেই আমরা সে আদর্শ ঘোষণা করতে পারি, ভাবী স্বরাজকে রামরাজ্য বা ধর্মরাজ্য বলবার দরকার নেই।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ যাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের মধ্যে রাশিয়া আছে। সেদিন পর্যন্ত রাশিয়া অর্ধশত্রু ছিল, এখন পরমমিত্র।

কিন্তু রাজনীতিক মৈত্রী আর বারবনিতার প্রেম একজাতীয়। যখন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার সময় আসবে তখন সাম্যবাদী মিত্র কি বলবে? হয়তো বলবে—ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য নিয়ে যা খুশি করুক, আমরা নিজের দেশ আগে সামলাই। হয়তো ব্রিটেন সেই ভরসাতেই নিজের আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে।

১৩৪৯

ভাষার বিশুদ্ধি

মৃতভাষা যদি দৈবগতিকে জীবিত সমাজের সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয় তবে তাতে নিয়মের বন্ধন সহজেই পড়ে। প্রাচীন লেখকদের রীতি এবং তদনুসারে সংকলিত ব্যাকরণ আর অভিধানের শাসন এরকম ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, বেশী বিকার ঘটতে দেয় না, এমন ভাষা কেবল পণ্ডিতদের ভিতরেই চলতে পারে এবং অশুদ্ধির ভয়ে লেখকগণকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। জনসাধারণ সে ভাষার কৌশল বোঝে না, সেজন্য তাতে হস্তক্ষেপ ক'রে বিকৃত করে না, জীবন্ত প্রাকৃত ভাষাতেই তাদের স্থূল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় যুগের আদিতে দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের বিভিন্নজাতীয় পণ্ডিতসমাজে গ্রীক ভাষা সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সমগ্র ইওরোপে ল্যাটিন ভাষা ঐরকম প্রতিষ্ঠা পায়। মুসলমান রাজত্ব-কাল পর্যন্ত সংস্কৃত সমগ্র ভারতের হিন্দু বিদ্বৎসমাজের সাহিত্যের ভাষা ছিল।

বর্তমান ইংরেজী প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষায় যে গ্রীক ও ল্যাটিন অংশ আছে তার বেশীর ভাগই বিকৃত। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গ্রীক ল্যাটিন উপাদান যোগে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি। আধুনিক ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অধিকাংশই dog latin অর্থাৎ বিকৃত ল্যাটিন। পণ্ডিতগণ সজ্ঞানেই এইরকম শব্দ গঠন করেছেন, আধুনিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণ অগ্রাহ্য ক'রে মৃতভাষার হাড় মাস চামড়া কাজে লাগাতে তাঁরা সংকোচ বোধ করেন নি। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরিভাষা সংকলনে এরকম অনাচার আবশ্যক হয় নি।

প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, সংস্কৃতকে সে অর্থে মৃত বলা যায় না। সংস্কৃত বাক্য মরেছে, অর্থাৎ সাধারণে সে ভাষার কথা বলে না, কিন্তু অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে বেঁচে আছে, উচ্চারণের বিকার হ'লেও রূপ বদলায় নি। আমরা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করি না, দরকার হ'লে সংস্কৃত রীতিতেই নূতন শব্দ এবং নূতন সমাসবদ্ধ পদ রচনা করি। সংস্কৃত ভাষা বাংলার জননী কি মাতামহী তা ভাষাবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। সম্বন্ধ যাই হ'ক, ভাগ্যক্রমে আধুনিক বাংলা ভাষা বিপুল সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী হয়েছে। এই অধিকারের সঙ্গে তাকে সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্বও নিতে হয়েছে। যিনি সাহিত্য চর্চা করতে চান তাঁকে কিঞ্চিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, অন্তত সংস্কৃত প্রাতিপদিকের গঠন ও যোজনের মোটামুটি নিয়ম শিখতেই হবে।

শব্দের প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার চলে না, সকলে একই নিয়মের অনুবর্তী না হ'লে ভাষা দুর্বোধ হয়, সাহিত্যের যা মূল উদ্দেশ্য—ভাবের আদান প্রদান, তা ব্যাহত হয়। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য, কারণ এমন কোনও প্রবল শাসন নেই যা সকলেই মেনে নিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ব্যাকরণ অভিধানের শাসন আছে। যদি আমরা মনে করি যে এই শাসন বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় তবে মহা ভুল করব। সংস্কৃত শব্দে যে সুচিরাগত নিয়মের বন্ধন আছে সকলেই তা প্রামাণিক ব'লে মেনে নিতে পারে, তাতে শব্দ এবং তার অর্থ স্থির থাকে, কিন্তু ভাষার স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র বাধা পায় না।

বাংলার তুল্য হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য আছে, এবং সেই কারণেই বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষী অল্পায়াসে পরস্পরের ভাষা শিখতে পারে। ভারতের কয়েকটি

প্রদেশের ভাষায় এই যে শব্দসাম্য আছে তা অবহেলার বিষয় নয়, এই সাম্য যত বজায় থাকে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল।

এদেশে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা অল্প-সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন সেজন্য তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি আর অপপ্রয়োগ বেশী ঘটে নি। 'ইতিমধ্যে, মহারথী, সক্ষম, সততা, সিঞ্চন, সৃজন' প্রভৃতি কয়েকটি অশুদ্ধ শব্দ বহুকাল থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এখন এগুলিকে ছাড়া শক্ত, ছাড়বার প্রয়োজনও নেই। বর্তমানকালে সাহিত্যচর্চা খুব ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল লেখকের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ হয় নি, তার ফলে অশুদ্ধ এবং অপপ্রযুক্ত শব্দের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা উপেক্ষার বিষয় নয়। অতি বড় বিদ্বানেরও মাঝে মাঝে স্খলন হয়, কিন্তু তাতে স্থায়ী অনিষ্ট হয় না যদি তাঁরা নিজের ভুল বোঝবার পরে সতর্ক হন। কিন্তু লেখকরা যদি নিরঙ্কুশ হন এবং তাঁদের ভুল বার বার ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় তবে তা সংক্রামক রোগের মতন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

প্রামাদের অর্থে 'প্রামাণ্য', ইতিহাস অর্থে 'ইতিকথা', ক্ষীণ বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত', আয়ত্ত অর্থে 'আয়ত্তাধীন' চলছে। কর্মসূত্রে বা কর্মোপলক্ষ্যে স্থানে 'কর্ম ব্যপদেশে' লেখা হচ্ছে। 'উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, প্রসারতা, সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচিত' প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ চলছে। 'আধুনিকী' স্থানে 'আধুনিকা', প্রচুর অর্থে 'যথেষ্ট', সজ্ঞার্থ বা definition অর্থ 'সংজ্ঞা' প্রায় কায়েম হয়ে গেছে। অনেকে কবিতায় শ্রেণী অর্থে 'বলাকা' লিখেছেন।

আজকাল সাহিত্যের প্রধান বাহন সংবাদপত্র। এই বাহনের প্রভাব কিরকম ব্যাপক হয়েছে তা সাধারণের লেখা আর কথা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। Situation অর্থে অনর্থক 'পরিস্থিতি'

লেখা হচ্ছে, যদিও 'অবস্থা' লিখলেই কাজ চলে। আইন লঙ্ঘন স্থানে 'আইন অমান্য', আলোচনা স্থানে 'আলোচনী', কার্যকর উপায় স্থানে 'কার্যকরী উপায়', পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল স্থানে 'পূর্বাহ্ণেই...' লেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের অদ্ভুত ভাষা মার্জনীয়। তাঁদের রাত জেগে কাজ করতে হয়, অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি সংবাদ ইংরেজী থেকে বাংলায় তরজমা করতে হয়, ভাষার বিশুদ্ধির উপর দৃষ্টি রাখবার সময় নেই, তাঁদের ভাষা ইংরেজীগন্ধী হওয়া বিচিত্র নয়। Stalin's speech has given rise to a first class political problem—'স্টালিনের বক্তৃতা একটি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।' The Congress party did not take part in the discussion—'কংগ্রেসদল এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নাই।'

কিছুকাল পূর্বে একটি ইংরেজী পত্রিকায় পড়েছিলাম যে Times প্রভৃতি সংবাদপত্রের বেতনভুক্ লেখকগণকে মাঝে মাঝে শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হ'তে পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের অভাব নেই। তাঁরা সহকারীদের প্রত্যেক লেখা ছাপবার আগে সংশোধন করে দেবেন এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু যদি তাঁরা দেখেন যে কোনও অশুদ্ধ শব্দ বা অপপ্রয়োগ বার বার ছাপা হচ্ছে তবে মাঝে মাঝে শুদ্ধাশুদ্ধির ফর্দ ক'রে দিয়ে তাঁদের অধীন লেখকদের সতর্ক ক'রে দিতে পারেন। কয়েকটি বিলাতী পত্রিকায় ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক ছাপা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হ'লে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

১৩৫০

তিমি

আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি সব চেয়ে বড়। এই জন্তুটি মহাকায়, কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্রভোজী, ছোট ছোট মাছ শামুক ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে। পুরাণে আর একরকম জল-জন্তুর উল্লেখ আছে—তিমিংগিল, যারা এত বড় যে তিমিকে গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনা এখানেই নিরস্ত হয় নি, তিমিংগিলেরও ভক্ষক আছে, যার নাম তিমিংগিলগিল। ততোধিক গিলগিলান্ত নামধারী জন্তুরও উল্লেখ আছে। ত্রাণকর্তাদের প্রাণীবৃত্তান্ত যতই অদ্ভুত হ'ক, তাঁরা মাৎস্য ন্যায় বা power politics বুঝতেন।

জন্তুর মধ্যে যেমন তিমি, দেশের মধ্যে তেমন আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইণ্ডোচীন প্রভৃতি। এসব দেশ আকারে বৃহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্র-ভোজী অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট। এদের অল্পাধিক পরিমাণে কবলিত ক'রে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তারা তিমিংগিল জাতীয়; যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড, ইটালি, জাপান। এইরকম পরদেশগ্রাস বহু যুগ থেকে চলে আসছে, অবশ্য কালক্রমে গ্রস্ত আর গ্রাসকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের তিমিংগিলরা সরলস্বভাব ছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গিলত, কোনও সাধু সংকল্পের দোহাই দিত না। রোমান, হুন, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি বিজেতারা এই প্রকৃতির। এই গ্রাসননীতি প্রাচীন ভারতেও কিছু কিছু ছিল, শরৎকাল পড়লেই পরাক্রান্ত রাজারা খামকা দিগ্‌বিজয়ে বার হতেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের দৌড় ছিল সংকীর্ণ, আশে-পাশের গোটাকতক রাজ্য করায়ত্ত ক'রেই নিজেকে সসাগরা ধরার অধীশ্বর ঘোষণা করতেন।

আধুনিক তিমিংগিলদের চক্ষুলজ্জা আছে, তারা স্বজাতির সমা-

লোচনাকে কিঞ্চিৎ ভয় করে। তাই শ্বেতজাতির বোঝা, সভ্যতার বিস্তার, অনুন্নত দেশের উন্নতি, শান্তি ও সুনিয়ম প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যায়। এই সব নীতিবাক্যে তিমিংগিলদের আত্মপ্রসাদ বজায় থাকে, তাদের মধ্যে যারা একটু সন্দিগ্ধ তারাও বেশী আপত্তি তুলতে পারে না। এই ধর্মধ্বজী তিমিংগিল সম্প্রদায়ের আধিপত্য এত দিন অবাধে চলছিল, কিন্তু সম্প্রতি একশ্রেণীর নবতর জীব গোলযোগ বাধিয়েছে, এরা তিমিংগিলগিল, যথা জার্মনি ও জাপান। এরা ভারে—পৃথিবীতে যত তিমি আছে সবই তো তিমিংগিলদের কবলে, আমরা খাব কি? অতএব প্রচণ্ড মুখব্যাদান ক'রে তিমিংগিলদেরই গ্রাস করতে হবে। তাতে প্রথমটা যতই কষ্ট হ'ক অবশেষে যা পাওয়া যাবে তা একবারে তৈরী সাম্রাজ্য, অন্যের চর্বিত খাদ্যের পুনশ্চর্বণ দরকার হবে না, মুখে পুরলেই পুষ্টিলাভ হবে। জার্মনি চায় সমস্ত ইওরোপ, জাপান চায় সমস্ত পূর্ব এশিয়া—পশ্চিম এশিয়া কার ভক্ষ হবে তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। অবশ্য এর পর দুই গিলগিলের মধ্যেও বিবাদ বাধতে পারে। বিজয়ী জার্মনি যদি ফ্রান্স আর হলাণ্ড কবলস্থ ক'রেই রাখে তবে এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইণ্ডোচীন জাভা প্রভৃতি জাপানকে খোশমেজাজে ছেড়ে দেবে না। যদি এশিয়ার ঐশ্বর্য না মেলে তবে এমন মরণপণ যুদ্ধের সার্থকতা কি? বোধ হয় জার্মনি মনে করে যে ব্রিটেন আর আমেরিকাকে জব্দ করার পর জাপানকে সাবাড় করা অতি সহজ কাজ। সম্প্রতি একজন ব্রিটিশ জাঁদরেল, বলেছেন জাপানীরা বানর মাত্র। জার্মনিও মনে মনে তাই বলে! অবশেষে হয়তো কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ উৎপাটিত হবে। ইটালি বেচারা উভয়সংকটে পড়েছে। সেও গিলগিল হতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন তার গিলত্বও যেতে বসেছে। জার্মনি যদি জেতে আর দুই একটা হাড় দয়া ক'রে দেয় তবেই তার মুখরক্ষা হবে।

তিমিংগিলগিলদের চক্ষুলজ্জা নেই, কিন্তু তাদের ব্রত আরও

মহৎ। জার্মনি বলে—সমগ্র পৃথিবী অতিমানব আর্যজাতির (অর্থাৎ তার নিজের) শাসনে আসবে এই হচ্ছে বিধাতার বিধান। জাপান একটু মোলায়েম স্বরে বলে—হে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিবৃন্দ, আমাদের পতাকাতলে এসে আমাদের সঙ্গে সমান সমৃদ্ধি লাভ কর।

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধোত্তর সংকল্প কি তা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয় নি। ভারতবর্ষে আমেরিকার কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই। এদেশের সংবাদপত্রে আমেরিকান প্রেসিডেণ্টের যে বাণী ঘোষিত হয়েছে তাতে চতুর্বিদ আশ্বাস আছে—বাক্য ও ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের মূল তার উল্লেখ নেই। অস্পষ্ট উক্তির একটা কারণ—সংকল্পই স্থির হয় নি। আর একটা কারণ—এই সংকটকালে নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বন্ধুবর্গ চটতে পারে অথবা পরাধীন প্রজারা চঞ্চল হ'তে পারে। তথাপি ব্রিটেন আর আমেরিকার দু-চারজন উচ্চাদর্শ-বাদী মাঝে মাঝে উদার কথা ব'লে ফেলেছেন,—যথা কোনও দেশ পরাধীন থাকবে না, স্বভাবজাত সম্পদে কোনও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকবে না, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনই একমাত্র লক্ষ্য, জাপানি সহসমৃদ্ধি নয়, সার্বজাতিক সহসমৃদ্ধি।

উত্তম সংকল্প। কিন্তু জগতে ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের কার্যক্রম কি? অপ্রতিহত ক্ষমতা হাতে পেলে তাঁদের মতিগতি কি হবে বলা যায় না। ধরা যাক তাঁরা নিষ্কাম, সমদর্শী, সর্বলোকহিতৈষী, তথাপি মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতা আর সাধারণের বুদ্ধির বশেই তাঁরা চলবেন এবং ভুলও করবেন। তাঁদের পন্থা কল্পনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

তাঁদের প্রথম করণীয় হবে—পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে নিজের সুবুদ্ধি দান করা। সম্রাট অশোক সিরিয়া ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশবাসীর হিতার্থে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এই প্রচারের

অন্তরালে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। অশোকের দূতরা বিদেশে রাজ্যস্থাপন করে নি, নিগৃহীতও হয় নি। অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্র থেকেও পররাজ্যে প্রচারক গেছে, কিন্তু বহু স্থলে পরিণাম অন্য-রকম হয়েছে। 'Germany acquired the province of Shantung in China by having the good fortune to have two missionaries murdered there. (Bertrand Russel)।' অশোক শুধু ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেছিলেন সে জন্য বাধা পান নি। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রসংস্কারকদের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক উন্নতিসাধন, সুতরাং স্বার্থের সংঘাত হবে এবং বাধা ঘটবে। সদুপদেশ বা propaganda-ই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু যেখানে তা খাটবে না সেখানে প্রহারই সনাতন উপায়, কারণ লোকের মত পরিবর্তনের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা চলবে না। প্রহার অবশ্য নিষ্কামভাবে সর্বজনহিতার্থে দেওয়া হবে, যেমন বাপ দুষ্ট ছেলেকে দেয়। তার পর কি হবে তা রাজনীতিক নেতাদের আধুনিক উক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, যথা—দুরন্ত জাতির সংযমন, নাবালক জাতির শিক্ষক ও রক্ষক নিয়োগ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধোপকরণের সংকোচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বিভাগ, নূতন অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সব দেশ সমান নয়, সব মানুষও সমান নয়। এই অসামঞ্জস্য দূর করার উপায়—সর্বদেশের ঐশ্বর্য সর্বমানবের ভোগযোগ্য করা এবং সর্বজাতিকে সমান শিক্ষিত করা। কিন্তু প্রথম উপায়টি সাধ্য হ'লেও দ্বিতীয়টি সহজ নয়। সকলের জ্ঞানার্জনক্ষমতা সমান না হ'তে পারে, ক্ষমতা সমান হ'লেও শিক্ষাকালের বিলক্ষণ তারতম্য হ'তে পারে। কোনও ধনী লোকের যদি পাঁচটি ছেলে থাকে তবে সমান সুযোগ পেলেও সকলে সমান কৃতী হয় না। বাপ যত দিন বেঁচে থাকেন তত দিন অপক্ষপাতে সকলকে সুখে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অকৃতীরা কষ্ট পায়। অতএব বাপের বেঁচে

থাকা দরকার। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির পিতৃস্থানীয় কে হবে? যাঁরা সংস্কার আরম্ভ করবেন তাঁরা চিরকাল বাঁচবেন না, কোনও দলের দীর্ঘপ্রভুত্বও লোকে সইবে না। মনু প্রজাপতি, রাজচক্রবর্তী, ডিক্‌টেটার, অ্যারিস্টোক্রাসি, অলিগার্কি, প্রভৃতি সমস্তই এখন অচল। ডিমোক্রাসির উপর এখনও সাধারণের আস্থা আছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে জনকতক স্বার্থপর ধূর্ত লোকেই সকল দেশের রাষ্ট্রসভায় প্রবল হয়। এই দোষের প্রতিকার হবে যদি নির্বাচকমণ্ডল (অর্থাৎ জগতের বহু লোক) সাধু ও জ্ঞানবান হয়। শিক্ষার প্রসার হ'লে জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু সাধুতা? এখানেই প্রবল বাধা।

সম্প্রতি Geoffrey Bourne একটি বই লিখেছেন—'Return to Reason'। এই বহুপ্রশংসিত বইটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে—ডাক্তার উকিল্ প্রভৃতির মতন পার্লিমেণ্টের সদস্যকেও আগে উপযুক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, শুধু বাগ্মী আর দলবিশেষের প্রতিনিধি হ'লে চলবে না। কিন্তু কেবল বিদ্যাশিক্ষায় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় না, সাধুতাও আসে না!

সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এবং বিজ্ঞানবলে বহু দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, সভ্যতা বেড়েছে, রোগ কমেছে। কিন্তু এসবের তুলনায় মানুষের চারিত্রিক উন্নতি যা হয়েছে তা নগণ্য। যেটুকু হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়মে মন্থর অভিব্যক্তির ফলে, এবং পুণ্যাত্মা, কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাবে, রাষ্ট্রের বা বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রিত চেষ্টায় হয়নি। বিজ্ঞানের প্রেরণা এসেছে মুখ্যত মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে এবং গৌণত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকে। অথচ যে স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তা বিজ্ঞান কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে। চরিত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির চরিত্র শোধিত না হ'লে সমষ্টির পরম স্বার্থজ্ঞান আসবে না, নিষ্কলুষ প্রজাতন্ত্র তথা বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থাও হবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মাঝে মাঝে enlightened self-interest-

এর কথা বলেন, তার মানে—অধীন প্রজাকে বেশী শোষণ না ক'রে এবং প্রতিপক্ষকে লাভের কিছু অংশ দিয়ে সুদীর্ঘকাল নিজের স্বার্থ বজায় রাখা। এরকম ক্ষুদ্র কুটিল নীতিতে জাতিবিরোধ দূর হয় না। সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে জড়িত—এই উজ্জ্বলা স্বার্থবুদ্ধির প্রসার না হ'লে সব ব্যবস্থাই পণ্ড হবে।

১৩৪৯

প্রার্থনা

রাম চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছে। রামের মা তার মাথায় একটি টাকা ঠেকিয়ে মনে মনে মা-কালীর কাছে মানত জানিয়ে টাকাটি বাক্সে তুলে রাখলেন। এই মানত যদি ভাষায় বিস্তারিত করা যায় তবে এইরকম দাঁড়ায়।—হে মা কালী, চাকরিটি আমার রামকে দিও। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এখন রোজগার না করলে চলবে কেন। মা, আমি শুধু হাতে তোমার কাছে আসিনি, এই দেখ একটি টাকা নজর দিচ্ছি। আমার ছেলে প্রথম মাইনে পেলেই তা থেকে যা পারি খরচ ক'রে তোমার পুজো দেব, এই টাকাটি তারই বায়না।

সম্ভবত রামের মায়ের মনের কথা শুধু এইটুকু, কিন্তু যদি সাবধানে জেরা করা হয় তবে তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশ থেকে আরও কিছু বার হবে। এই জেরা আপনার আমার সাধ্য নয়, কারণ রামের মা ধর্মশীলা, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে কোনও আজগবী প্রশ্ন করলেই তিনি ক্ষেপে উঠবেন। তাঁকে জেরা করতে পারেন কেবল একজন, স্বয়ং মা-কালী। দেবীকৃত প্রশ্নের অর্থ বোঝবার শক্তি হয়তো রামের মায়ের নেই, তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বলতে পারেন—মা, আমি মুখ্য মানুষ, কি বলছ কিছুই বুঝছি না, অপরাধ নিও না। ধ'রে নেওয়া যাক যে মা-কালী নাছোড়বান্দা, তিনি রামের মায়ের বোধগম্য ভাষায় জেরা করছেন এবং আমাদের বোধগম্য ভাষায় তা প্রকাশ করছেন।—

হ্যাগা রামের মা, ওই যে টাকাটা ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলে, ওটা কার জন্যে ?

তোমার জন্যে মা। শুধু একটি টাকা নয়, চাকরিটি হ'লে আরও অনেক কিছু দেব।

চাকররি যদি না হয় তা হ'লেও টাকাটা আমায় দেবে তো?

তা কি আর দিতে পারি মা, গরিব মানুষ। চাকরিটি হ'লে গায়ে লাগবে না।

ও, আমাকে লোভ দেখাবার জন্যে টাকাটা বার করেছ?

সেকি কথা মা। এই যে দরখাস্ত করা ইস্তক রোজ মন্দিরে গিয়ে শ্রীচরণে পাঁচটি ক'রে পঞ্চমুখী জবাফুল দিচ্ছি তা তো আর ফেরত নেব না।

চাকরি না হ'লেও রোজ ফুল দিয়ে যাবে?

তা কোত্থেকে দেব মা, পাঁচটি ফুল দু-পয়সা।

ও, এই ফুলগুলো আমাকে ঘুষ দিচ্ছ?

ঘুষ বলতে নেই মা, বল পুজো।

আচ্ছা রামের মা, শুনেছ বোধ হয় যে এই চাকরিটার জন্য দু-হাজার দরখাস্ত পড়েছে। তোমাদের তো কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, যেমন ক'রে হ'ক চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু রামের চেয়ে গরিব উমেদার অনেক আছে, তাদের কেউ যদি চাকরিটি পায় তবে খুশী হও না?

এ যে ছিষ্টিছাড়া কথা মা। থাকলেই বা গরিব উমেদার, আমার ছেলে আগে না যেদো মেধো আগে?

আচ্ছা, ওই যে চৌধুরীরা আছে, মস্ত বড়লোক, তাদের মেজো ছেলে হারু যদি চাকরিটা পায় তো কেমন হয়? তার মা এর মধ্যেই ঘটা ক'রে আমার পুজো দিয়েছে।

তা হেরোকে চাকরি দেবে বইকি মা, তারা যে বড়লোক, তোমাকে অনেক ঘুষ খাইয়েছে।

অর্থাৎ তোমার ঘুষ খেয়ে যদি আর সবাইকে ফাঁকি দিই তাতে তুমি খুশী হবে, আর যদি অন্যের ঘুষ খেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিই তবে চটবে। আচ্ছা এত লোক যখন উমেদার, আর অনেকেই আমার

কাছে মানত করেছে, তখন চাকরিটা কাকে দেওয়া যায় বল তো? একচোখা হয়ে রামকেই দিতে বল নাকি?

তাই বলছি মা।

কিন্তু সকলেই তো একচোখা হ'তে বলছে, কার দিকে চোখ দেব?

অত শত জানি না মা, যা ভাল বোঝ কর।

তাই তো চিরকাল করি।

চারুবালা শিক্ষিতা মহিলা, রামের মায়ের মতন তাঁর অন্ধ সংস্কার নেই। তিনি আগে ভগবানের খোঁজখবর নিতেন না, কিন্তু সম্প্রতি বিপদে প'ড়ে প্রার্থনা করছেন।—ভগবান, আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। লোকটা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, কিন্তু এখন আর আমার কোনও রাগ নেই, সে সেরে উঠুক—শুধু এইটুকুই চাই। যদি ম'রে যায় তবে আমার সর্বনাশ হবে, ছেলেমেয়েরা খাবে কি? গয়না বাড়ি জিনিসপত্র সব বেচে ফেলতে হবে। দয়াময়, আমি অন্যায় আবদার করছি না, কাকেও বঞ্চিত ক'রে নিজের ভাল চাচ্ছি না। শুধু আমার স্বামীকে সারিয়ে দাও, তাতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।

এবারেও সওয়াল-জবাব আমরা কল্পনা করতে পারি।—

আচ্ছা চারুবালা, তুমি কি ক'রে জানলে যে তোমার স্বামী বেঁচে উঠলে কারও ক্ষতি হবে না? সে মরলেই তার চাকরিটা যোগেন ঘোষাল পাবে, বেচারা অনেক কাল আশায় আশায় আছে। আর তোমাদের এই বাড়িটার উপর চৌধুরীদের নজর আছে, তোমরা নিরুপায় হ'লেই তারা সস্তায় কিনে নেবে।

ভগবান, এমন সাংঘাতিক কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না?

কিছুমাত্র না। তুমি এই যে রেশমী শাড়ীটা প'রে আছ তার জন্য কতগুলো পোকার প্রাণ গেছে জান?

পোকার আবার প্রাণ! লক্ষ পোকার প্রাণের চেয়ে আমার একটু সাধ আহ্লাদ কি বড় নয়?

নিশ্চই বড়। আমার সাধ আহ্লাদও কোটি কোটি মানুষের প্রাণের চেয়ে বড়।

পোকা মরলে আমার একটি চমৎকার শাড়ি হয়। মানুষ মরলে তোমার কি লাভ হয় শুনি?

তোমার তা বোঝবার শক্তি নেই। পোকা কি শাড়ির মর্ম বোঝে?

কি নিষ্ঠুর! লোকে তোমাকে দয়াময় বলে কেন?

তুমিও তো একটু আগে দয়াময় ব'লে ডাকছিলে, তোমার স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তা হ'লেও দয়াময় ব'লে ডাকবে। হয়তো আশা কর যে বার বার দয়াময় বললে সত্যই আমার দয়া হবে।

সংকটে পড়লে অধিকাংশ লোকের দৈবের উপর নির্ভর বাড়ে। অশিক্ষিত জন কবচ মাহুলি হোম স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির শরণ নেয়, শিক্ষিত জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। সাধারণের ধারণা মাহুলি স্বস্ত্যয়নের মতন প্রার্থনারও শক্তি আছে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরা ব'লে থাকেন, যদি ঠিক মতন ওষুধ পড়ে তবে রোগ সারতেই হবে। প্রার্থনাবাদীরা বলেন, যদি ডাকার মতন ডাকতে পার তবে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিষ্টিক্‌সের সম্পর্ক নেই। যে বিশ্বাসী সে আশা করে যে তার ওষুধ বা প্রার্থনাটি লাগসই হ'তেও পারে।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুকতাক অথবা প্রার্থনা করা হয় তা ন্যায্য কি অন্যায্য ভাববার দরকার হয় না। সে কালে ডাকাতরা যাত্রার আগে কালীপূজা করত। উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি অভিচারের চলন এখনও আছে। যারা বিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা আনে তারাও দেবতার কাছে মানত করে। যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হ'তে

চায়, যে লোক ছ-হাজার উমেদারকে নিরা রোক্ষ
বাগাতে চায়, যে মেয়ে প্রতিযোগিনীদের হ
আই. সি. এস-কে গাঁথতে চায়, তাদেরও অনে
দৈবশক্তির শরণ নেয়। এরা কেউ মন্দ লো
দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—এই প্রার্থনা সাধারণ
খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এমন ধারণা কারও নেই যে ভগবান ন্যায়-বিচার করবেন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই করুণা করবেন। অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় যখন প্রত্যহ ঘটতে দেখা যাচ্ছে তখন ন্যায় অন্যায়ের চিন্তা না ক'রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানকে ধরতে দোষ কি? যদি মাদুলি বা স্বস্ত্যয়ন বা প্রার্থনার মাহাত্ম্য থাকে তবে উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তা ভাববার দরকার নেই।

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই দৈবসাহায্য চাওয়া হয়, কিন্তু বিপদ যখন দেশব্যাপী হয় তখন লোকে সমবেতভাবে দেবতাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে। প্লেগ বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময় হোমযাগ নগরসংকীর্তন মন্দিরাদিতে বিশেষ উপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গভর্মেণ্ট এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মহাভয়ে গভর্মেণ্টেরও নাস্তিক্য দূর হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজার উপর হুকুম আসে অমুক দিনে সকলে মিলে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর। সম্ভবত গভর্মেণ্টের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে ভগবান এত লোকের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না, অথবা মনে করেন যে ভগবানের দয়া না হ'লেও প্রজার মনে কতকটা ভরসা আসবে।

আমাদের দেশে অল্পস্বল্প পাষণ্ড আছে, কিন্তু তারা সংযত বেশী কথা বলতে সাহস করে না। বিলাত সর্ববিষয়ে স্বাধীন দেশ, সেজন্য সেখানকার পাষণ্ডদের মুখের বাঁধন নেই। সেখানে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা ছাড়াও সরকারী হুকুমে বিশেষ বিশেষ দিনে বড় রকম উপাসনা হয়। বিলাতী পাষণ্ডরা বলে—এ

বড় আশ্চর্য কথা, যখনই বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয় তখনই বোমাবর্ষণ বাড়ে, আর যে গির্জায় বেশী উপাসনা হয় বেছে বেছে তাতেই বোমা পড়ে। আমাদের পাদ্রীরা ভগবানের কাছে শত্রু পক্ষের নামে অনেক লাগাচ্ছেন, আর আমরা যে নির্দোষ, অনিচ্ছায় যুদ্ধে নেমেছি, একথাও বার বার বলছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের পাদ্রীরাও তো ঠিক এইরকম বলছে, আমাদের দু-তিন শ বৎসরের অপকর্মের ফর্দ ভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর কান ভারী করছে। ভগবান কার কথা শুনবেন ?

বিলাতের যাজকসম্প্রদায় খুব সতর্ক। তাঁরা বোঝেন যে তাঁদের অনেক যজমান এখন স্বজাতির সমালোচনা করে এবং স্পষ্ট কথা বলে, সুতরাং ভগবানের কাছে এই বাঁধাধরা মামুলী মন্ত্রে প্রার্থনা করা আর চলবে না।—Save and deliver us, we humbly beseech Thee, from the hands of our enemies ; abate their pride, asauage their malice, and confound their devices ; that we, being armed with Thy defence, may be preserved evermore from all perils, to glorify Thee, who art the giver of all victory।' সুন্দর রচনা, কিন্তু সরল আর নিষ্পাপ না হ'লে কি এমন প্রার্থনা করা চলে ?

সম্প্রতি আর্কবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি এক বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা এ প্রার্থনা করব না—ঈশ্বর, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কর ; শুধু বলব—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। আমাদের প্রার্থনা সমস্ত জগতের হিতার্থ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তা করব, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়।

পাষণ্ডরা এতেও ঠাণ্ডা হয় না। বলে—ঈশ্বর তোমাদের তোয়াক্কা রাখেন না, তোমরা প্রার্থনা কর আর না কর, তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবেই।

পাদ্রীদের কাছে যুক্তি আশা করা বৃথা, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং আবশ্যক মত তাঁদের কূটনীতি আশ্রয় করতে হয়। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক—এই প্রার্থনা অতি পুরাতন, বহু দেশের ভক্ত আর জ্ঞানী বহু ভাষায় এই বাক্য বলেছেন। কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে এর মূল অভিপ্রায় লুপ্ত হয়েছে।

সামান্য লোকে (মায় বেতনভুক্ যাজক) যখন এই বাক্যটি বলে তখন জানাতে চায় যে ভগবানের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। হিন্দুর অনেক ক্রিয়াকর্মে কর্মফল বাক্যত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। কিন্তু স্বার্থকামনা সর্বত্রই উহ্য থাকে। আশ্রিত জন যখন ক্ষমতাশালী প্রভুকে তুষ্ট ক'রে কাজ উদ্ধার করতে চায় তখন বলে—হুজুরের উপর কথা বলবার আমি কে? হুজুর সবই বোঝেন, সব খবর রাখেন, এই গরিবের অবস্থাটা ভাল রকমই জানেন। আপনার দ্বারা কি অবিচার হ'তে পারে? যা হুকুম করবেন মাথা পেতে নেব। আমাদের কথকঠাকুররাও দরবারী ভাষা জানেন, তাঁরা বিপন্ন প্রহ্লাদকে দিয়ে বলান—আমি মরি তাহে ক্ষতি নাহি হে, তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হবে! ভগবানকে যখন বলা হয়—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, তখন সাধারণ প্রার্থীর মনে এই গূঢ় কামনা থাকে—ভগবান আমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন।

এই প্রার্থনাবাক্য যাঁদের মুখ থেকে প্রথমে বেরিয়েছিল তাঁদের কোনও প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল না। নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী এখনও বলেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই বাক্যে কিছু রূপক আছে, বক্তার বিশ্বাস অনুসারে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে। কিন্তু রূপকের আবরণ ভেদ করলে শুধু এই অর্থ-ই পাওয়া যায়—আমি অভিষ্টসাধন বা বিপদ্‌বারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার সফলতা বা বিফলতা দৈবাধীন অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব, যা ঘটবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা বিধাতার বিধান বা নিয়তি। সেই নিয়তি মেনে

নেবার এবং সইবার শক্তি আমার আসুক। তার জন্যই প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ উদ্‌বুদ্ধ হবার জন্য বার বার নিজেকেই বলছি—হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হ'ক।

১৩৫০

সংকেতময় সাহিত্য

যে আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন আমাদের সমকালীন তার মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। রেলগাড়ি টেলিফোন মোটর সিনেমা রেডিও প্রভৃতির আশ্চর্যতা এখনও আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয় নি। আধুনিক সভ্যতার এইসব ফল ভোগ করছি ব'লে আমরা ধন্যজ্ঞান করি, যদিও মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে উদ্‌ভাবনের গৌরব আমাদের নয়।

কিন্তু যে আবিষ্কার অত্যন্ত পুরাতন, কিংবা যে বিষয়ের পরিণতি প্রাচীনকালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তার উপকারিতা মোটর সিনেমা রেডিওর চেয়ে লক্ষগুণ বেশী হ'লেও আমরা তা অকৃতজ্ঞচিত্তে আলো বাতাসের মতই সুলভ জ্ঞান করি। আগুন, কৃষি, আর বয়নবিদ্যার আবিষ্কার কে করেছিল তা জানবার উপায় নেই। এগুলির উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হত তা খেয়াল হয় না। এইসব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানবসভ্যতা ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যার প্রভাবে শুধু ঐশ্বর্যবৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপযুক্ত প্রয়োগে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি একসত্তায় পরিণত হবে—এমন একটি বিষয়ের উদ্‌ভাবন পুরাকালে হয়েছিল, এবং তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অসীমশক্তিশালী পরম সহায়ের নাম 'সাহিত্য'।

Literature শব্দের মৌলিক অর্থ—লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ—সহিতের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু

মানব একক্রিয়ান্বয়ী বা এক ভাবে ভাবিত হয়। এমন সার্থক আর ব্যাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী, তার পর এল বাক্য। সুভাষিত বাক্য যখন বলা হ'ল এবং শুনে মনে রাখা হ'ল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি, শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য। প্রথম যুগে যখন বাক্যই সম্বল ছিল তখন সাহিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ্‌-দেবী। সংগীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ্‌দেবী বীণাপুস্তক-ধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তকে অধিষ্ঠান ক'রে বিশ্বব্যাপিনী হয়েছেন।

প্রথমে যখন লেখার উদ্‌ভাবন হ'ল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অতি স্থূল—নিজের জিনিস, চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দান-বিক্রয়াদির দলিল করা, ইত্যাদি। তার পর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসনলিপির প্রচলন হ'ল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হ'ল, যে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবদ্ধ ছিল তা লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীমা রইল না।

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা শুনতে পায় না, যারা শুনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্যাই গুরুমুখে শুনে বার বার আবৃত্তি ক'রে স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করতে হ'ত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও স্মরণশক্তির অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্তু শ্রুতবিদ্যা কণ্ঠস্থ করা সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হ'লেই পড়া যেতে পারে। রচয়িতার মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁর লেখা বহু শত বৎসর পরেও জীবিত থাকে। লেখা যদি ছাপা হয় তবে তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হ'তে পারে।

আমি একটি উত্তম কাব্য বা গল্প বা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তথ্যমূলক

গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি, আর জ্ঞান আমাতেও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা করেছেন, দেখেছেন বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য উপলব্ধি করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযন্ত্র কি? শুধুই কাগজের উপর কালির চিহ্নশ্রেণী। শ্রুতি-গ্রাহ্য বাঙ্‌ময় সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকেতময় হয়েছে। মুখের ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের আছে। শিশুকালে কথা বুঝতে আর বলতে সহজেই শিখছি, লেশমাত্র আয়াস হয় নি। কিন্তু বাক্যের কৃত্রিম প্রতীক স্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই না কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একবারেই অগ্রাহ্য ছিল, একমাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্নের পরিচয় এবং তার নাম। তার পর ধীরে ধীরে চিহ্নপরম্পরা আয়ত্ত হ'ল, পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের উচ্চারণ সহজ হ'ল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল শিশু রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ ক'রে সাহিত্যের যে প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন, সকল ভাগ্যবান শিশুই তা একদিন পায়। পাখি যেমন ক'রে তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকমে তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর লক্ষ্য হয় না, পড়া ও লেখার শক্তি ওঠা-হাঁটার মতই স্বভাবে পরিণত হয়।

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষরপরিচয়েরও সুযোগ পায় না, অনেকে কোনও রকমে অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ বোঝে না। সামান্য লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় তার মর্ম আমরা সহজে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের সঙ্গে যা পাওয়া যায় তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যখন রাঁধাবার কাজে বাহাল করি তখন সে একটাকা বেশী মাইনে চেয়েছিল, কারণ

সে চতুঃশাস্ত্রে পণ্ডিত। জানতে চাইলাম কি কি শাস্ত্র। উত্তর দিলে—পড়তে জানি, লিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, এ-বি-সি-ডি চিনি। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান যতই অল্প হ'ক, সে তার নিরক্ষর আত্মীয়স্বজনের তুলনায় শিক্ষিত—এই অসামান্যতার গৌরব সে বুঝেছিল।

স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্যের জন্য মানুষ নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্‌ভাবন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন। রসায়নী শাখাপ্রশাখাময় ফরমুলার দ্বারা বস্তুর গঠন নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই সব সংকেত অপরিহার্য কিন্তু এদের প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনও বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার জন্য g অক্ষরটি চলে। কিন্তু এই অক্ষর দেখলে কোনও বস্তুর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় না। জলের সংকেত H_2O দেখলে তৃষ্ণাহারক পানীয় বা বৃষ্টিধারা বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্য স্বরলিপি উদ্‌ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ জন তাল-মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্তু তাতে গান বাজনা শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি প'ড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এরকম অভ্যাসের প্রয়োজন কোনও কালে হবে না। সংগীত যতই কাম্য হ'ক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভাবে সংকেতজনিত কল্পনার শরণ নিতে হবে।

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনও ব্যাপার প্রতিরূপিত করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, কারণ তা দেখাও যায় শোনাও যায়। তার পরেই মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর talkie যথেষ্ট নয়, smellie উদ্‌ভাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রার্পিত ঘটনার আনুসঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে।

পরে হয়তো tastie আর touchie-র আবিষ্কারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ পূর্ণ হবে, ভোজের দৃশ্যে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্যে কিঞ্চিত প্রহার দেওয়া হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা কোনটিও সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনও আড়ম্বরের দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয় না।

সাহিত্যের যা বিষয় তা এতই বিচিত্র আর জটিল যে তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। কবিবর্ণিত নিসর্গদৃশ্য বা মানবচরিত্র, অথবা ভূগোলবর্ণিত বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা বা গ্রহনক্ষত্রের রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের কথা শোনবার উপায় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শনের সকল তথ্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক বিদ্যা অল্পাধিক পরিমাণে শিখতেই হবে, নতুবা মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপদেশে আছে—

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

—অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধই। শাস্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা শেখবার এই প্রবল প্রয়োজন থেকেই সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। যা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য হ'তে পারে না তা সভ্য মানবের পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং সকলের অধিগম্য হয়েছে। একজন যা জানে তা সকলে জানুক—সাহিত্যের এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পূর্ণতা পেয়েছে।

যে ভাষা অবলম্বন ক'রে সাহিত্য রচিত হয় সেই ভাষাও সংকেতের সমষ্টি। এই সংকেত শব্দাত্মক ও বাক্যাত্মক; কিন্তু

বিজ্ঞানাদির পরিভাষার তুল্য স্থির নয়, প্রয়োজন অনুসারে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা, ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি কেবল অভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটি থেকে প্রকরণ অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি, বাক্যের তেমন উপমা রূপক প্রভৃতি বহুবিধ অলংকার। সাহিত্যের বিষয়-ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশশক্তি বদলায়। স্থূল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল না হ'লে চলে না, তাতে শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা বাধাস্বরূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, কদাচিৎ একটু রূপকও চলতে পারে, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অন্যান্য অলংকার একবারেই অচল। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—এ ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের নয়।

যন্ত্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নকশা আঁকা হয় তা অত্যন্ত সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ মূলানুযায়ী, তা দেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর আয়তন সহজেই মোটা-মুটি বোঝা যায়। যন্ত্রবিদ্যা শারীরবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্য নকশা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা শুধুই একসমতলাশ্রিত মানচিত্র বা diagram, তাতে মূলবস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা দূরত্ব নিকটস্থ পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ প্রকাশের জন্য মসালেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের হানি হয় কিন্তু বস্তুর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রকৃতি বা হর্ষ বিষাদ অনুরাগ বিরাগ দয়া ভয় বিস্ময় কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে শুধু শব্দের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার বৈজ্ঞানিক ভাষায়

চলে না। নিপুণ রচয়িতা সে স্থলে ত্রিবিধ শব্দবৃত্তি এবং নানা অলংকার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য হয়।

অনেক আধুনিক লেখক নূতনতর সাংকেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা বুঝতে পারেন না, অন্তত আমি পারি না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হ'ত না। চিত্রে cubism আর surrealism-এর তুল্য এই সংকেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিতপূর্ব রসসাহিত্য? বোধ হয় মীমাংসার সময় এখনও আসে নি। নূতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন—এককালে রবীন্দ্রকাব্যও সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল; ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমরা রাজী আছি। হয়তো এঁদের কথা ঠিক, কারণ নূতন সংকেতে অভ্যস্ত হ'তে লোকের সময় লাগে। হয়তো এঁদের ভুল, কারণ সংকেতেরও সীমা আছে। নূতন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধ্যেই আছেন, কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ হ'তে পারে। যারা বিতর্কে যোগ দিতে চান না তাঁদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা।

১৩৫০

বাংলা বানান

কয়েক মাস আগে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় বাংলা বানান সম্বন্ধে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর উত্থাপিত এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করছি।

সাত আট বৎসর পূর্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার-সমিতি তাঁদের প্রস্তাব প্রকাশিত করেন তখন শিক্ষিতজনের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য হয়েছিল। কেউ খুব রাগ দেখিয়েছিলেন কেউ বলেছিলেন যে সমিতি যথেষ্ট সাহস দেখান নি—সংস্কার আরও বেশী হওয়া উচিত, আবার অনেকে মোটের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—যে সব বানানের মধ্যে ঐক্য নেই সেগুলি যথাসম্ভব নির্ধারিত করা, এবং যদি বাধা না থাকে তবে স্থলবিশেষে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কেবল দুটি নিয়ম করা হয়েছে—রেফের পর দ্বিত্ববর্জন ('কর্ম, কার্য'), এবং ক-বর্গ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে বিকল্পে ং প্রয়োগ ('ভয়ংকর, সংগীত, সংঘ')। এই দুই বিধিই ব্যাকরণসম্মত। অসংস্কৃত (অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী) শব্দের জন্য কতকগুলি বিধি করা হয়েছে, কিন্তু অনেক বানানে হাত দেওয়া হয় নি, কারণ সমিতির মতে পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে হওয়াই বিধেয়। যাঁরা বানান সম্বন্ধে উদাসীন নন তাঁদের অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (৩য় সংস্করণ) একখানা আনিয়ে প'ড়ে দেখবেন। বানান-সমিতি যেসব বিষয়ে বিধান দেননি বা বিশেষ কিছু বলেন নি, এই প্রবন্ধে তারই আলোচনা করছি।

সাধুভাষায় বানানের অসাম্য খুব বেশী দেখা যায় না। বহু বৎসর পূর্বে এই ভাষা যে অল্প কয়েকজনের হাতে পরিণতি পেয়েছিল

তাঁরা তখনকার শিক্ষিতসমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বাংলা দেশের সব জেলার সাহিত্যসেবী তাঁদের অনুকরণ ক'রে চলতেন, সেজন্য সাধুভাষার বানান মোটের উপর সুনির্দিষ্ট হ'তে পেরেছে। চলিত-ভাষার প্রচলন যখন আরম্ভ হ'ল তখন এদেশে সাহিত্যচর্চা এবং লেখকদের আত্মনির্ভর বেড়ে গেছে। বহু লেখক চলিতভাষার প্রকাশশক্তি দেখে আকৃষ্ট হলেন, কিন্তু লেখার উৎসাহে তাঁরা নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করাবার জন্য যত্ন নিলেন না, মনে করলেন—এ আর এমন কি শক্ত। এই ভাষায় ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ভিন্নপ্রকার, অন্য কতকগুলি শব্দেও কিছু প্রভেদ আছে, এবং এই সমস্ত শব্দের বানান পূর্বনির্ধারিত নয়। পাঠ্যপুস্তকেও চলিতভাষা শেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই কারণে চলিতভাষায় বানানের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

চলিতভাষা এবং কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা সমান নয়, যদিও দু-এর মধ্যে কতকটা মিল আছে। লোকে লেখবার সময় সতর্ক হয় কথা বলবার সময় তত হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান। লেখার ভাষা, বিশেষত সাহিত্যের ভাষা, কোনও জেলার মধ্যে আবদ্ধ হ'লে চলে না, তার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। এজন্য চলিত ভাষাকে সাধুভাষার তুল্যই নিরূপিত বা standardized হ'তে হবে। মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লেখার বা সাহিত্যের ভাষা প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সাহিত্যের ভাষা সর্বজনীন, তার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হ'লেও ক্ষতি হয় না। চলিতভাষা সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং তার বানান অবহেলার বিষয় নয়।

অনেকে বলেন, উচ্চারণের অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত। হ'লে

ভাল হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যত তা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। কার উচ্চারণের বশে বানান হবে? জেলায় জেলায় প্রভেদ, অনেক শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গী 'মিচে কতা' (মিছে কথা) বলেন, অনেক পূর্ববঙ্গী 'তারাতারি' (তাড়াতাড়ি) বলেন, কিন্তু লেখবার সময় সকলেই প্রামাণিক বানান অনুসরণের চেষ্টা করেন। দৈবক্রমে কলকাতা বাংলা দেশের রাজধানী এবং বহু সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র। এই কারণে কলকাতার মৌখিক ভাষা একটা মর্যাদা পেয়েছে এবং তার উপাদান ব্যক্তি বা দল-বিশেষ থেকে আসে নি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গড় (average) উচ্চারণ থেকেই এসেছে। যে অল্পসংখ্যক লেখকদের চেষ্টায় চলিতভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি, তাঁদের প্রভাব অবশ্য কিছু বেশী। আদি লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবও নগণ্য নয়। তা ছাড়া সাধুভাষার অসংখ্য শব্দ তাদের পূর্বনিরূপিত বানান সমেত এসেছে। চলিতভাষা একটা synthetic ভাষা এবং কতকটা কৃত্রিম। এই কারণে তার বানান সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু উচ্চারণ পাঠকদের অভ্যাস এবং রুচির উপর ছেড়ে দিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাধুভাষায় লেখা হয় 'করিতেছে', 'বসিবে' 'পড়া হয়' 'কোরিতেছে, বোসিবে'। চলিতভাষায় অতিরিক্ত ও-কার, যুক্তাক্ষর এবং হস্‌চিহ্ন দিয়ে 'কোচ্ছে' বোস্‌বে ইত্যাদি লেখবার কোনও দরকার দেখি না, 'করছে' 'বসবে' লিখলেই কাজ চলে। সুপ্রচলিত শব্দের বানানে অনর্থক অক্ষরবৃদ্ধি করলে জটিলতা বাড়ে, সুবিধা কিছুই হয় না। শিক্ষার্থীকে অন্যের মুখে শুনেই উচ্চারণ শিখতে হবে। অবশ্য নবাগত বিদেশী শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত।

বাংলায় শব্দের শেষে যদি অযুক্তাক্ষর থাকে এবং তাতে স্বরচিহ্ন না থাকে, তবে সাধারণত হসন্তবৎ উচ্চারণ হয়। শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরেও প্রায় এইরকম হয়। আমরা লিখি 'চটকল, আমদানি, খোশমেজাজ', হস্‌চিহ্নের অভাবে উচ্চারণ আটকায় না। ব্যতিক্রম

অবশ্য আছে, খুব বেশী নয়। উচ্চারণের এই সাধারণ রীতি অনুসারে অধিকাংশ শব্দে হস্‌চিহ্ন না দিলেও কিছুমাত্র বাধা হয় না। অনেকের লেখায় দেখা যায়—'কুচ্‌কাওয়াজ্‌, টি-পট্, সুট্‌কেস্‌'। এই রকম হস্‌চিহ্নের বাহুল্যে লেখা আর ছাপা কণ্টকিত করায় কোনও লাভ নেই। যদি ভবিষ্যতে বাংলা অক্ষর সরল করবার জন্য যুক্তব্যঞ্জন তুলে দেওয়া হয়, তখন অবশ্য হস্‌চিহ্নের বহুপ্রয়োগ দরকার হবে।

আজকাল ও-কারের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সাধু-ভাষাতেও 'কোরিলো' লিখছেন। এতে বিদেশী পাঠকের কিছু সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু বাঙালীর জন্য এরকম বানান একেবারে অনাবশ্যক। আমরা ছেলেবেলায় যে রকমে শিখি—বর্গীয় জ-এ ইঁও গ্‌ গঁ, 'শীত'-এর উচ্চারণ হসন্ত কিন্তু 'ভীত' অকারান্ত, 'অভিধেয়' আর 'অবিধেয়' শব্দের প্রথমটি অ ও-তুল্য কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়, সেই রকমেই শিখব—'করিল' আর 'কপিল'-এর বানান একজাতীয় হ'লেও উচ্চারণ আলাদা। যাঁরা পদ্যে অক্ষরসংখ্যা সমান রাখতে চান, তাঁদের 'আজো, আরো' প্রভৃতি বানান দরকার হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে 'আজও, আরও' হবে না কেন? ও-কারের চিহ্ন লিখতে যে সময় আর জায়গা লাগে, আস্ত 'ও' লিখতে তার চেয়ে বেশী লাগে না। আমরা লিখি—'সেদিনও বেঁচে ছিল, ভূতপ্রেতও মানে না, অতও ভাল নয়, দুধও খায় তামাকও খায়'। 'ও' প্রত্যয় নয়, একটি অব্যয়শব্দ, মানে—অপি, অধিকন্তু, also, even। অব্যয় শব্দের নিজের রূপ নষ্ট করা অনুচিত। ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা নেই, আমরা 'তামাকও' পড়ি না, 'তামাক্‌-ও' পড়ি; সেই রকম লিখব 'আজই, আজও', পড়ব 'আজ্‌-ই, আজ্‌-ও'। সর্বত্র সংগতিরক্ষা আবশ্যক।

'কারুর' শব্দটি আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। এটিকে slang মনে করি। সাধু 'কাহারও' থেকে চলিত 'কারও', কথার টানে তা 'কারু' হ'তে পারে। কিন্তু আবার একটা র যোগ হবে কেন?

য় অক্ষরটির দু-রকম প্রয়োগ হয়। 'হয়, দয়া' প্রভৃতি শব্দ y-তুল্য আদিম উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' প্রভৃতি শব্দে য় স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র, তার নিজের উচ্চারণ নেই, আমরা বলি 'হালুআ খাওআ'। 'খাওয়া, যাওয়া, ওয়ালা' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দের বর্তমান বানান আমাদের এতই অভ্যস্ত যে বদলাবার সম্ভাবনা দেখি না, যদিও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি আ দিয়ে লেখেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অনেক ক্ষেত্রে লিখতেন, এবং প্রাচীন বাংলা লেখাতেও য়া স্থানে আ চলত। কিন্তু নবাগত বিদেশী শব্দের বানান এখনও স্থিরতা পায় নি, সেজন্য সতর্ক হবার সময় আছে। Wavell, Boer, swan, drawer প্রভৃতি শব্দ বাংলায় 'ওআভেল বোআর, সোআন, ড্রআর লিখলে য়-এর অপপ্রয়োগ হয় না। War এবং ware দুই-এরই বানান 'ওয়ার' করা অনুচিত, প্রথমটি 'ওঅর', দ্বিতীয়টি 'ওয়ার'। 'মেয়র, চেয়ার, সোয়েটার' লিখলে দোষ হয় না, কারণ য় য়া য়ে স্থানে অ আ এ লিখলেও উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

'ভাই-এর, বউ-এর, বোম্বাই-এ' প্রভৃতিতে যে স্থানে এ লিখলে উচ্চারণ বদলায় না, কিন্তু লেখা আর বানান সহজ হয়, ব্যাকরণেও নিষেধ নেই। কেউ কেউ বলেন, দুটো স্বরবর্ণ পর পর উচ্চারণ করতে glide দরকার সে জন্য য় চাই। এ যুক্তি মানি না। 'অতএব' উচ্চারণ করতে তো বাধে না, য় না থাকলেও glide হয়।

সংস্কৃত শব্দে অনুস্বার অথবা অনুনাসিক বর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তজ্জাত বাংলা শব্দে প্রায় চন্দ্রবিন্দু আসে, যেমন 'হংস, পঙ্ক, পঞ্চ, কণ্টক, চন্দ্র, চম্প' থেকে 'হাঁস, পাঁচ, কাঁটা, চাঁদ, চাঁপা'। কয়েকটি শব্দে অকারণে চন্দ্রবিন্দু হয়, যেমন 'পেচক, চোচ' থেকে 'পেঁচা, চোঁচ'। তা ছাড়া অনেক অজ্ঞাতমূল শব্দেও চন্দ্রবিন্দু আছে, যেমন 'কাঁচা, গোঁজা, ঝাঁটা'। পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়। অনেক 'একঘেঁয়ে, পায়ে ফোঁড়া, থান ইঁট' লেখেন, যদিও

চন্দ্রবিন্দুহীন বানানই বেশী চলে। 'কাঁচ, হাঁসি, হাঁসপাতাল' অনেকে বলেন, কিন্তু লেখবার সময় প্রায় চন্দ্রবিন্দু দেনা না। পূর্ববঙ্গী অনুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নন, সেজন্য বানানের সময় মুশকিলে পড়েন, যথাস্থানে ঁ দেন না, আবার অস্থানে দিয়ে ফেলেন। সন্দেহ হ'লে অভিধান দেখে মীমাংসা হ'তে পারে কিন্তু যদি পূর্বসংস্কার দৃঢ় থাকে তবে সন্দেহই হবে না, ফলে বানানে ভুল হবে। আর এক বাধা—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোকেও সকল ক্ষেত্রে একমত নন। যদি বিভিন্ন জেলার কয়েক জন বিদ্বান ব্যক্তি একত্র হয়ে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা রফা করেন। এবং সংশয়জনক সমস্ত শব্দের বানান দিয়ে একটি তালিকা তৈরী করেন তবে তার বশে সহজেই বানান নিরূপিত হবে।

চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, ড় সম্বন্ধেও তা খাটে। পূর্ববঙ্গে ড় আর র প্রায় অভিন্ন, সেজন্য লেখার বিপর্যয় ঘটে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক শব্দে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রেও তালিকার প্রয়োজন।

মোট কথা—অসংস্কৃত শব্দের বানান সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতজনের উচ্চারণের বশে করতে হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অন্ধভাবে জনকতকের বানানকেই প্রামাণিক গণ্য করলে অন্যায় হবে। বানানে অতিরিক্ত অক্ষর-যোগ অনর্থকর, তাতে জটিলতা আর বিশৃঙ্খলা বাড়ে। সর্বত্র উচ্চারণের নকল করবার দরকার নেই, পাঠক প্রকরণ (context) থেকেই উচ্চারণ বুঝবে। সাধুভাষার বানান আপনিই কালক্রমে অনেকটা সংযত হয়েছে, কিন্তু মৌখিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় চলতি ভাষায় সহজে তা হবে না—যদি না লেখকেরা উদ্‌যোগী হয়ে সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন।

১৩৫১

বাংলা ছন্দের শ্রেণী

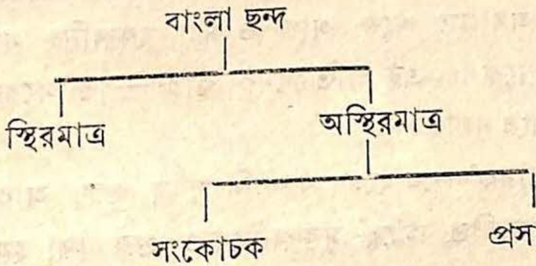
'পরিচয়'-এর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় জানতে চেয়েছেন ছন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। বিষয়টি বৃহৎ, ছন্দের সমগ্র তথ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি, সেজন্য সবিস্তারে আলোচনা আমার সাধ্য নয়। বৎসরাধিক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দের শ্রেণী সম্বন্ধে পত্রযোগে কিছু আলাপ হয়েছিল। তাঁকে আমার মতামত যা জানিয়েছিলাম তাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি।

ছন্দের মূল উপাদান মাত্রা এবং তার বাহন syllable। সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে syllable ও হরফ দুই-ই বোঝায়, তা ছাড়া ইংরেজী আর সংস্কৃতের syllable একই রীতিতে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য syllable-এর অন্য প্রতিশব্দ দরকার। প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি' চালিয়েছেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে কিছু আপত্তি করবার আছে। Word যদি 'শব্দ' হয়, syllable যদি 'ধ্বনি' হয়, তবে sound বোঝাতে কি লিখব? ব্যাকরণে vowel sound, gutteral sound ইত্যাদির প্রতিশব্দ দরকার হয়। নূতন পরিভাষা স্থির করবার সময় যথাসম্ভব দ্ব্যর্থ পরিহার বাঞ্ছনীয়। বহুকাল পূর্বে কোনও প্রবন্ধে syllable-এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলাম। এই সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থের আশঙ্কা নেই, কিন্তু শ্রুতিকটু। সেজন্য এখন প্রবোধবাবু 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশা করি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্ভাবিত হবে।

ধ্বনি দুইপ্রকার, মুক্ত (open) ও বদ্ধ (closed)। মুক্তধ্বনির শেষে স্বরবর্ণ থাকে, তা টেনে দীর্ঘ করা যেতে পারে, যেমন তু। বদ্ধধ্বনির শেষে ব্যঞ্জন বর্ণ বা ং ঃ বা দ্বিস্বর (diphthong) থাকে, তা টানা যায় না, যেমন উৎ, সং, তঃ, কই, সৌ। সংস্কৃতে

দীর্ঘস্বরযুক্ত ধ্বনি এবং বদ্ধধ্বনি গুরু বা দুই মাত্রা গণ্য হয় (ধী, উৎ), এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তধ্বনি লঘু বা এক মাত্রা গণ্য হয় (ধি, তু)। ইংরেজীতে সংস্কৃতের তুল্য সুনির্দিষ্ট দীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু বহু শব্দে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য গুরুধ্বনি হয় (fee)। বদ্ধ ধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই গুরু, নতুবা লঘু। বাংলা ছন্দের যে সুপ্রচলিত তিন শ্রেণী আছে তাদের মাত্রানির্ণয় এক নিয়মে হয় না। ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মাত্র, এবং ভাষা ভেদে বিভিন্ন।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ এই রকম করা যেতে পারে—



'স্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলায় না, যেমন বাংলা মাত্রাবৃত্ত। এতে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে, অক্ষরছন্দ (বা বৃত্ত) এবং মাত্রাছন্দ (বা জাতি)। এই দুই শ্রেণীই স্থিরমাত্র। সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য আছে; প্রভেদ এই, যে বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণভেদ নেই। ইংরেজী ছন্দকেও স্থিরমাত্রা বলা যেতে পারে, কারণ তাতে accent-এর স্থান সাধারণত সুনির্দিষ্ট। সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের সঙ্গে ইংরেজী ছন্দের এইটুকু মিল আছে—ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা প্রভৃতিতে যেমন লঘু গুরু ধ্বনির অনুক্রম সুনিয়ন্ত্রিত, ইংরেজী iambus, trochee প্রভৃতিতেও সেইরূপ।

'অস্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলাতে পারে। এর দুই শাখা ঃ

'সংকোচক'—যে ছন্দে স্থানবিশেষে বদ্ধধ্বনির মাত্রা সংকোচ হয়, অর্থাৎ গুরু না হয়ে লঘু হয়, যেমন বাংলা অক্ষরবৃত্তে। মোটামুটি বলা যেতে পারে, এই শ্রেণীর ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি শব্দের অন্তে গুরু কিন্তু আদিতে ও মধ্যে সাধারণত লঘু। 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত'—এখানে —রাজ, -মার, -গীত গুরু কিন্তু নিস-, তব-, অভ-, সং-লঘু। উক্ত নিয়মটি সম্পূর্ণ নয়, ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়। 'বীরবর, ভারতমাতা' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে এবং 'জামরুল, মুসলমান' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দে আদ্য ও মধ্য বদ্ধধ্বনির সংকোচ হয় না, গুরুই থাকে। এই ব্যতিক্রমের কারণ—যুক্তাক্ষরের অভাব। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

'প্রসারক'—যে ছন্দে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু, আবার স্থানবিশেষে মাত্রা প্রসারিত ক'রে মুক্তধ্বনিকেও গুরু করা হয়। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—এখানে মাত্রাবৃত্তের তুল্য সকল বদ্ধধ্বনিই গুরু, অধিকন্তু 'পড়ে' আর 'এল'-র শেষ ধ্বনিকেও টেনে গুরু করা হয়েছে।

সংক্ষেপে—স্থিরমাত্র (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংকোচক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, কিন্তু বদ্ধধ্বনি কোথাও গুরু কোথাও লঘু। প্রসারক (ছড়া-জাতীয়) ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু কোথাও গুরু, এবং বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু।

এই ত্রিবিধ ছন্দঃশ্রেণীর মধ্যে মাত্রাবৃত্তের নিয়ম সর্বাপেক্ষা সরল, সেজন্য তার আর আলোচনা করব না। অন্য দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে কিছু বলছি।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি সুপ্রচলিত, শুনেছি প্রবোধবাবু এই নামের প্রবর্তক, কিন্তু সম্প্রতি তিনি অন্য নাম দিয়েছেন—'যৌগিক ছন্দ'।

মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে একেই আমি 'সংকোচক ছন্দ' বলছি। 'অক্ষরবৃত্ত' নামের অর্থ বোধ হয় এই—এতে চরণের অক্ষর অর্থাৎ হরফের সংখ্যা প্রায় সুনিয়ত, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর, মাত্রাসমষ্টিও চোদ্দ। এই অক্ষরের হিসাবটি কৃত্রিম। ছন্দ কানের ব্যাপার, মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে পদ্যের লেখ্য রূপ অর্থাৎ বানান বা অক্ষরসংখ্যার উপর নজর রাখা হয় না, মাত্রাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু পদ্যকার যখন সংকোচক ছন্দ রচনা করেন তখন শ্রাব্য রূপ আর লেখ্য রূপকে পরস্পরের অনুবর্তী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শব্দ ও অর্থ সমান হলেও 'ঐ' এক অক্ষর 'ওই' দুই অক্ষর, পদ্যকার সংখ্যার উপর দৃষ্টি রেখে 'ঐ' বা ওই লেখেন। উচ্চারণ একজাতীয় হ'লেও স্থলবিশেষে শব্দের বানান অনুসারে মাত্রা বদলায় অথবা মাত্রার প্রয়োজনে বানান বদলায়। মাত্রাবৃত্তে 'শর্করা' আর 'হরকরা' দুইই চার মাত্রা, কিন্তু সংকোচক ছন্দে প্রথমটি তিন এবং দ্বিতীয়টি চার মাত্রা। 'সর্দার, বাগ্দেবী' তিন অক্ষর, কিন্তু মাত্রার প্রয়োজনে 'সরদার, বাগ্দেবী, লিখে চার অক্ষর করা হয়। যাঁরা গদ্যে 'আজও, আমারই' লেখেন তাঁরাও পদ্যে 'আজো, আমারি' বানান করেন, পাছে অক্ষর বাড়ে। পদ্যকার ও পদ্যপাঠক দুজনেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুক্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি রেখে মাত্রা নির্ণয় করেন। এরকম করবার প্রয়োজন আছে এমন নয়। যদি বানান না বদলে 'সরদার' কে স্থানভেদে চার মাত্রা বা তিনমাত্রা করবার রীতি থাকত তবে পাঠকের বিশেষ বাধা হ'ত এমন মনে হয় না। কিন্তু যে কারণেই হ'ক রীতি অন্যবিধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণে লিখেছেন—'দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।' তিনি প্রচলিত রীতির বশেই অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য 'দিগ্দিগন্তে' লিখেছেন, মাত্রাবৃত্ত লিখলে সম্ভবত 'দিগ্ দিগন্তে' বানান করতেন।

অতএব কানের উপর নির্ভর ক'রে অক্ষরবৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা

করা চলে না, বানান অনুসারেও (অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ং ঃ ইত্যাদির অবস্থান অনুসারেও) করতে হবে। সেকালের কবিরা অক্ষর সংখ্যার উপর বিশেষ নজর রাখতেন না—'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)। এরকম পদ্য এখন লিখলে doggerel গণ্য হবে। বোধ হয় ভারতচন্দ্রের আমল থেকে মাত্রাসংখ্যা আর অক্ষরসংখ্যার সাম্য সম্বন্ধে পদ্যকারগণ সতর্ক হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের আদর্শে এই সাম্যরক্ষার চেষ্টা করেছেন। হয়তো আর এক কারণ—পাঠককে কিছু সাহায্য করা। ইংরেজী পদ্যেও syllable-সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্যে miss'd lack'd প্রভৃতি বানান চলে, যদিও কানে missed আর miss'd দুইই সমান।

যদি বাংলায় যুক্তাক্ষর উঠে যায় বা রোমান লিপি চলে, তা হ'লেও সম্ভবত বর্তমান রীতি অন্য উপায়ে বজায় রাখবার চেষ্টা হবে, 'সরদার' লেখা হবে sardar, কিন্তু মাত্রাসংকোচ বোঝাবার জন্য হয়তো 'সর্দার' স্থানে লেখা হবে sar'dar।

প্রবোধবাবু ছড়া-জাতীয় ছন্দের নাম দিয়েছিলেন 'স্বরবৃত্ত', এখন তিনি তাকে 'লৌকিক ছন্দ' বলেন। শেষের নামটি ভাল, তথাপি মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে আমি এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই। প্রবোধবাবুর মতে 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার পর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতি পর্বে চার ধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর (accent) থাকে।' শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর ব্যাকরণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ—'সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস পেছন তোরে ঘিরবে'। আমি মনে করি, বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে' ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি 'আ', পাঠকালে তাতে accent পড়ে না। 'কাশ'-এ accent আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা গুরুধ্বনি।

'প্রিয়নাথটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে...কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে'—এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি-, কা-) তে accent দেওয়া যায় না। প্রতি পর্বে সাধারণত চার ধ্বনি তা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যতিক্রমও হয় ('শিখিয়ে দিত, তিন কন্যে')। এই রকম ছড়াজাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ—শেষ পর্ব ছাড়া প্রতি পর্বে ছ মাত্রা, কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ মাত্রা হ'তে পারে। অতএব এই ছন্দে বিশেষ লক্ষণ আর কিছু। এই লক্ষণ মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন—'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে'। 'বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি ছড়ায় 'বৃষ্টি' তিন মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে' ও তিন মাত্রা হয়েছে! এইরকম মাত্রাপ্রসার হয় ব'লেই এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই।

পদ্যকার বানানের উপর দৃষ্টি রেখে সংকোচক ছন্দ রচনা করেন, হয়তো তার এক কারণ পাঠককে সাহায্য করা—এ কথা পূর্বে বলেছি। প্রসারক শ্রেণীর লৌকিক ছন্দেও স্থানে স্থানে ধ্বনির মাত্রা বদলায়, কিন্তু চিহ্নাদির দ্বারা পাঠককে সাহায্য করবার চেষ্টা হয় নি। এর কারণ—সেকালে এই ছন্দ পণ্ডিত জনের অস্পৃশ্য ছিল, লিখে রাখাও হ'ত না, লোকে অতি সহজে মুখে মুখেই শিখত।

১৩৫২

রবীন্দ্র পরিবেশ

আমাদের জীবনযাত্রায় নানারকম বস্তু দরকার হয়, কিন্তু শুধু দরকার বুঝেই আমরা তাদের মর্যাদা দিই না। যেসব বস্তু আমরা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করি তাদের উদ্‌ভাবক বা নির্মাতা মহা-প্রতিভাশালী হ'লেও আমাদের কাছে নিতান্ত পরোক্ষ, তাঁরা একবারেই আড়ালে থাকেন, ভোগের সময় আমরা তাঁদের কথা ভাবি না। রেলগাড়ি না হ'লে আমাদের চলে না, কিন্তু গাড়িতে চ'ড়ে তার প্রবর্তক স্টিভেনসনকে ক-জন স্মরণ করে? কালক্রমে বহু যন্ত্রী রেলগাড়ির বহু পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এমন আপত্তি শোনা যায় নি যে তাতে স্টিভেনসনের মর্যাদাহানি হয়েছে। পক্ষান্তরে যে বস্তু স্থূল সাংসারিক ব্যাপারে অনাবশ্যক, কিন্তু আনন্দ দেয় বা রসোৎপাদন করে, তার রচয়িতা রচনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রচয়িতাকেও স্মরণ করি, রচনা থেকে রচয়িতার তিলমাত্র বিচ্ছেদ সইতে পারি না। যন্ত্রের অদলবদল নির্বিবাদে হ'তে পারে, কারণ যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কেবল স্থূল স্বার্থের সম্বন্ধ। কিন্তু কবি বা চিত্রকরের রচনার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ, তাই এমন স্পর্ধা কারও নেই যে তাঁদের উপর কলম চালান।

রসসৃষ্টি ও রসস্রষ্টার এই যে অঙ্গাঙ্গিভাব, এরও ইতরবিশেষ আছে। রচয়িতার পরিচয় আমরা যত বেশী জানি ততই রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধি করি। যারা বেদ বাইবেল রচনা করেছেন

তাঁরা অতিদূরস্থ নক্ষত্রতুল্য অস্পষ্ট, তাঁদের পরিচয় শুধুই বিভিন্ন ঋষি আর প্রফেটের নাম। বেদ বাইবেল অপৌরুষেয় কারণ রচয়িতারা অজ্ঞাতপ্রায়। বাল্মীকি কালিদাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিংবদন্তী আছে ব'লেই পাঠকালে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। শেকস্পীয়ার সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই সম্বল ক'রে পাঠক তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যদিও তিনিই তন্নামে খ্যাত নাটকাদির লেখক কিনা সে বিতর্ক এখনও থামে নি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে লোকের যতটুকু জ্ঞান ছিল সম্প্রতি তাঁর নোটবুক আবিষ্কৃত হওয়ায় তা অনেক বেড়ে গেছে, এখন তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব বহুমুখী প্রতিভার ইতিহাস জড়িত তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা যত এবং যেভাবে জানি, আর কোনও রচয়িতার পরিচয় কোনও দেশের লোক তেমন ক'রে জানে কিনা সন্দেহ। আমাদের এই পরিচয় কেবল তাঁর সাহিত্যে সংগীতে চিত্রে ও শিক্ষায়তনে আবদ্ধ নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি-ধর্ম কর্ম অনুরাগ বিরাগ সমস্তই আমরা জানি এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়রাও জানবে। এই সর্বাঙ্গীণ সপ্রেম পরিচয়ের ফলে তাঁর রচনা আর ব্যক্তিত্বের যে সংশ্লেষ ঘটেছে তা জগতে দুর্লভ।

ইওরোপ আমেরিকার এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের গ্রন্থ-বিক্রয়সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের রচনা যে মাত্রায় জনপ্রিয় তাঁরা স্বয়ং সে মাত্রায় জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পান নি। বাইরনের অগনতি ভক্ত ছিল, তাঁর বেশভূষার অনুকরণও খুব হ'ত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে প্রীতিলাভ হয় নি। বার্নার্ড শ বই লিখে প্রচুর অর্থ ও অসাধারণ খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি অশেষ কৌতূহলের পাত্র হয়েছেন, লোকে তাঁর নামে সত্য মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে; কিন্তু তিনি জনবল্লভ হ'তে পারেন নি।

এদেশে একাধিক ধর্মনেতা ও গণনেতা যশ ও প্রীতি এক সঙ্গেই অর্জন করেছেন, যেমন চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নেতা

না হয়েও যে লোকচিত্তে দেবতার আসন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্ভব হয়েছে। কেবল রচনার প্রতিভা বা কর্মসাধনার দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয় নি, লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে মহানুভাবতা ও কান্তগুণ মিলে তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়াসনে বসিয়েছে। এদেশে যা তিনি পেয়েছেন তা শুধু সম্মান নয়, যথার্থ ই পূজা।

গুরু বললে আমরা সাধারণত যা বুঝি—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাদাতা তার জন্য যে বাহ্য ও আন্তর লক্ষণ আবশ্যক তা সমস্তই তাঁর প্রভূত মাত্রায় ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার'—তাঁর পক্ষে সামান্য গুরু হওয়া অসম্ভব। যে অগুহ্য মন্ত্র তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন তার সাধনা যোগাসনে জপ করলে হয় না, ভক্তিতে বিহ্বল হ'লেও হয় না। তার জন্য যে জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম আবশ্যক তা তিনি নিজের আচরণে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অগণিত ভক্তের প্রশস্ত অর্থে গুরুদেব। তার লোকচিত্তজয়ের ইতিহাস অলিখিত, কিন্তু অজ্ঞাত নয়। কৃতি গুণীকে তিনি উৎসাহদানে কৃতিতর করেছেন, ভীরু নির্বাক অনুরাগীকে সাদরে ডেকে এনে অভয়দানে মুখর করেছেন, ভক্ত প্রাকৃত জনকে বোধগম্য সরস আলাপে কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় অস্পৃয়ক তাঁর সৌজন্যে পদানত হয়েছে, ক্রূর নিন্দক তাঁর নীরব উপেক্ষায় অবলুপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধ চৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধুই কবি, তথাপি নিস্তার পান নি, কিংবদন্তী তাঁকে বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্রচরিতের এরকম পরিণাম হবে এমন আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে গেছেন তাই তাঁকে অবমানবতা থেকে রক্ষা করবে।

রবীন্দ্রনাথ অতি বিশাল, রবীন্দ্রবিষয়ে যে সাহিত্য লিখিত হয়েছে তাও অল্প নয়, কালক্রমে তা আরও বাড়বে। কবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের অনেকে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর

তর্কশাস্ত্র প্রবেশ

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

তর্কশাস্ত্র-প্রবেশ

[*For Pre-University, University Entrance and Higher Secondary Examinees*]

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম.এ., পি.আর.এস., ডি.লিট.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২